...r family members
from a friend.

সংখ্যা - ১ - ৭, ৯-১২
১৩৯৪

বোধসী

৩য় বর্ষ ।। ১ম সংখ্যা ।। জানুয়ারী ১৯৮৭

ভগবান হৃদয় ধনরাশির চেয়ে 'মানুষ' হচ্ছে বেশী মূল্যবান
—স্বামী বিবেকানন্দ

বিবেকানন্দ নিধি ও ইনষ্টিট্যুট অফ ভ্যালু ওরিয়েন্টেশন অ্যাণ্ড
এনভায়রনমেন্টাল এডুকেশন এর মাসিক মুখপত্র

সূচীপত্র

বিজ্ঞান ও মূল্যবোধ

মূল্যবোধ চিনে নেবার কৌশল

— স্বামী মুক্তানন্দ

মূল্যবোধ ও আমরা

উইল (কবিতা)

- শ্রীমতী মানসী মজুমদার

সুচরিতার ডায়েরী থেকে

—শ্রীমতী মালা চ্যাটার্জী ৮

ড্রাগ আসক্তি : এক ভয়াবহ সমস্যা

—শ্রীমতী পারমিতা চ্যাটার্জী, শ্রীমতী ইন্দ্রানী মুস্তাফী ১০

নিধির খবর ১২

ছোটদের বিভাগ :

বিজ্ঞানের কথা ১৪

কিশোরের গান (কবিতা)

— শ্রীসুরজিৎ রায় ১৫

আমি যদি পৌরমন্ত্রী হতাম

—সুকন্যা সেন ১৬

রোদসী
৫ম বর্ষ ।। ১ম সংখ্যা ।। জানুয়ারী ১৯৮৭

বিজ্ঞান এবং মূল্যবোধ

[১]

মূল্যবোধ মানুষের দৃষ্টিভঙ্গী এবং কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করে। নৈর্ব্যক্তিক দিক থেকে মূল্যবোধের তাৎপর্য বিচার করতে আমরা আগ্রহী, ব্যক্তির সঙ্গে মূল্যবোধের সম্পর্কও আমরা সহজেই অনুধাবন করতে পারি। কিন্তু বিজ্ঞানের সঙ্গে মূল্যবোধের সম্পর্ক সম্বন্ধে আমরা উদাসীন। অনেকসময় এ চিন্তাও হয়ত আসে যে বিজ্ঞান এবং মূল্যবোধ পারস্পরিক সম্পর্কহীন অথবা বিজ্ঞান কি কোন মূল্যবোধকে ব্যাহত করে ?

মানুষের মূল্যবোধের সঙ্গে তার মানসিক অবস্থার সম্পর্ক অনস্বীকার্য। মানসিক অবস্থা মানুষের নিউরোফিজিওলজির উপর নির্ভরশীল। মানুষের শারীরিক ফিজিক্যাল কেমিক্যাল ক্রিয়া তার মনের অবস্থা, চিন্তাধারা এবং এই চিন্তাধারা প্রসূত কার্যপ্রণালীকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। মানুষের ব্রেন তার চিন্তাশক্তি, আচরণ, কর্মধারাকে নিয়ন্ত্রণ করে। ব্রেনসেল এবং নিউরনসের গুরুত্ব অর্থাৎ শারীর বিজ্ঞানের গুরুত্ব তাই রয়েছে মানুষের মূল্যবোধ গঠনের উপর। ব্রেনসেল এর কার্যক্ষমতা স্বাভাবিক কারণে অথবা বাইরে থেকে আরোপিত কোন উপায়ে বাড়িয়ে তুললে মানুষের মূল্যবোধ বদলে যেতে পারে। আবার প্রাকৃতিক অবস্থার সঙ্গে মানুষের আচরণ বিধির পরিবর্তন হয়। পৃথিবীর জনসংখ্যা বেড়ে যাবার জন্য আমাদের বিভিন্ন মূল্যবোধের পরিবর্তন হয়েছে। আবার জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য বিজ্ঞান যে নানান পথ নির্দেশ করেছে তাও আমাদের মূল্যবোধ প্রভাবিত করেছে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে মূল্যবোধ এবং বিজ্ঞান পারস্পরিক সম্পর্ক যুক্ত। নতুন বছরের আলোচনায় মূল্যবোধের সঙ্গে বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা—শারীর বিজ্ঞান, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান বা প্রযুক্তিবিদ্যার সম্পর্ক আমরা যাচাই করব। সেই সঙ্গে দেখব বিজ্ঞান কোন শাশ্বত মূল্য-বোধকে প্রকাশ করে।

নতুন বছর কার্য-কারণ বিচারে আমাদের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী দিক।

মূল্যবোধ চিনে নেবার কৌশল

স্বামী মুক্তানন্দ

—পূর্ব প্রকাশিতের পর—

বিদ্যালয়ে নানা শ্রেণীতে বিভিন্ন বিষয় শেখানোর সময় মূল্যবোধ সম্বন্ধে ছাত্রছাত্রীদের সচেতন ক'রে তোলার অনেক সুযোগ আছে। মূল্যবোধ সম্বন্ধে সচেতন ক'রে তোলার এই কৌশল কিন্তু মোটেই নীতিবোধ চাপিয়ে দেওয়া বা কোন বিশেষ মূল্যবোধ সম্বন্ধে উদ্দেশ্যমূলকভাবে বড় ধারণা করিয়ে দেবার চেষ্টা নয়।

বিভিন্ন পাঠ্য বিষয় শেখাবার সময় বিভিন্নভাবে এই কৌশল অবলম্বন করা যায়। ইতিহাস পড়ানো, জীবনী আলোচনা করা অথবা গল্প করার সময় আমরা কিভাবে এই কৌশল অবলম্বন করতে পারি দেখা যাক। সচরাচর যখন আমরা ইতিহাস, জীবনী বা গল্প আলোচনা করি তখন প্রথমে ঘটনার উল্লেখ করি, পরের স্তরে কোন কোন কারণে ঘটনা ঘটল, ঘটনার সঙ্গে সম্পর্কিত ব্যক্তিরা কোন ধারণার বশবর্তী হয়ে বা কি উদ্দেশ্যে কিরকম ব্যবহার করল এই পর্যন্ত ব'লে বিষয় শেখানো শেষ করি। একটা উদাহরণ নেওয়া যাক: ধরা যাক ছেলেমেয়েদের আমরা শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন কথা শোনাচ্ছি। এই প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ বা গদাধরের পূর্বপরিচয় দিতে গিয়ে তাঁর বাবা মাকে তাঁর জন্মের অনেক আগেই ভিটেমাটি ছেড়ে দারিদ্র বহন করতে হয়েছিল কেন একথা বলতে হবে। গদাধরের বাবা ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায় ছিলেন সত্যনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ। সত্য চিন্তা ও সত্য আচরণে তিনি অটল। গ্রামের সব লোক তাঁকে জানে এবং মান্য করে। একবার গ্রামের জমিদার বড়রকম মামলায় পড়েছেন। হেরে যাবারই আশঙ্কা বেশী। হারলে জমিদারের মান যাবে। জমিদারের পক্ষে এ ভীষণ ঘটনা। তাঁকে বাঁচাতে পারেন একমাত্র ক্ষুদিরাম, যদি তিনি জমিদারের হয়ে সাক্ষী দেন, তাঁর পক্ষ সমর্থন করেন। তাঁর কথা কেউ অবিশ্বাস করবে না। বিচারক ক্ষুদিরামের সাক্ষ্য অনুযায়ী জমিদারকে জয়ী ক'রে দেবেন।

জমিদার শরণ নিলেন ক্ষুদিরামের। অনেক অনুরোধ, উপরোধ প্রলোভন, অবশেষে ভীতি প্রদর্শন কিছুতেই ক্ষুদিরামকে রাজী করানো গেল না। ক্ষুদিরাম সত্যনিষ্ঠার মূল্যকে দাম হিসেবে দিয়ে বৈষয়িক নিরাপত্তার মূল্য কিনতে চাইলেন না। মিথ্যাচার ব্রাহ্মণের ধর্ম নয়। সত্যনিষ্ঠার মূল্যবোধের উপর ব্রাহ্মণত্বের গুণ নির্ভরশীল।

মামলায় জমিদার মহাশয়ের হার হ'ল। ফলে ক্ষুদিরামের ওপর রোষে জ্বলে উঠলেন তিনি। তাঁর প্রচুর ক্ষমতার বলে ক্ষুদিরামের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা ক'রে জয়ী হলেন তিনি এবং ক্ষুদিরামের ভিটেমাটি সব কিনে নিলেন। ক্ষুদিরাম কিন্তু এতেও জমিদারের কাছে নত হলেন না। সত্যমূল্যকে ধারণ ক'রে রেখে বিষয়মূল্য ত্যাগ ক'রে স্বচ্ছল ক্ষুদিরাম দরিদ্র হয়ে স্ত্রী পুত্রকন্যার হাত ধ'রে রাস্তায় বেরোলেন। পৌঁছলেন অন্য গাঁয়ে যেখানে বন্ধু সামান্য একটুকরো জমি দিয়ে থাকার ব্যবস্থা ক'রে দিলেন। ছোট গ্রাম কামারপুকুরে দরিদ্র সংসারে চেঁকিশালে জন্ম নিলেন গদাধর।

শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনকথা এই পর্যন্ত বলবার পর এখন ছাত্র-ছাত্রীদের প্রশ্ন করা যায় যে ক্ষুদিরামের অবস্থায় পড়লে তারা কে কি করবে? এর নানারকম উত্তর পাওয়া যাবে।

কেউ বলবে :

১। ছেড়ে আমি চলে আসব কেন?

২। গাঁয়ের লোককে জড়ো ক'রে জমিদারকে একহাত দেখে নিতাম।

৩। ভিটে ছেড়ে প্রথমে চলে এলেও পরে গিয়ে প্রতিশোধ নেবার জন্যে গোপনে জমিদারের বাড়ী গিয়ে আগুন দিয়ে আসতাম।

৪। আমার প্রতি লোকের সম্মানবোধকে কাজে লাগিয়ে লোকজন জড়ো ক'রে একটা আন্দোলন গ'ড়ে তুলতাম। ইত্যাদি ইত্যাদি।

ছেলেমেয়েরা একটি বিকল্প অথবা এর সঙ্গে আরো কয়েকটি বিকল্প যোগ ক'রে নিজের মতামত ব্যক্ত করলে তাদের মূল্যবোধটি পরিষ্কারভাবে ধরা পড়বে। তারপরে ঘরোয়াভাবে পরস্পরের নির্ধারিত মূল্যবোধ নিয়ে নিজেদের মধ্যেই আলোচনা করবে।

শিক্ষক-শিক্ষিকা অথবা বাবা মা এই মতামত জানানোতে যোগ দিতে পারেন। কিন্তু আগে নয়, সব শেষে। কোন মতেই যেন তাঁরা ছেলেমেয়েদের স্বাধীন মূল্যবোধের প্রকাশকে প্রভাবিত না করেন সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। আলোচনার পরেও তাদের পরস্পরের মূল্যবোধের কোন তুলনামূলক বিচার করবেন না। ভালো-মন্দ বলবেন না। কোন ছেলেমেয়ে যদি নিজের মতামত জানাতে না চায় তার উপরে চাপ সৃষ্টি করবেন না।

এইরকম কৌশল বা প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়ে ইতিহাসের ঘটনা থেকে আরম্ভ ক'রে খবরের কাগজের নানান সংবাদ, খেলাধূলার বর্ণনা ইত্যাদির ভেতর দিয়ে মূল্যবোধ প্রকাশের বহু বিকল্প আমরা পড়ার সময়, অবসরকালে, গল্প করার সময়, বেড়াতে গিয়ে আলাপ আলোচনার সময় নির্ধারণ করতে পারি। অবশ্য এমনভাবে নয় যাতে ব্যাপারটা পড়ানো মনে হয় অথবা নীতিশিক্ষা বা উপদেশ দেওয়ার আর একটা পথে পরিণত হয়ে পড়ে।

ভূগোল, জীববিজ্ঞান, স্বাস্থ্য, সমাজবিজ্ঞান এমনকি অঙ্ক পড়ানোর ফাঁকে ফাঁকে অতি অল্প সময়ের জন্য আমরা এই ধরণের মূল্যবোধ সচেতন করার কৌশল অবলম্বন করতে পারি।

[ক্রমশঃ]

মূল্যবোধ ও আমরা

[Value Orientation এ প্রকাশিত 'Values & Ourselves' অনুসরণে]

– পূর্ব প্রকাশিতের পর—

সত্য মঙ্গল এবং সুন্দর এই শাশ্বত মূল্যবোধের কথা আমরা আগেই আলোচনা করেছি যা মানুষকে চিরকাল কর্মে প্রণোদিত করে এবং মানুষ এই মূল্যবোধ অর্জন করার জন্য কখনও বা বিভিন্ন বিষয়ের ওপর মূল্য আরোপ করে বা নতুন বিষয় খুঁজে নিয়ে এগিয়ে চলে। একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছনোর পথে এই যে মানুষ বিভিন্ন বিষয়ে মূল্য আরোপ ক'রে তার মাধ্যমে অগ্রসর হয় তাতেই তার ব্যবহার জটিল হয়ে পড়ে।

মানুষের ব্যবহার বিভিন্ন মূল্যবোধের প্রেরণা যা দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তন, আগ্রহের বিষয়ান্তর, যুক্তি এবং অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শিক্ষার প্রতিফলন। এই দিক থেকে বিচার ক'রে অনেক সময়ই মূল্যবোধের সঙ্গে দৃষ্টিভঙ্গী, প্রয়োজন এবং আগ্রহকে এক ক'রে ফেলা হয়। কিন্তু একথা ভুললে চলবেনা যে দৃষ্টিভঙ্গী, প্রয়োজন এবং আগ্রহ ধারণা ও মূল্যবোধ সচেতনতার সঙ্গে যুক্ত; তবে এরা মূল্যবোধের সঙ্গে সমার্থক নয়। মূল্যবোধের মধ্যে আছে উত্তরিত হবার শক্তি এবং এটি মন সম্বন্ধে সক্রিয়। দৃষ্টিভঙ্গী, প্রয়োজন এবং আগ্রহ মূল্যবোধ নিয়ন্ত্রিত কিন্তু মূল্যবোধের সঙ্গে একার্থক নয়।

দৃষ্টিভঙ্গী, প্রয়োজন ও আগ্রহের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মূল্যবোধও পরিবর্তিত হয়। মানুষের মৌল মূল্যবোধ গ'ড়ে ওঠা তার প্রাথমিক চাহিদার সঙ্গে সম্পর্কিত। সামাজিক গঠনের মূল বা ভিত্তি হচ্ছে নিরাপত্তার মূল্যবোধ। একবার প্রাথমিক চাহিদা অর্থাৎ খাদ্য ও বস্ত্রের সংস্থান হলে এবং নিরাপত্তার চাহিদা পরিপূরণ হলে তবেই মানুষ এইসব প্রয়োজনের উর্ধে যে উচ্চতর চাহিদা আছে সেই সব মূল্যবোধের কথা ভাবে। এই মূল্যবোধ সৌন্দর্যবোধ সংক্রান্ত, বুদ্ধিসংক্রান্ত, দর্শন, বৈজ্ঞানিক সব ধরণেরই হতে পারে। এখানেই বস্তুগত মূল্যবোধ এবং ধারণাগত মূল্যবোধের তফাৎ খুঁজে পাওয়া যায়।

শঙ্করাচার্য বলেছেন শিশুরা মূল্যবোধ আরোপ করে খেলাধূলাতে, যুবকেরা যৌবনে এবং বৃদ্ধেরা কল্পনা এবং হতাশায়। পরম অবস্থার

জন্য কোন সময়ই অবশিষ্ট থাকেনা। এখানে বলা হচ্ছে মূল্যবোধ পরিবর্তন বয়স দ্বারা নিয়ন্ত্রিত যা শারীরিক আকাঙ্খার উপর নির্ভরশীল। যদিও মূল্য আরোপের এই বিষয়গুলি সাময়িক তবুও মানুষ খুব কম সময়ই শেষপর্যন্ত যে মূল্যবোধ তাকে পরম লক্ষ্যে পৌছতে সাহায্য করবে অর্থাৎ সত্য, মঙ্গল ও সুন্দরের কথা ভাবে। গৌতম বুদ্ধ মানুষের পার্থিব অবস্থার কথা বিবেচনা ক'রে বস্তুগত আকাঙ্খার থেকে মানুষের দৃষ্টি শাশ্বত মূল্যবোধের দিকে ফেরাতে চেয়েছিলেন। গৌতম বুদ্ধ এবং শঙ্করাচার্য উভয়েই মানুষের দার্শনিক মনের কাছে আবেদন করেছিলেন।

পার্থিব জগতে আমরা বিভিন্ন কারণে মূল্যবোধ পরিবর্তিত হতে দেখি। উদাহরণ হিসেবে হিন্দুদের সামাজিক-সাংস্কৃতিক দিকের কথা ভাবা যেতে পারে। বহুকাল আগে বিবাহিত হিন্দু মেয়েকে শতপুত্রের জননী হও ব'লে আশীর্বাদ করা হত। কিন্তু বর্তমান যুগে এই আশীর্বাদ অভিশাপ বলেই গণ্য হবে, কেননা অনেক ছেলেমেয়ের আগে যা মূল্য ছিল বর্তমান যুগে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তা নষ্ট হয়ে গেছে, মানুষের দৃষ্টিভঙ্গীর আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। এই দৃষ্টিভঙ্গী মূল্যবোধ নির্ভর। এখনকার মানুষ মূল্য দেয় ছোট পরিবারকে এবং যান্ত্রিক অগ্রগতি মানুষকে তার পরিবার সীমিত রাখার ক্ষমতা দিয়েছে। এবার অন্য একটা উদাহরণ নেওয়া যাক। যুদ্ধের সময় সৈন্যদের ওপর নির্দেশ থাকে কোন কথা চিন্তা না ক'রে শত্রু হত্যা করার, অপরপক্ষে রেড ক্রশের নার্সকে বলা হয় পক্ষ নির্বিশেষে আহতদের সেবা করতে। অর্থাৎ মূল্যবোধ পরিস্থিতি এবং দায়িত্ব নির্ভর।

মূল্যবোধের পরিবর্তন রাজনৈতিক ধারণা, ধর্মীয় গোঁড়ামি, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, বৈজ্ঞানিক শিক্ষা ও যোগাযোগের জন্য ঘটে। তাই যে যুগে যান্ত্রিক অগ্রগতি মহাশূণ্যকেও হাতের মুঠোয় এনে দিয়েছে সেখানে মূল্যবোধের পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। পরিবর্তন আকাঙ্খিত উন্নততর লক্ষ্যে হলে তবেই তাকে বলা যায় বিকাশ। মূল্যবোধের পরিবর্তন যখন সম্ভব তখন বিকাশও নিশ্চয়ই সম্ভব। পরিবর্তনই বিকাশের সূচক। মূল্যবোধ প্রতিবিন্যাস—মূল্যবোধ বিকাশেরই পথ যেখানে শাশ্বত মূল্যবোধ অর্জন করাই প্রধান লক্ষ্য।

[ক্রমশঃ]

উইল

শ্রীমতী মানসী মজুমদার
(শিক্ষিকা, নিবেদিতা স্কুল)

চুলে পাক ধরেছে দেখলাম
রক্তস্রোতের গতিও কমে এসেছে,
তাই, একটা উইল করব ভাবছি।
শেষ ইচ্ছা তো আমার অনেক কিছুর
কিন্তু শেষ দেওয়া ?—
ঝুলিতে খুঁজে পেতে কিছুই এমন পেলাম না
যা উত্তরপুরুষকে অথবা বিশ্বমানবকে দিয়ে যেতে পারি।
অথচ, দিতে চাইছি আমি।

কী ভীষণ যন্ত্রনার এই চিন্তা—
কত সহস্র দিন রাত্রি পেরিয়ে এসেছি
কোথাও কিছু সঞ্চয় নেই আমার !
শুধু, হৃদয়ের সিন্দুকে একটুকু আছে
ভালোবাসা আর মমতা।
ওগুলো দিতে পারিনি আমি
দিতেও জানিনা বোধহয়।
ওগুলো ধরা-ছোঁয়াও যায়না আবার !

দেখ, ভাবীকালের মানুষ !
আমি নিঃস্ব; দেওয়ার মতো নিটোল
কোন সম্বল নেই আমার।

কিন্তু আমিও দিতে চাই
আমার প্রাণের আকুতি—
তোমাদের কিছু দিয়ে যাওয়ার জন্য।

তাই, চন্দ্র-সূর্য-ধরিত্রীকে সাক্ষী রেখে
উইল করছি আমি—
আমার সেই ভালোবাসা,

সুচরিতার ডায়েরী থেকে

শ্রীমতী মালা চ্যাটার্জী

(ছাত্রী, ইংরাজী বিভাগ, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়)

আমি সুচরিতা বলছি। আমি অহংকারী কেননা আমি নিজেকে কিয়দংশে বুঝি, আর এ নাকি আমার দোষ। এ আমার কূপ-মণ্ডুকতা যে আমার মধ্যে আমি থাকতে ভালোবাসি। আমার জ্ঞানের পরিধি নাকি তাই বাড়ছে না। কারণ আমার গতিবিধির সীমাকে আমি সঙ্কীর্ণ ক'রে ফেলেছি।

সত্যি আমার জ্ঞানের পরিধি আর বাড়াতে চাই না আমি। চারদিকে যা দেখেছি তাতেই আমি আহত, যেটুকু সংগ্রহ হয়েছে তার ভয়াবহ ওজন আমার সহ্য হয় না। একদিকের দারিদ্র আর অপর দিকের ঔদাসীন্য দেখার পালা কবে হবে শেষ? কারো অর্থ নেই, স্বাচ্ছল্য নেই, কারো আবার মনের প্রসারতা নেই। মনগুলো কি দিন দিন সব কৃপণ হয়ে যাবে? চারদিকে তো কার্পণ্য, হিংস্রতা, কপটতা —হে বিচিত্র জীবন আমাকে অন্ধ ক'রে দাও যাতে এর বেশী আর আমায় দেখতে না হয়। অনেক দেখেছি আরো কত এমন দৈন্য দেখব?

('উইল' কবিতার শেষাংশ)

গভীর গোপনে থাকা সেই মমতাটুকু
তোমাদের সবার সঙ্গে থাকুক,
তোমাদের আরও সজীব ক'রে তুলুক,
উজ্জ্বলতর দিন আর স্নিগ্ধ রাত্রি
তোমাদের জীবন শান্তিময় করবে।
আর, আমার বিপুল ক্ষুদ্রতা, মোহ আর ক্রোধ
আমার শরীরী মরণের সঙ্গে
দাহ হোক, ভস্ম হোক, লুপ্ত হোক।
জীবনের ওপার থেকে
তোমাদের সুখ দেখে
সুখী হব আমি।

('সুচরিতার ডায়েরী থেকে' এর শেষাংশ)

আমি অহঙ্কারী কারণ আমি সবার সঙ্গে মিশতে পারি না। সত্যি পারি না, এবং চেষ্টাও করি না। যাদের অফুরন্ত রয়েছে, অথচ একটুও দিতে জানে না, তাদের প্রতি কেবল অভিমান নয়, আমার ক্রোধও রয়েছে, তাদের আমি পারলে নস্যাৎ ক'রে দিই। আমি শুধু অহঙ্কারী নই, আমি ক্ষুব্ধ, ক্রুদ্ধ, আমি তাই বর্বর—এবং আমাকে আমি পূজা করি।

'অহং'—সে কি কিছু কম ? নিজেকে যে না শ্রদ্ধা করতে পারে—সে অপর কাউকে শ্রদ্ধা করতে পারে না। অহং বাদ দিয়ে কোনো কিছু সম্ভব নয়। আমরা ভালোবাসি অহং এর প্রতিচ্ছবি দেখে, আমরা পূজা করি অহং এর প্রতিধ্বনিকে। আমার অহং আমার মধ্যস্থিত দেবতা। তাঁকে ছোট করা আমার পক্ষে মৃত্যু। আমার হৃদয়ে যে দেবতা অধিষ্ঠিত তাঁর সম্মানের দায়িত্ব আমার, তাঁর রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব আমার। পৃথিবী তুমি আমাকে অহঙ্কারী বল—আমি তোমাকে প্রতি নমস্কারে বলি তুমিও অহঙ্কারী হও, অহঙ্কারী হওয়াটা গুণের।

মূল্যবোধের কেন্দ্রবিন্দু 'আমি', অর্থাৎ অহং। যার এই বোধ যত বেশী সে পৃথিবীর, সমাজের, পরিবারের এবং নিজের কাছে অমূল্য সম্পদ।

বন্ধুগণ, তোমরা আরো একটু বেশী অহঙ্কারী হতে পারো না ?—মনে রেখ তোমরা মানবতার ভবিষ্যৎ—তোমরা সর্বার্থ।

ড্রাগ আসক্তি ঃ এক ভয়াবহ সমস্যা

শ্রীমতী পারমিতা চ্যাটার্জী ও শ্রীমতী ইন্দ্রাণী মুস্তাফী
(ছাত্রী, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়)

বর্তমানে আমাদের যুবসমাজের বহু সমস্যার মধ্যে যেটি ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করতে চলেছে তা হ'ল ড্রাগের প্রতি অদম্য আসক্তি। কিন্তু অন্য সব কিছু ছেড়ে যুবসমাজ ড্রাগের প্রতি এত আসক্ত হচ্ছে কেন? যদি পর্যালোচনা করা যায় তাহ'লে দেখা যাবে এর প্রথম কারণ কৌতুহল। ড্রাগে যারা আসক্ত তাদের মধ্যে অনেকেই এই পথে পা বাড়ায় অনেকটা 'দেখি না কি হয়' এই ধরণের মানসিকতা নিয়ে। কিন্তু নিছক কৌতুহল থেকে এই আসক্তি তাদের অজান্তেই ভয়ঙ্কর বীভিষিকার জাল বিস্তার ক'রে ফেলে যা থেকে বেরিয়ে আসা প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। একটি আশ্চর্য কথা যে সচরাচর দেখা যায় কৃতী ছাত্রছাত্রীরাই এই নেশায় বেশী আসক্ত হয়। কিন্তু কেন? উন্নত মানের বুদ্ধিই কি এর জন্য দায়ী? কিন্তু উন্নত মানের বুদ্ধি তো মানুষকে সুপথে চালনা করে। তাহ'লে এক্ষেত্রে আমাদের চিন্তা করা দরকার যে কোন শক্তি এই উচ্চমানের বুদ্ধিকে বিপথে চালনা করছে? এক্ষেত্রে দেখা যায় অপরিণত মানসিকতা তাদের চিন্তাশক্তিকে ভুলপথে চালনা করে এবং বুদ্ধি তখন কোন কাজই করেনা। আরও একটি জিনিস এক্ষেত্রে লক্ষ্যণীয় যে তারা তাদের ভবিষ্যৎ পরিণতি জেনেও স্বইচ্ছায় এগিয়ে যায়। প্রথমবার হয়তো জোর ক'রে বা বন্ধুদের চাপে শুরু হয় কিন্তু পরে নিজের ইচ্ছেতেই একই ভুলের পথে পা বাড়ায়। এইরকম মাদকে আসক্ত একটি ছেলের সঙ্গে কথা ব'লে দেখেছি যে এদের মধ্যে একটি জিনিসের অভাব আছে, তা হ'ল পরিণামদর্শিতা। তাকে যখন প্রশ্ন করেছিলাম সে তার বংশধরকে হেরোইন ব্যবহার করার অনুমতি দেবে কিনা তখন সে কোন উত্তর দিতে পারেনি। অথচ সে সংসার জীবনে পা বাড়াতে ইচ্ছুক।

ড্রাগে যারা আসক্ত তাদের আসক্তি কমানোর ক্ষেত্রে তাদের চারপাশের লোকেদের একটা বিরাট দায়িত্ব আছে। আমরা সচরাচর কোন ড্রাগে আসক্ত ছেলেকে দেখলে তাকে এড়িয়ে চলার চেষ্টা করি।

যদিও আমরা চাই যে সে এই ভুল পথ থেকে সরে দাঁড়াক তবুও তার দিকে সাহায্যের হাত বাড়াতে সঙ্কোচ বোধ করি। অথচ এই আন্তরিক সাহায্য ও সহানুভূতিই একমাত্র পথ যার দ্বারা আমরা তাদের ঠিক পথে ফিরিয়ে আনতে পারি। কিন্তু শুধু একপক্ষের সাহায্যই-তো সব নয়। একদিকে যেমন দরকার সহানুভূতি অপরদিকে তেমনই আসক্তি দূর করার ইচ্ছাও জরুরী। যতক্ষণ পর্যন্ত না কারো মনে ভালো হবার ইচ্ছা জাগে ততক্ষণ পর্যন্ত কারো সাধ্য নয় তাকে সুপথে ফিরিয়ে আনা, আমাদের চেনা ছেলেটি বলেছিল 'আমি খুবই দুঃখিত কিন্তু আমি ছাড়তে পারিনা'।

এই সব ক্ষেত্রে বাবা-মাদের বিরাট ভূমিকা আছে। প্রথমতঃ প্রয়োজন ছেলেমেয়ের সঙ্গে সহজ হওয়া। তাদের সমস্যা বুঝতে চেষ্টা করা এবং প্রয়োজনে সহানুভূতির সঙ্গে তাদের সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করা।

কিন্তু এই সমস্যা শুধুমাত্র ঘরের সমস্যা নয়। কোন নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর সমস্যা নয়, সমগ্র দেশের তথা সমগ্র জাতির সমস্যা। যুব-সমাজের ওপরই নির্ভর করছে দেশের প্রতিষ্ঠা, দেশের উন্নতি। তাই যারা দেশের কর্ণধার তাদের সুরক্ষার দায়িত্ব সমগ্র জনগণের এবং সরকারের।

পূর্বোল্লিখিত ছেলেটির সঙ্গে এই সম্পর্কে অনেক আলোচনার পর সে বলল 'তুই যখন মনে করিয়েই দিলি তবে এখন একবার যাই সেই আড্ডায়'।

———

নিধির খবর

১লা ডিসেম্বর শ্রীমতী অলকা জালানের আয়োজনে অনুষ্ঠিত একটি আলোচনা সভায় মূল্যবোধ কিভাবে শিশুকাল থেকে জীবনে রূপায়িত করা যায় এবিষয়ে আলোচনা করেন স্বামী যুক্তানন্দ। আলোচনায় যোগদানকারীদের মধ্যে ছিলেন শ্রীমতী শারদা সিংহানিয়া, শ্রীমতী প্রভা গোয়েঙ্কা, শ্রীমতী লীলা হিম্মতসিংকা, শ্রীমতী পুষ্পা বাগলা, শ্রীমতী প্রীতি কাপুর, শ্রীমতী স্মিতি সোমানি, শ্রীমতী কল্যাণী ভি শ্রীনিবাসন, শ্রীমতী সঙ্গীতা ধীগাত এবং শ্রীমতী রীতা ডালমিয়া। আলোচনার শেষে কয়েকটি ছোট কর্মসূচী গ্রহণ করা হয় এবং স্থির করা হয় বহুসময়ব্যাপী কর্মসূচী নির্ধারিত করার জন্য ভবিষ্যতে আলোচনা হবে।

*

৫-৭ই ডিসেম্বর 'মূল্যবোধ এবং মানবিক গুণাবলী উন্নয়ন' বিষয়ক একটি শিক্ষাক্রম অনুষ্ঠিত হয় বিবেকানন্দ নিধির গবেষণা ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে। শিক্ষাক্রমে যোগদানকারী ৩৭ জনের মধ্যে ৩০ জনই ছিলেন 'ট্রেইনড নার্সেস অ্যাসোসিয়েশনের' (TNAI) পশ্চিমবঙ্গ শাখার সদস্যা। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য এটি TNAI এর সদস্যাদের জন্য দ্বিতীয় শিক্ষাক্রম। ১৩-১৫ই ফেব্রুয়ারী TNAI এর সদস্যাদের তৃতীয় একটি দল শিক্ষাক্রম গ্রহণ করবেন।

*

কলকাতা দূরদর্শন কেন্দ্রে ১১ই ডিসেম্বর তরুণদের জন্য অনুষ্ঠানে 'মূল্যবোধ ও আমরা' শীর্ষক আলোচনায় অংশ নেন বিবেকানন্দ নিধির প্রতিনিধি, ট্রেইনড নার্সেস অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যা শ্রীমতী অশ্রু বাগচী এবং কলকাতা দূরদর্শনের শ্রীপুলকেশ ঘোষাল।

*

'মূল্যবোধ অভিমুখী শিক্ষা' শীর্ষক ইউ জি সির জাতীয় আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হয় ১৪-১৬ই ডিসেম্বর বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের বিনয় ভবনে। স্বামী যুক্তানন্দ, ডঃ কে পি চৌধুরী, ডঃ সুনীতি দত্ত ও প্রফেসর অম্লান দত্ত আলোচনাচক্রের বিভিন্ন অধিবেশন পরিচালনা করেন। এই আলোচনাচক্রের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশ্বভারতীর উপাচার্য প্রফেসর নিমাই সাধন বসু বিবেকানন্দ নিধির দুটি বই 'Value Orientation and Environmental Education'—Proceedings of a Workshop held in April, 1982' এবং বিবেকানন্দ নিধির ইংরেজী পত্রিকা Value Orientation এর ১৯৮৬ র বার্ষিক সংখ্যা প্রকাশ করেন। বই দুটি বর্তমানে বিবেকানন্দ নিধির গবেষণা ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে পাওয়া যাচ্ছে।

*

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের জীবন এবং বাণী সংক্রান্ত আলোচনা বৃহস্পতিবারে■ [redacted] অনুষ্ঠিত হয়।

বিজ্ঞানের কথা

জড় বলে কিছু নেই

জর্জ বার্নার্ড শ নিরামিষ খেতেন। একদিন তিনি দেখলেন একটা বাঁধাকপি যখন জলে সিদ্ধ করা হয় তখন কপিটা কেঁপে কেঁপে ওঠে মানুষ যেমন খুব কষ্ট পেলে ব্যাথায় কেঁপে ওঠে। উনি স্যার জগদীশ চন্দ্র বোসের বিজ্ঞানাগারে এই দৃশ্য দেখে খুব কষ্ট পেয়েছিলেন।

গাছপালার অনুভব শক্তি আছে জগদীশ চন্দ্র প্রমাণ করেছিলেন। উনি আরও প্রমাণ করেছিলেন যে ধাতুরও অনুভব শক্তি আছে। মানুষ বা গাছপালা যেমন বিষক্রিয়ায় জর্জরিত হয়, বিষ বিভিন্ন ধাতুকেও সেরকম যন্ত্রণা দিতে পারে। টিন, দস্তা, প্লাটিনামের ওপর বিষের প্রতিক্রিয়া জগদীশ বোস দেখেছিলেন। মানুষকে বিষ দিলে যে প্রতিক্রিয়া হয়, ধাতুর প্রতিক্রিয়াও ঐ রকম হয়েছিল।

মার্কিন বিজ্ঞানী ব্যাকসটার আরও মজার জিনিস দেখেছিলেন। তিনি দেখেছিলেন যে গাছপালা হয়ত মানুষের মনের কথাও বুঝতে পারে। একদিন বিজ্ঞানাগারে তিনি ভাবছিলেন গাছের পাতা পুড়িয়ে দেখবেন গাছের অনুভূতি কেমন হয়। এই কথা ভাববার সঙ্গে সঙ্গে তিনি দেখলেন বিজ্ঞানাগারের গাছের পাতাটা কুঁকড়ে উঠল। ঐ গাছটির সঙ্গে পলিগ্রাফ নামে একটা যন্ত্র লাগানো ছিল যা গাছের পরিবর্তন ধরেছিল।

বিলেতে একটা অফিসে গাছপালায় কেউ জল দিত না। অফিসের কয়েকজন সাহেব ঐ গাছগুলোর সঙ্গে ইলেকট্রোড লাগিয়ে ঐ ইলেক্ট্রোড একটা লাউডস্পীকারে লাগিয়ে দিলেন। দেখলেন যখন গাছের জল প্রয়োজন তখন লাউডস্পীকারে একটা খুব কষ্টের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে—গাছ কষ্টে কেঁদে উঠছে জল না পেয়ে।

কিশোরের গান

শ্রীসুরজিৎ রায় (মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী)

আমরা দেশের সবুজ কিশোর
আমরা দেশের কাণ্ডারী ;
আমরা দেশের ছাত্র সমাজ
প্রতিকূলে হাল ধরি ।

দেহে মোদের শক্তি বিপুল
এক আমাদের সবুজ প্রাণ ;
প্রয়োজনে প্রাণটি দিয়ে,
রাখি মোরা জাতির মান ।

সব শক্তি হার মানে ভাই—
মোদের একক শক্তি কাছে ;
সব সময়ে আমরা প্রথম,
অন্যেরা সব পাছে পাছে ।

নানান কাজের মধ্যে দিয়ে,
উচ্চ করি দেশের শির ;
গর্ব যে হয় ভাবি যখন,
সফল মোরা কর্মবীর ।

সফল মোদের জ্ঞান গরিমায়,
সফল মোদের কর্মফল ;
বিজ্ঞানেরে এগিয়ে নে যাই,
আমরা সবুজ কিশোর দল ।

যুগান্তরের যুগটি ধরে
নমুনা তার যাচ্ছি রেখে ;
শান্তিবাণী বপন করি
সর্বনাশা অগ্নি দেখে ।

গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে,
ছুটছে মোদের বিজয় রথ ;
গ্রহে গ্রহে ঘটবে মিলন,
গড়ছি মোরা তারই পথ ।

আমি যদি পৌরমন্ত্রী হতাম

শ্রীমতী সুকন্যা সেন
(ষষ্ঠ শ্রেণী, পাঠ ভবন স্কুল)

আমি যদি এখন কলকাতার পৌরমন্ত্রী হই, তাহলে শহরবাসীর অসুবিধের প্রতিকার করব সবচেয়ে আগে। ঠিকমতো প্রত্যেক জায়গায় ময়লা তোলার গাড়ী নিয়ে যাওয়া হয় কিনা, সেদিকে কড়া নজর রাখব আমি। নিয়মিত ময়লা ফেলার গাড়ীতে ময়লা উঠল কিনা, সে হিসেবও আমায় রাখতে হবে। তারপরে, যে জায়গায় দিনের পর দিন স্তূপীকৃত ময়লা জমছে, সেই জায়গায় নিশ্চয়ই দুর্গন্ধ বেরোবে। আমি আমার অধীন কর্মচারীদের নির্দেশ দেব, ময়লা জমা জায়গাটাকে যথাসম্ভব পরিষ্কার ক'রে ওখানগুলোতে একটু গাছ লাগিয়ে বেড়া দিয়ে ঘিরে দিতে। গাছ লাগালে জায়গাগুলো অনেক সুন্দরও লাগবে এবং ময়লাও আর বেশী জমবে না। পাড়ায় পাড়ায় আজকাল খুব কুকুরের উৎপাত হচ্ছে। আমি আমার কর্মচারীদের একজন কাউকে গাড়ীতে ক'রে কুকুর তুলে আনার ভার দেব। প্রত্যেক জমাদার ঠিকমতো কাজ করছে কিনা, এসবেরও হিসেব রাখতে আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করব।

পরিবেশ দূষণ এবং তার প্রতিকার আজ সারা বিশ্বের মানুষের মনে সাড়া জাগিয়ে তুলেছে। আমিও আমাদের কলকাতাকে যতটা পারি পরিচ্ছন্ন রাখতে চেষ্টা করব, রাস্তার ময়লা পরিষ্কার ক'রে বাগান তৈরী ক'রে, কুকুর বেড়াল তাড়িয়ে এবং ট্রাফিক জ্যাম কমিয়ে। ট্রাফিক জ্যাম কমাতে গেলে আরওবেশী রাস্তা বানাতে হবে। যেমন শিয়ালদহ বা হাওড়ার উড়াল পুলের মতো আরো অনেকগুলো যদি ওরকম পুল করা যেত তাহলে হয়তো ট্রাফিক জ্যাম অনেকটা কমে যেত, কারণ বেশী রাস্তা এবং কম গাড়ী হলে খুব সুবিধে হবে। গাড়ী, বাস, ট্রাম সবই আলাদা রাস্তা দিয়ে যেতে পারবে। তাহলে রাস্তা মোটামুটি ফাঁকাই থাকবে। তাতে গাড়ীগুলোর একটানা কান ঝালাপালা ক'রে দেওয়া বিশ্রী আওয়াজও শুনতে হবে না। ফলে বড় রাস্তার ওপরেই যাঁদের বাড়ী, তাঁরা একটু শান্তিতে রাত্রি এবং দুপুর কাটাতে পারবেন। এইভাবেই আমি তিলোত্তমা কলকাতাকে শ্রীদান করতে সক্ষম হব।

নিয়মাবলী

লেখক–লেখিকাদের জন্য ঃ মূল্যবোধ ও পরিবেশ ও আজকের দিনের কোন সমস্যা নিয়ে আপনার গল্প বা প্রবন্ধ ছাপতে আমরা আগ্রহী।

লেখা কাগজের একদিকে বাঁদিকে অন্ততঃ এক ইঞ্চি ছেড়ে স্পষ্ট-ভাবে লিখবেন। লেখার নকল রেখে পাঠাবেন।

উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে যথাযথভাবে উদ্ধৃতি চিহ্ন থাকা প্রয়োজন। যে বই থেকে নেওয়া হয়েছে তার নাম, গ্রন্থকারের নাম, প্রকাশকের নাম ঠিকানা, প্রকাশন বর্ষ, সংস্করণ সংখ্যা ইত্যাদির নির্ভুল উল্লেখ আবশ্যক।

অমনোনীত লেখা ফেরত পেতে হ'লে রেজিষ্ট্রী ডাকের উপযুক্ত ডাকটিকিট পাঠাতে হবে।

চিঠির উত্তরের জন্য পঞ্চাশ পয়সার স্ট্যাম্প বা ঠিকানা সম্বলিত খাম / ইনল্যাণ্ড / পোষ্টকার্ড পাঠাতে হবে। লেখা বা চিঠি সংযুক্ত সম্পাদক বা সম্পাদকের নামে পাঠাবেন।

গ্রাহকদের জন্য ঃ জানুয়ারী মাস থেকে বছর আরম্ভ। বছরের প্রথম সংখ্যা থেকে এক বছরের জন্য গ্রাহক হওয়া যায়। বছরের যে কোন সময় বার্ষিক চাঁদা গৃহীত হলেও গ্রাহক করা হবে জানুয়ারী মাস থেকে। বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা সডাক ১৫·০০ টাকা। ভারতের বাইরে $ ১০।

পরের মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের মধ্যে পত্রিকা না পেলে, অবিলম্বে কার্যালয়ে জানালে পুনরায় ঐ সংখ্যা দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু পরবর্তী মাসের মধ্যে না জানালে পত্রিকা প্রাপ্তির নিশ্চয়তা থাকবে না।

রোদসীর চাঁদা মণিঅর্ডারে পাঠালে কুপনে পুরো নাম, ঠিকানা পরিষ্কার করে লেখা প্রয়োজন। মণিঅর্ডার বা পোস্টাল অর্ডারে টাকা পাঠানো যাবে। পোস্টাল অর্ডার বিবেকানন্দ নিধিকে দেয়। **মণিঅর্ডার পাঠানোর ঠিকানা ঃ** ১৪৯/১ই রাসবিহারী অ্যাভিনিউ, কলকাতা-৭০০০২৯। সরাসরি টাকা দিতে গেলে এই ঠিকানা ছাড়াও বিবেকানন্দ নিধি, ৯৯, কড়েয়া রোড, কলকাতা-১৯ ঠিকানায় যে কোন কাজের দিন বিকেল পাঁচটা থেকে সাড়ে সাতটার মধ্যে দেওয়া যাবে।

ঠিকানার পরিবর্তন হলে অন্ততঃ একমাস আগে জানাতে হবে।

Postal Regn No. WB/SC223
৫ম বর্ষ ১ম সংখ্যা, জানুয়ারী ১৯৮৭ Regn No. RN-41095/83

চারিদিকে ভাব ছড়াইতে থাক। গর্বিত হইও না। গোঁড়াদের মত জোর করিয়া কাহাকেও কিছু বিশ্বাস করিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিও না, কোন কিছুর বিরুদ্ধেও বলিও না। আমাদের কাজ কেবল ভিন্ন ভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্য একত্র রাখিয়া দেওয়া।

—স্বামী বিবেকানন্দ

সম্পাদনা, প্রকাশনা ও মুদ্রণ : স্বামী যুক্তানন্দ। সংযুক্ত সম্পাদক—লিপিকা গাঙ্গুলী। সহকারী—ছন্দা বাগচী।
বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা ১৫ টাকা। প্রতি কপি ১ টাকা ৫০ পয়সা।
বিবেকানন্দ নিধি, ৮৬এফ, মনোহরপুকুর রোড, কলিকাতা-২৯,
পাপাই প্রিণ্টার্স ২৩৭, এন, এস, সি, বোস রোড, কলিকাতা-৪৭ হইতে মুদ্রিত।

বোধসী

৫ম বর্ষ ।। ৩য় সংখ্যা ।। মার্চ ১৯৮৭

জগতে সমুদয় ধনরাশির চেয়ে 'মানুষ' হচ্ছে বেশী মূল্যবান
— স্বামী বিবেকানন্দ

বিবেকানন্দ নিধি ও ইনষ্টিট্যুট অফ ভ্যালু ওরিয়েন্টেশন অ্যাণ্ড
এনভায়রনমেন্টাল এডুকেশন-এর মাসিক মুখপত্র

সূচীপত্র

বিজ্ঞান ও মূল্যবোধ	৩৩
মূল্যবোধ চিনে নেবার কৌশল —স্বামী যুক্তানন্দ	৩৪
মূল্যবোধ ও আমরা	৩৬
সুখ —শ্রীমতী শীলা সেন	৩৭
নিধির খবর	৩৯
ছোটদের বিভাগ :	
বিজ্ঞান	৪২
জানবার কথা	৪৩
রেকর্ড	৪৪
ছড়ার আড়ালে	৪৬
নিয়মাবলী	৪৭
Statement	৪৮

রোদসী
৫ম বর্ষ ।। ৩য় সংখ্যা ।। মার্চ ১৯৮৭

বিজ্ঞান ও মূল্যবোধ

[৩]

আমাদের শীত-গ্রীষ্ম বোধ, ক্ষিদে পাওয়ার অনুভূতি বা অন্য কোন জৈবিক প্রয়োজন অনুভব করার জন্য ব্রেণের কোন বিশেষ অংশ দায়ী। জৈবিক প্রয়োজন মিটে গেলে যে তৃপ্তি পাওয়া যায় তারজন্যও ব্রেণ সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। শারীরিক যে ব্যবস্থার জন্য ব্রেণ এই সব কাজ করতে পারে তা খুবই জটিল বিজ্ঞান। আরও অনেক কাজের মধ্যে ব্রেণ আমাদের আচরণ নিয়ন্ত্রণের কাজও করে। কোন বিশেষ পরিস্থিতিতে আমাদের স্বাভাবিক আচরণ যদি রুদ্ধ হয় তা ব্রেণের কাজ। আবার ব্রেণই ঐ বিশেষ পরিস্থিতিতে আমাদের নতুন আচরণে প্ররোচিত করে। আচরণ রুদ্ধ বা নতুন আচরণে প্ররোচিত করার কাজ ব্রেণ হঠাৎ ক'রে নাও করাতে পারে —অনেক সময় আমাদের আচরণের পরিবর্তন একটু রয়ে-সয়ে হয়। তার জন্যও ব্রেণ দায়ী।

জৈবিক প্রয়োজনের অনুভূতি বা প্রয়োজন সাধিত হবার পর তৃপ্তি লাভের জন্য ব্রেণের অবদান আমরা কিছুটা বুঝতে পারি। কিন্তু মানুষের তো শুধু ক্ষিদে পেলে খেলেই চলে না। অনেক সময় মানুষ নিজে অভুক্ত থেকে নিজের খাবার অপরকে দিয়ে দেয়। অথবা কোন মহৎ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য হয়ত নিজের জীবনের সংসারিক উন্নতির পথ পরিত্যাগ ক'রে সহজ, সরল জীবনযাপন করে। অর্থাৎ মানুষকে সিদ্ধান্ত নিতে হয়। সিদ্ধান্ত নিতে হয় অনেক বিকল্পের মধ্য থেকে কোন পথ বেছে নেবে সেই বিষয়ে। এই পথ মানুষ ঠিক করে তার মূল্যবোধ অনুযায়ী। সিদ্ধান্ত নেয় ব্রেণ। ব্রেণের সিদ্ধান্ত নেওয়ার সঙ্গে মূল্যবোধের সম্পর্ক তাই অবিচ্ছেদ্য।

মূল্যবোধ চিনে নেবার কৌশল

স্বামী মুক্তানন্দ

—পূর্ব প্রকাশিতের পর—

গত ৪ মাস রোদসীতে মূল্যবোধ চিনে নেবার কৌশল সম্বন্ধে আমরা আলোচনা করবার চেষ্টা করেছি। এ মাসের আলোচনাকে আমরা এই আলোচনা পর্যায়ের শেষ অংশ ব'লে ধরতে পারি।

মূল্যবোধ চিনে নেবার উপায়ের এই পাঁচটি পরিচ্ছেদ অভিভাবক এবং শিক্ষক শিক্ষিকাদের জন্য উপস্থাপনা করা হয়েছে যাতে তাঁরা নিজেরা বিভিন্ন পরিস্থিতি ও ছেলেমেয়েদের বয়স ও সমস্যার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে মূল্যবোধ চেনার উপায় উদ্ভাবন করতে পারেন।

এ বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করবার জন্য একটি কথার পুনরাবৃত্তি করছি। মূল্যবোধ চেনাবার প্রয়াস মানে কোন বিশেষ মূল্যবোধ, আদর্শ, নীতি, বিশ্বাস ইত্যাদি ছাত্রছাত্রী বা ছেলেমেয়েদের উপর চাপিয়ে দেবার চেষ্টা একেবারেই নয়। প্রচেষ্টাটির তাৎপর্য হচ্ছে শিক্ষক-শিক্ষিকা অথবা অভিভাবক-অভিভাবিকা ও ছাত্রছাত্রী বা ছেলেমেয়েদের একসঙ্গে কি ক'রে মূল্যবোধ গঠন হয় আর কি ক'রেই বা বিভিন্ন মূল্যবোধকে পরীক্ষা করা যায় তার চেষ্টা। এই প্রচেষ্টা ব্যক্তিগত চিন্তার কোনো চাপ থেকে মুক্ত রাখা খুবই কঠিন হয়ে পড়ে।

এই কঠিন হয়ে পড়বার কারণ অভিভাবক-অভিভাবিকার অথবা শিক্ষক-শিক্ষিকার নিজের কিছু বদ্ধ ধারণা যা থেকে নিজেদের নির্লিপ্ত রাখা অত্যন্ত দুরূহ হয়ে ওঠে। কোনো মূল্যবোধকেই সূক্ষ্মভাবে প্রশংসা ক'রে ছেলেমেয়েদের অজান্তে তাদের মাথায় প্রবেশ করিয়ে দেবার চেষ্টা মূল্যবোধ চিনে নেবার প্রয়াসকে সম্পূর্ণভাবে নষ্ট ক'রে দেয়। এইজন্য তাঁরা মূল্যবোধ গঠনের বিভিন্ন কারণ ও মূল্যবোধ পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য ছেলেমেয়েদের সামনে চিন্তার এমন পরিবেশ সৃষ্টি করবেন যাতে তারা নিজেরা স্বাধীনভাবে নিজের চিন্তা-নির্ভর, নিজের বিশ্বাস-নির্ভর এবং নিজ নিজ মূল্যবোধ প্রণালী বা Value System

অনুযায়ী তাদের পছন্দ বা সিদ্ধান্ত জানাবে। এই পছন্দ বা সিদ্ধান্ত তাদের নিজেদের মূল্যবোধের উপর নির্ভর করছে। পরে স্বেচ্ছায় যখন তারা তাদের পছন্দ ও সিদ্ধান্তের কারণ বর্ণনা করবে তখন যে বর্ণনা করছে এবং যারা সে বর্ণনা শুনছে তাদের মধ্যে চিন্তাপ্রণালী কার্যকরী হবে। ছেলেমেয়েদের সঙ্গে অভিভাবক-অভিভাবিকা অথবা শিক্ষক-শিক্ষিকা নিজেরাও তাদের মতো ক'রে এই অনুশীলনে যোগ দিতে পারেন কিন্তু পরস্পরের মতামত বা মতামতের পক্ষে বিপক্ষে বর্ণনার কোনো বিচার তাঁরা করবেন না। চেষ্টাটির মূলকথা ছেলে-মেয়েদের নিজেদের চিন্তা, বিচার শক্তি, বিশ্বাস ও আগে থেকে গ'ড়ে থাকা মূল্যবোধ চেতনার উপর নির্ভর ক'রে কতকগুলি বিকল্প থেকে মূল্যবোধকে বেছে নেওয়া অর্থাৎ Value options থেকে তাদের নিজের নিজের Value judgement করা। সিদ্ধান্ত গ্রহণ বা decision-making এই মূল্যবোধ সম্বন্ধে ধারণার উপর নির্ভরশীল।

মূল্যবোধ চিনে নেবার উপায় নিয়ে পরীক্ষা প্রণালীর প্রচেষ্টার উদ্দেশ্য হ'ল যাতে ছেলেমেয়েরা মুক্ত মতি নিয়ে স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে।

কাজেই আবারও দৃঢ়ভাবে এই কথাটি বলছি যে মূল্যবোধের গঠন নির্ণয় বা মূল্যবোধ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার প্রয়াস কখনই প্রচলিত ধর্মপ্রচার, নীতিশিক্ষা, আদর্শবাদ চাপিয়ে দেবার প্রয়াস নয়। এই প্রয়াসের প্রথম ব্যাপারটি হচ্ছে প্রয়াসটির সঙ্গে অভিভাবক অভি-ভাবিকা, শিক্ষক-শিক্ষিকা ও ছেলেমেয়েদের সম্পূর্ণ যোগ বা involvement।

এরপরে রোদসীতে ছোটদের জন্য মূল্যবোধ চিনে নেবার পরিস্থিতি ও বয়স অনুসারে কিছু কিছু কৌশল বা অনুশীলন বর্ণনা করা হবে। উদ্দেশ্য, এগুলিকে বাড়ীতে বা স্কুলে কাজে লাগানো যেতে পারে, অথবা এই ধরনের আরও উপায় উদ্ভাবন করা যেতে পারে। 'মূল্যবোধ চিনে নেবার উপায়' পরীক্ষা নিয়ে পড়াবার মত কোনো বিষয় নয় অথবা এই বিষয়ে আলাদা আলাদা সময়ও যে রাখতেই হবে এমন কোনো প্রশ্ন নেই। বিভিন্ন বিষয় পড়াবার সময়ে অত্যন্ত ঘরোয়াভাবে অল্প কয়েক মিনিটের জন্য বিভিন্ন ক্লাসে অথবা বাড়ীতে গল্পচ্ছলে খেলার মতো আনন্দদায়ক ভাবে এই চর্চা করা যেতে পারে।

[শেষ]

মূল্যবোধ ও আমরা

[Value Orientation এ প্রকাশিত 'Values & Ourselves' অনুসরণে]

—পূর্বপ্রকাশিতের পর - -

মূল্যবোধ এবং গণতন্ত্র :

মূল্যবোধ সংক্রান্ত আলোচনার ক্ষেত্রে গণতন্ত্র (Democracy) সমাজতন্ত্র (Socialism) এবং ধর্ম (মত) নিরপেক্ষতার (Secularism) মূল্যবোধের কথা প্রসঙ্গক্রমে এসে পড়ে। ভারতীয় সংবিধানে এই তিনটি বিষয়কে যথেষ্ট উচ্চ মূল্য দেওয়া হয়েছে। আমরা প্রথমে গণতন্ত্রের মূল্যবোধ নিয়ে আলোচনা করব।

রাজনৈতিক ধারণা হিসেবে গণতন্ত্র অর্থে এমন একটি সামাজিক অবস্থা যেখানে সকলেরই সম ম অধিকার। গণতান্ত্রিক ধারার শাসন ব্যবস্থায় পারিবারিক সূত্রে বা ইচ্ছানুযায়ী কোন ক্রমপর্যায়ের পার্থক্য বা বিশেষ সুবিধা পাওয়া যায়না। এই শাসনব্যবস্থা জনসাধারণের দ্বারা গঠিত এবং এক্ষেত্রে সার্বভৌমিক ক্ষমতা জনসাধারণের হাতেই ন্যস্ত। নির্বাচনের মাধ্যমে জনসাধারণ তাঁদের হয়ে শাসন করার ক্ষমতা কিছু নির্বাচিত ব্যক্তির উপর দেন। এইভাবে প্রতিটি পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তিই সরকার গঠনের ক্ষেত্রে সমান ক্ষমতার অধিকারী, অর্থাৎ গণতন্ত্র মানুষকে মর্যাদা দেয়।

গণতন্ত্র একদিকে যেমন মানুষকে স্বীকৃতি এবং মর্যাদা দেয় অপর-দিকে আবার গণতন্ত্র প্রতিটি মানুষের কাছে দেশবাসী হিসেবে পরিণত আচরণ দাবী করে। এই হচ্ছে গণতন্ত্রের মূল্যবোধের সামাজিক এবং রাজনৈতিক দিক।

ভারতীয় জ্ঞান মানুষের মর্যাদার যে রাজনৈতিক ধারণা তার থেকে অনেকে গভীরে চিন্তা করে। ভারতীয় ঐতিহ্যে মানুষকেই সর্বোচ্চ বাস্তব বলা হয় এবং আরও বলা হয় মানুষ ও পরম সত্তা এক এবং অভিন্ন। মানুষের মর্যাদাকে স্বর্গীয় মর্যাদায় উত্তীর্ণ করা হয়। ভারতীয় জ্ঞানের তৎ ত্বম-অসি এই কথাই প্রতিষ্ঠা করে যে স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব এবং পরম সত্তার মধ্যে কোনই পার্থক্য নেই।

সুখ

শ্রীমতী লীলা সেন
(শিক্ষিকা, নিবেদিতা স্কুল)

মনে হয় তুমি মরীচিকা।
নাহ'লে নাগাল পাই না কেন তোমার ?
শৈশবে মনে হত তুমি আছ খেলাঘরে
অথবা মায়ের আঁচলের তলায়।
বাল্যেই শুরু হয়ে গেল খোঁজা—
শুনলাম কৃতী ছাত্রের হাতের মুঠোয়

['মূল্যবোধ ও আমরা'র শেষাংশ]

যদিও মানুষকেই সর্বোচ্চ ব'লে গ্রহণ করা হয়েছে তবুও সেইসঙ্গে এও বলা হয় যে সে এক সামগ্রিক সত্তার অংশ। মানুষের স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বের সঙ্কীর্ণ প্রকাশ তার বৃহত্তর পর্যায়ে সামগ্রিক সত্তার অংশ হিসেবে যে প্রকাশ তার থেকে নিম্নস্তরের।

গণতন্ত্র মানুষকে স্বাধীনতা দেয়। এই স্বাধীনতা বলতে বোঝায় নিজের বিবেক অনুযায়ী কাজ করার স্বাধীনতা, অর্থাৎ মানুষ হবে 'স্ব অধীন'। যদি কোন ব্যক্তি পরিণতমনস্ক না হয় অর্থাৎ তার বিবেক যদি জাগ্রত না হয় তাহ'লে সে সমাজে স্বাধীনভাবে চলাফেরা করার অধিকারী হতে পারেনা, যেমন একজন উন্মাদকে কখনই স্বাধীনভাবে থাকতে দেওয়া যেতে পারেনা।

যদি কোন ব্যক্তিকে ভয় দেখিয়ে তাকে দিয়ে এমন কোন কাজ করানো হয় যা সমাজের পক্ষে ক্ষতিকারক অথবা লোভ দেখিয়ে তাকে দিয়ে সামাজিক বিধিনিয়ম ভাঙ্গানো হয় তবে সে তার বিবেক অনুযায়ী কাজ করেছে বলা যাবেনা। তখন সে আর স্ব-অধীন থাকছেনা। সুতরাং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ বলতে বোঝায় সমসাময়িক জীবনের নৈতিক মূল্যবোধ অনুযায়ী সামাজিক বিধিনিয়মকে মর্যাদা দিয়ে একজন ব্যক্তির স্বতঃস্ফূর্ত দৃষ্টিভঙ্গী। গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ হচ্ছে মানবিক গুণাবলী উন্নয়নের ক্ষেত্রে ব্যক্তির স্ব আরোপিত মূল্যবোধ নিয়ন্ত্রিত পথ।

[ক্রমশঃ]

তোলা থাক তুমি।
নিশ্চিন্ত বোধ করলাম।

মনে হ'ল ঠিকানাই যখন থাকল জানা,
পেতেও তাকে দেরী হবে না।
কিন্তু পাঠ শেষে? কোথায় গেলে তুমি?
কেউ বলে কর্মযশে, কেউ অর্থপাশে—
আবার কেউ বলে—ও সবেরই নাশে।
শুরু হ'ল আবার খোঁজা—
আমি খুঁজছি, বন্ধু খুঁজছে, মা খুঁজছে;
বাবাও খুঁজছে;
স্ত্রী খুঁজছে, স্বামী খুঁজছে, ধনী খুঁজছে
গরীবও খুঁজছে।
খুঁজতে খুঁজতেই দুনিয়া ছুটছে॥
লোভী খুঁজছে লোভে,
পাপী খুঁজছে পাপে,
খুনী খুঁজছে 'লালে'
নেতা খুঁজছে দলে।

তবু হাসি পায় খুব
যখন দেখি পায়নি তোমায় কেউ।
আরও হাসি পায় কখন জান?
ক্ষমতায় অন্ধ যখন বলে 'পেয়েছি'
অর্থে মত্ত যখন বলে 'পেয়েছি'
আর হিরোসিমার কান্নার পরেও
বোমা বানানোর অবিরাম তাগিদে,
মানুষ যখন বলে 'পেয়েছি'॥

কান্না পায় কখন জান?
ভক্তের ক্ষীণ কণ্ঠ যখন শোনেনা কেউ
প্রেমের দুয়ার খুলে যখন আসেনা কেউ
আঁধার পারের বিশ্বাসের দীপটি

নিধির খবর

ঝাড়গ্রামের শ্রীরামকৃষ্ণ সারদাপীঠ (কন্যাগুরুকুল) এর পাঁচজন শিক্ষিকা 'মূল্যবোধ প্রতিবিন্যাস' বিষয়ক একটি প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন বিবেকানন্দ নিধিতে। ঐ বিদ্যালয়ে ১৯৮৭ র শিক্ষাক্রমে 'মূল্যবোধ প্রতিবিন্যাস' পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

*

নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু এবং স্বামী বিবেকানন্দের জন্মবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে ২৬শে জানুয়ারী কলকাতার নেপাল ভট্টাচার্য ষ্ট্রীটে আয়োজিত হয় মূল্যবোধের ধাঁধার আসর। আসরে যোগদানকারীরা ছিল মূলতঃ অষ্টম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রছাত্রী। কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের সিস্টার এবং বিবেকানন্দ নিধির কর্মী শ্রীমতী অঞ্জনা সেন আসর পরিচালনা করেন। কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের রীডার ডঃ হৃষীকেশ ব্যানার্জী, শ্রীমতী মৈত্রেয়ী ঘোষ ডি, এম, এস, ও শিক্ষিকা শ্রীমতী সুলেখা ভট্টাচার্য বিচারকের স্থান গ্রহণ করেন।

*

বেঙ্গল অবস্‌টেট্রিক্স, গায়নোকোলজিক্যাল সোসাইটী এবং ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন অফ পেরিন্যাটোলজি অ্যাণ্ড রিপ্রোডাকটিভ বায়োলজির যৌথ উদ্যোগে একটি সম্মেলন আয়োজিত হয় নন্দন প্রেক্ষাগৃহে ৭ই এবং ৮ই ফেব্রুয়ারী। কলকাতা হাইকোর্টের মাননীয় প্রধান বিচারপতি শ্রীচিত্ততোষ মুখার্জি সম্মেলন উদ্বোধন করেন। এই সম্মেলনের বিশেষ অতিথি ছিলেন স্বামী যুক্তানন্দ।

['সুখ' কবিতার শেষাংশ]

যখন জ্বালেনা কেউ ॥

তুমি তাই
হয়ে থাক
সুদূরের অদেখা
শুধুই মরীচিকা ॥

বিবেকানন্দ নিধির বার্ষিক পদযাত্রা অনুষ্ঠিত হয় ৮ই ফেব্রুয়ারী। এই পদযাত্রা সকাল সাড়ে আটটায় দেশপ্রিয় পার্ক থেকে শুরু হয়ে শরৎচন্দ্র বসু রোড, যতীন দাস রোড, পূর্ণ দাস রোড, গোলপার্ক, গড়িয়াহাট রোড এবং রাসবিহারী অ্যাভিনিউ হয়ে আবার দেশপ্রিয় পার্কে ফিরে আসে। পরে দেশপ্রিয় পার্কে একটি ছোট সভা আয়োজিত হয়। এবারে পদযাত্রায় যোগদানকারীদের মধ্যে ছিলেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ন্যাশনাল সার্ভিস স্কীম, কলেজ অফ নার্সিং এর ছাত্রীরা, জগদ্বন্ধু ইন্সটিটিউশন, বিহারীলাল কলেজ, বাংলার ব্রতচারী সমিতি, পূর্ব রেলের ভারত স্কাউটস অ্যাণ্ড গাইডস, প্রজাপিতা ব্রহ্মকুমারী, আমরা সবাই এবং সব পেয়েছি আসরের বিভিন্ন শাখা।

*

'মূল্যবোধ প্রতিবিন্যাস এবং মানবিক গুণাবলীর উন্নয়ন' বিষয়ক একটি তিনদিনব্যাপী শিক্ষাক্রম আয়োজিত হয় বিবেকানন্দ নিধিতে ১৩-১৫ই ফেব্রুয়ারী। শিক্ষাক্রমে যোগদানকারী ৪৬ জনের মধ্যে ছিলেন প্রধানতঃ ট্রেনড নার্সেস অ্যাসোসিয়েশনের পশ্চিমবঙ্গ শাখার সদস্যারা। প্রফেসর অম্লান দত্ত শিক্ষাক্রমে একটি ক্লাস নেন এবং দীক্ষান্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। দীক্ষান্ত ভাষণ দেন কলকাতা হাইকোর্টের মাননীয় প্রধান বিচারপতি শ্রীচিত্ততোষ মুখার্জি।

*

২১শে ফেব্রুয়ারী কলকাতার ইণ্ডিয়ান ইন্সটিটিউট অফ ম্যানেজমেন্ট 'Human Response Development : Some Indian Insights' এই বিষয়ে একটি কর্মশালা উদ্বোধন করেন উপরাষ্ট্রপতি শ্রীআর ভেঙ্কটরমন। কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল অধ্যাপক নুরুল হাসান। ডঃ এস কে চক্রবর্তী কর্মশালাটি পরিচালনা করেন। স্বামী যুক্তানন্দ কর্মশালাটির একটি অধিবেশনে আলোচনা করেন এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার সভা পরিচালনা করেন এবং দীক্ষান্ত ভাষণ দেন। অধ্যাপক অম্লান দত্ত ও শ্রী এল এন ঝুনঝুনওয়ালা এবং আরো অনেকে বিভিন্ন অধিবেশন পরিচালনা করেন।

কালিকট বিশ্ববিদ্যালয়ের কমার্স এবং ম্যানেজমেন্ট স্টাডিজ বিভাগে 'Executive Development' বিষয়ে একটি তিনদিনব্যাপী আলোচনাচক্র পরিচালনা করবে বিবেকানন্দ নিধি। মার্চ মাসের ১২ তারিখ থেকে আয়োজিত এই আলোচনা সভায় অংশ নেবেন বিবেকানন্দ নিধির শিক্ষাক্রম পরিচালক ও কলকাতার ইণ্ডিয়ান ইন্সটিটিউট অফ ম্যানেজমেণ্টের অধ্যাপক শ্রীএস কে চক্রবর্তী, কানাডার মেমোরিয়াল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা শ্রীমতী পূর্ণিমা সেন, IRBI এর ম্যানেজার এবং বিবেকানন্দ নিধির কর্মী শ্রীমতী রুমা গুহ এবং স্বামী যুক্তানন্দ। স্বামী যুক্তানন্দ 'Consumer Satisfaction of the product of the Education' এই বিষয়ে একটি সভা ও পরিচালনা করবেন।

*

এপ্রিলের ৩-৫ তারিখে শান্তিনিকেতনে পাঠভবন স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য একটি শিক্ষাক্রম পরিচালনা করবে বিবেকানন্দ নিধি।

*

'মূল্যবোধ প্রতিবিন্যাস এবং মানবিক গুণাবলী উন্নয়ন' বিষয় আর একটি শিক্ষাক্রম আয়োজিত হবে বিবেকানন্দ নিধিতে এপ্রিলের ১৭-১৯ তারিখে। আগ্রহী ব্যক্তিরা বিবেকানন্দ নিধির ৯৯ কড়েয়া রোডের গবেষণা ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে যোগাযোগ করতে পারেন।

চাইছ চূড়ান্ত শান্তি, নির্বাধ স্বাধীনতা, অমৃতত্ব ও চিরসুখ। খুঁজছ ভঙ্গুর বস্তুরাশি সংগ্রহ থেকে, অপরকে দাস বানিয়ে, পচনশীল যৌবন থেকে আর বিকৃতিশীল ভোগ্যপণ্য থেকে। তাও কি সম্ভব? চূড়ান্ত লক্ষ্য লাভ করতে হলে লক্ষ্যের উৎস শাশ্বত হতেই হবে।

— বিবেকানন্দ নিধি

বিজ্ঞান

উল্কা

১৯৪৭ সাল। সাইবেরিয়ার মানুষ আকাশে একটা খুব উজ্জ্বল গোলক দেখল। এই গোলকের একটা পুচ্ছও ছিল। গোলকটা আকাশের দক্ষিণ দিক দিয়ে খুব দ্রুত গতিতে যাচ্ছিল। কিন্তু মাত্র কয়েক সেকেণ্ড এই গোলকটা দেখা গিয়েছিল। তারপরই আকাশে দেখা গেল ধূয়েরী ধোঁয়ার বিশাল স্তম্ভ। সাইবেরিয়াতে আকাশে এই রকম বস্তু আগেও দেখা গেছে। ১৯০৮ সালের ৩০শে জুন সাইবেরিয়ার টুংগুস্কা অঞ্চল ঐরকম উল্কার আঘাতে একেবারে বিধ্বস্ত হয়ে গিয়েছিল।

এই উল্কার ক্ষমতা ৩০ মেগাটন হাইড্রোজেন বোমা বা ৩০০ লক্ষ টন টি এন টির ধ্বংসের ক্ষমতা থেকেও বেশী হয়।

উল্কা তৈরী হয় পাথর দিয়ে অথবা নিকেল আর লোহা মিশ্রিত সঙ্কর ধাতু দিয়ে। বৈজ্ঞানিকরা মনে করেন এই উল্কা আমাদের সৌর-জগৎ থেকেই আসে। ধুমকেতু বা উপগ্রহ থেকে এদের সৃষ্টি।

বিশহাজার বছর আগে আমেরিকার আরিজোনা মরুভূমিতে লোহা নিকেলের প্রায় বিশ লক্ষ টনের একটা উল্কাপাত হয়েছিল। উল্কাপাতের ফলে আরিজোনা মরুভূমিতে ১ মাইল চওড়া আর ৫৭০ ফিট গভীর একটা গর্ত তৈরী হয়েছিল।

উল্কাপাতের ফলে পৃথিবীটাই ধ্বংস হয়ে যেতে পারত। ১৯৩৭ সালের ৩০শে অক্টোবর হারমেস্ নামের একটি উপগ্রহ আলোর গতিতে পৃথিবীর খুব কাছ দিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল। এর গতিপথের একটু পরিবর্তন হলে পাঁচলক্ষ টনের এই গ্রহটি পৃথিবীর উপর আছাড় খেয়ে পড়ত আর পৃথিবীটা সেই ধাক্কা সামলাতে না পেরে ধ্বংস হয়ে যেত।

জানবার কথা

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ

(১৯১৪-১৮)

রাজকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

১৯১৪ সালের ২৮শে জুন, রবিবার, সারবিয়ার অধিবাসী গ্যাভরিলো প্রিন্সিপ নামে ১৮ বছরের এক ছাত্র অষ্ট্রিয়া-হাঙ্গেরী সাম্রাজ্যের সম্রাট ফ্রান্সিস জোসেফ এর ভ্রাতুষ্পুত্র এবং পরবর্তী উত্তরাধিকারী ফ্রান্সিস ফার্ডিন্যাণ্ড ও তাঁর স্ত্রীকে হত্যা করেছিল। এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছিল বোসনিয়ার পূর্ববর্তী রাজধানী সারাজেভোতে। প্রিন্সিপ ছিল এক গুপ্ত উগ্রপন্থী দলের সদস্য। ঐ দলের সদস্যরা বোসনিয়াকে অষ্ট্রিয়ার শাসন থেকে মুক্ত করতে এবং সারবিয়ার সঙ্গে যুক্ত করতে চেয়েছিল (বর্তমানে যুগোস্লাভিয়ার দুটি অংশ হ'ল বোসনিয়া এবং সারবিয়া)। প্রিন্সিপের সেই হত্যাকাণ্ড স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য হলেও ক্রমশঃ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অন্যতম কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এই প্রচণ্ড সংঘাত ৪ বছরের বেশী সময় ধরে চলেছিল, ৩০টিরও বেশী রাষ্ট্র এই সংঘাতের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েছিল, ২০,০০০,০০০ এরও বেশী জীবন ধ্বংস করেছিল, কোটি কোটি অর্থ-ব্যয় হয়েছিল, সমগ্র ইউরোপ তছনছ হয়ে গিয়েছিল। বহু সম্রাটের পতন ঘটেছিল এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বীজ বপন ক'রে গিয়েছিল।

সংঘাতের প্রেক্ষাপট : প্রিন্সিপের হত্যাকাণ্ডের আগে থেকেই ইউরোপ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের জন্য পরিপুষ্ট হয়ে উঠেছিল। মোটামুটি ১৮৭১ সাল থেকেই প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রেক্ষাপট তৈরী হতে থাকে। ঐ বছরেই জার্মানীর চ্যান্সেলর অটো ভন বিসমার্ক (১৮১৫-৯৮) ফ্রান্সকে গুঁড়িয়ে দিয়েছিল অল্পদিনের ফ্রান্স ও প্রুসিয়ার যুদ্ধে। যুদ্ধের শেষে ফ্রান্সের সঙ্গে বিসমার্ক এক কড়া চুক্তি করেন। এই চুক্তির ফলে ফ্রান্স হারায় তার দুটি ধনী প্রদেশ—আল্‌সেস্ এবং লোরেন। এছাড়াও জার্মানীকে ফ্রান্স কোটি কোটি ফ্রাঁ ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য হয়। এই যুদ্ধের ফলেই জার্মানী ইউরোপের সবচেয়ে শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত

(৪৫ পৃষ্ঠায়)

রেকর্ড

রেকর্ড জমানোর নেশা একটা অতি পরিচিত ঘটনা। এই রেকর্ড জমানো মানুষে শুরু করেছিল প্রায় ১৮৯০ সালের কাছাকাছি সময় থেকে যখন প্রথম গান বাজনা রেকর্ড করা শুরু হয়। সেই সময়ে বড় বড় গাইয়েরা বা বাজিয়েরা প্রথমে কিন্তু মোটেই নিজের গান বা বাজনা রেকর্ড করার পক্ষপাতী ছিলেন না। অনেক বলে কয়ে কিছু উচ্চশ্রেণীর শিল্পীকে রাজী করানো গিয়েছিল। টমাস আলভা এডিসন আবিষ্কৃত ফোনোগ্রাফ যন্ত্রে বাজানোর জন্য তখন রেকর্ড করা হত। প্রথম যুগের রেকর্ডের চেহারা কিন্তু আমরা এখন রেকর্ড যেরকম দেখি সেরকম ছিল না, ছিল একটি চোঙ বা সিলিণ্ডারের মতো। সেই সিলিণ্ডার রেকর্ডের আওয়াজও তেমন উচ্চমানের ছিল না।

এমিল বার্লিনার (১৮৫১-১৯২৯) নামে এক ভদ্রলোক প্রথম চাপ্টা গোল রেকর্ড তৈরীর পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন যেরকম রেকর্ড এখনও দেখা যায়। তিনি ১৮৯৪ সাল থেকে নিজের রেকর্ড বাজানোর যন্ত্র বাজারে বিক্রী করতে শুরু করেন। তিনিই এই যন্ত্রের নাম দেন গ্রামোফোন।

রেকর্ডের জগতে এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে ১৯০২ সালে যখন এনরিকো ক্যারুসো নামে এক গায়ক ইটালীর মিলান শহরে মোমের ওপর রেকর্ড করেন। এই মোমের রেকর্ড আবার নিয়ে যাওয়া হয় জার্মানী হ্যানোভার শহরে ডিস্কে পরিণত করার জন্য। এই রেকর্ডগুলি অভূতপূর্ব সাড়া জাগিয়েছিল এবং যার ফলে রেকর্ড করার পদ্ধতিই অনেক সম্মান লাভ করেছিল এবং ক্যারুশোর এই সাফল্য দেখেই তখনকার অনেক বিখ্যাত শিল্পীও রেকর্ড করতে উৎসাহিত হন।

প্রথম আবিষ্কারের পর আশাতিরিক্ত হারে রেকর্ড বিক্রী কমতে শুরু করে ১৯২৩ সালে রেডিও প্রথম আত্মপ্রকাশ করার পর। ফলে রেকর্ডের উন্নতি ঘটানোর দিকে সকলে মনোযোগী হতে বাধ্য হন। ১৯২৫ সালে রেকর্ডের জগতে এক বিরাট পরিবর্তন সূচিত করে। এই সময় প্রথম রেকর্ড তৈরীর ব্যাপারে বৈদ্যুতিক শক্তি ব্যবহার শুরু হয়। বৈদ্যুতিক শক্তি ব্যবহার ক'রে প্রথম দিকে তৈরী রেকর্ডের

মধ্যে যেটি পাওয়া যায় সেটি রেকর্ড করা হয়েছিল নিউইয়র্কের মেট্রোপলিটনে অপেরা হাউসে ১৯২৫ সালের ৩১শে মার্চ। এই রেকর্ড তৈরী হবার পর দেখা গেল এ এরকম আওয়াজ ফোনোগ্রাফ রেকর্ডে কখনই পাওয়া যায়নি। এরপর রেকর্ড তৈরীর বৈচিত্র এবং সংখ্যা এতই বেড়ে গেল যে স্পষ্ট বোঝা গেল মানুষের সাংস্কৃতিক এবং সামাজিক জীবনে রেকর্ড বশ স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করতে চলেছে।

প্রথম আবিষ্কারের পর ৫০ বছর পর্যন্ত রেকর্ডের ডিস্কের ব্যাস ছিল ১০ থেকে ১২ ইঞ্চি। এই রেকর্ড প্রতি মিনিটে ৭৮ বার ঘুরত এবং ১২ ইঞ্চি ডিস্ক হলে সাড়ে চার মিনিট এবং ২০ ইঞ্চি হলে ৩ মিনিট চলত। এতে মনে হত শুরু হবার আগেই যেন শেষ হয়ে গেল। ফলে চেষ্টা চলতে লাগল এমন রেকর্ড তৈরী করার যা চলবে বেশী সময় ধরে। এই প্রচেষ্টায় আবিষ্কার হ'ল লং প্লেয়িং রেকর্ড যা প্রতি মিনিটে সাড়ে ৩৩ বার ঘোরে এবং চলে প্রায় ৩০ মিনিট। আরো এক ধরণের রেকর্ড তৈরা হ'ল যা মিনিটে ৪৫ বার ঘোরে। এখন প্রায় সবধরণের গান বাজনাই লং প্লেয়িং রেকর্ডে চালাবার প্রবণতা দেখা দিয়েছে।

বর্তমান যুগে অবশ্য গান শুধুমাত্রই রেকর্ডেই শোনা যায় না। টেপ রেকর্ডারের আবিষ্কারের পর থেকে রেকর্ড বিক্রী আরও কমতে শুরু করে। ব্যবহার এবং সংগ্রহ করার সুবিধার জন্য অনেকেই এখন রেকর্ড ডিস্কের থেকে টেপ রেকর্ডার এবং ক্যাসেটকেই বেশী পছন্দ করছেন।

['জানবার কথা'র শেষাংশ]

হয়। কিন্তু বিসমার্কের বিশ্বাস ছিল যে, একদিন ফ্রান্স তার হৃতগৌরব পুনরুদ্ধারের জন্য পুনরায় তার হারানো রাজ্য দুটি জয় ক'রে নিতে পারে। এই জন্য বিসমার্ক জার্মানীর সঙ্গে অষ্ট্রিয়া, হাঙ্গেরী এবং ইটালীকে যুদ্ধের সময় পারস্পরিক সহযোগিতার এক ত্রিপাক্ষিক চুক্তি সম্পাদন করতে বাধ্য করেন। ফ্রান্সও জার্মানীর ভয়ে ১৮৯৩-৯৪ সালে রাশিয়ার সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সামরিক চুক্তি সম্পাদন করে। ১৯০৪ সালে ফ্রান্স এবং ইংলাণ্ড পারস্পরিক আঁতাতের ফলে যে দ্বিপাক্ষিক শক্তি তৈরী করেছিল, ১৯০৭ সালে রাশিয়া যোগদান করায় সেই শক্তি ত্রিপাক্ষিক শক্তিতে পরিণত হয়। এই ভাবেই সমগ্র ইউরোপ পরস্পর বিরোধী দুটি বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল।

ছড়ার আড়ালে

ছড়া প্রসঙ্গে প্রায়ই বলা হয়ে থাকে ছেলে ভুলনো ছড়া অর্থাৎ বাচ্চাদের ভোলাবার জন্যই ছড়া। কিন্তু যে সব ছড়া ব'লে বাচ্চাদের ভোলানোর চেষ্টা করা হয় অনেক সময়ই তাদের উৎপত্তি খুঁজতে গেলে দেখা যাবে বেশীর ভাগই কোন বাস্তব ঘটনাকে কেন্দ্র ক'রে বলা হয়ে থাকে পরে লোকমুখে ছড়ার রূপ পায়। আমাদের দেশে যে 'খোকা ঘুমলো পাড়া জুড়লো বর্গী এল দেশে' ছড়াটি প্রচলিত আছে সেটি আসলেই বর্গী আক্রমণের আশঙ্কার সঙ্গে যুক্ত। আর একটি বহুল প্রচারিত ছড়া 'এলাটিং বেলাটিং সইলো/কিসের খবর আইল/রাজামশাই একটি বালিকা চাইল .....।' এই ছড়াটি সম্বন্ধে বলা হয় এটি একটি করুণ রসের ছড়া। আগেকার কালে রাজারা গ্রামগঞ্জ থেকে ক্রীতদাসী করার জন্য বা অন্য উদ্দেশ্যে মেয়েদের তুলে নিয়ে যেতেন সেই সম্বন্ধে লেখা।

সারা পৃথিবীতে প্রচলিত 'জ্যাক অ্যাণ্ড জিল' ছড়াটি সম্বন্ধে এই ধরণের কাহিনী জড়িত আছে। অনেকে বলেন এটির একটি রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট আছে যা আজ সকলে ভুলে গেছে। এই ছড়াটি সম্বন্ধে একটি মত পাওয়া যায় যে ছড়ায় জ্যাক এবং জিল বাস্তবে এম্পসন এবং ডাডলি নামে দুজন রাজকর্মচারী। এঁরা সপ্তম হেনরীর সময়ে রাজস্ব আদায়ের কাজ করতেন এবং রাজস্ব আদায়ের জন্য এত অত্যাচার করতেন যে লোকে তাঁদের অত্যাচারে অতিষ্ট হয়ে উঠেছিলেন ফলে অষ্টম হেনরীর রাজত্বকালে রাজদ্রোহিতার অপরাধের জন্য যখন তাঁদের মাথা কেটে ফেলা হয় তখন লণ্ডনবাসীরা হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছিলেন। এই ছড়াটির উৎপত্তি সম্বন্ধে অপর একটি মত আছে। এখানে বলা হয় স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার উপকথায় যে জুকি এবং বিল এর কথা পাওয়া যায় যারা জল আনতে যাবার পথে চাঁদ তাদের চুরি করে, তারাই হচ্ছে ছড়ার জ্যাক এবং জিল।

নিয়মাবলী

লেখক–লেখিকাদের জন্য ঃ মূল্যবোধ ও পরিবেশ বা আজকের দিনের কোন সমস্যা নিয়ে আপনার গল্প বা প্রবন্ধ ছাপতে আমরা আগ্রহী।

লেখা কাগজের একদিকে বাঁদিকে অন্ততঃ এক ইঞ্চি ছেড়ে স্পষ্ট-ভাবে লিখবেন। লেখার নকল রেখে পাঠাবেন।

উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে যথাযথভাবে উদ্ধৃতি চিহ্ন থাকা প্রয়োজন। যে বই থেকে নেওয়া হয়েছে তার নাম, গ্রন্থকারের নাম, প্রকা-শকের নাম ঠিকানা, প্রকাশন বর্ষ, সংস্করণ সংখ্যা ইত্যাদির নির্ভুল উল্লেখ আবশ্যক।

অমনোনীত লেখা ফেরত পেতে হ'লে রেজিষ্ট্রী ডাকের উপযুক্ত ডাকটিকিট পাঠাতে হবে।

চিঠির উত্তরের জন্য পঞ্চাশ পয়সার স্ট্যাম্প বা ঠিকানা সম্বলিত খাম / ইনল্যাণ্ড / পোষ্টকার্ড পাঠাতে হবে। লেখা বা চিঠি সংযুক্ত সম্পাদক বা সম্পাদকের নামে পাঠাবেন।

গ্রাহকদের জন্য ঃ জানুয়ারী মাস থেকে বছর আরম্ভ। বছরের প্রথম সংখ্যা থেকে এক বছরের জন্য গ্রাহক হওয়া যায়। বছরের যে কোন সময় বার্ষিক চাঁদা গৃহীত হলেও গ্রাহক করা হবে জানুয়ারী মাস থেকে। বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা সডাক ১৫·০০ টাকা। ভারতের বাইরে $ ১০।

পরের মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে পত্রিকা না পেলে অবিলম্বে কার্যালয়ে জানালে পুনরায় ঐ সংখ্যা দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু পরবর্তী মাসের মধ্যে না জানালে পত্রিকা প্রাপ্তির নিশ্চয়তা থাকবে না।

চাঁদা মণিঅর্ডারে পাঠালে কুপনে পুরো নাম, ঠিকানা পরিষ্কার ক'রে লেখা প্রয়োজন। মণিঅর্ডার বা পোস্টাল অর্ডারে টাকা পাঠানো যাবে। পোস্টাল অর্ডার বিবেকানন্দ নিধিকে দেয়। **মণিঅর্ডার পাঠানোর ঠিকানা ঃ** ১৪৯/১ই রাসবিহারী অ্যাভিনিউ, কলকাতা-৭০০০২৯। সরাসরি টাকা দিতে গেলে এই ঠিকানা ছাড়াও বিবেকানন্দ নিধি, ৯৯, কড়েয়া রোড, কলকাতা-১৯ ঠিকানায় যে কোন কাজের দিন বিকেল পাঁচটা থেকে সাড়ে সাতটার মধ্যে দেওয়া যাবে।

ঠিকানার পরিবর্তন হলে অন্ততঃ একমাস আগে জানাতে হবে।

Statement about ownership and other particulars about the bulletin 'RODASI' to be published in the first issue every year after the last day of February.

FORM IV

1.	Place of publication	:	Vivekananda Nidhi Calcutta 700 029
2.	Periodicity of publication	:	Monthly
3.	Printer's name	:	Swami Yuktananda
	Nationality	:	Indian
	Address	:	Vivekananda Nidhi 86F, Monoharpukur Road Calcutta 700 029
4.	Publisher's name	:	Swami Yuktananda
	Nationality	:	Indian
	Address	:	Vivekananda Nidhi 86F, Monoharpukur Road Calcutta 700 029
5.	Editor's name	:	Swami Yuktananda
	Nationality	:	Indian
	Address	:	Vivekananda Nidhi 86F, Monoharpukur Road Calcutta 700 029
6.	Names and address of individuals who own the newspaper and partners or shareholders holding more than one percent of the total share capital	:	Swami Yuktananda R K Bhattacharya A K Sen, all trustees, Vivekananda Nidhi 86F, Monoharpukur Road Calcutta 700 029

I, Swami Yuktananda, hereby declare that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief.

15th March, 1987

Sd/-
Swami Yuktananda
Signature of Publisher

Postal Regn No. WB/SC223
৫ম বর্ষ ৩য় সংখ্যা, মার্চ ১৯৮৭ Regn No. RN-41065/83

আমি বিশ্বাস করি ভারতবর্ষ এক, অবিভাজ্য। এক আবাস, এক স্বার্থ ও এক সম্প্রীতির উপরই জাতীয় ঐক্য বর্তিত।

—ভগিনী নিবেদিতা

সম্পাদনা, প্রকাশনা ও মুদ্রণ : স্বামী যুক্তানন্দ। সংযুক্ত সম্পাদক—লিপিকা গাঙ্গুলী। সহকারী—ছন্দা বাগচী।
বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা ১৫ টাকা। প্রতি কপি ১ টাকা ৫০ পয়সা।
বিবেকানন্দ নিধি, ৮৬এফ, মনোহরপুকুর রোড, কলিকাতা-২৯,
পাপাই প্রিন্টার্স ২৩৭, এন, এস, সি, বোস রোড, কলিকাতা-৪৭ হইতে মুদ্রিত।

বোধসী

৫ম বর্ষ ।। ৪র্থ সংখ্যা এপ্রিল ।। ১৯৮৭

জগতে সমুদয় ধনরাশির চেয়ে 'মানুষ' হচ্ছে বেশী মূল্যবান

—স্বামী বিবেকানন্দ

বিবেকানন্দ নিধি ও ইনষ্টিট্যুট অফ ভ্যালু ওরিয়েন্টেশন অ্যাণ্ড
এনভায়রনমেণ্টাল এডুকেশন-এর মাসিক মুখপত্র

সূচীপত্র

বিজ্ঞান ও মূল্যবোধ		৪৯
মূল্যবোধ ও নারী		
	—শ্রীমতী আরতি সেন	৫০
জীবন গড়িয়ে যায় (কবিতা)		
	—শ্রীমতী মানসী মজুমদার	৫২
মূল্যবোধ ও আমরা		৫৪
ঘাস মাটিতে (ছড়া)		
	—শ্রীপ্রীতি ভূষণ চাকী	৫৬
নিধির খবর		৫৭
পরিবেশ প্রসঙ্গে :		
পরিবেশ ও নির্বাচন		৫৮
ছোটদের বিভাগ :		
বিজ্ঞান		৫৯
মহাজীবন		৬০
জানবার কথা		৬১
পুতুলের ইতিকথা		৬২
নোবেল পুরস্কার		৬৪

বিজ্ঞান ও মূল্যবোধ

[৪]

মানুষের প্রকৃতিতে কত বৈচিত্র্য। কেউ গান ভালবাসেন কিন্তু গাইতে পারেন না। যিনি সঙ্গীতে পারদর্শী তিনি হয়ত খেলাধূলায় জগতে অপাঙক্তেয়। বহুজনের মধ্যে হয়ত একজনকে পাওয়া যাবে যিনি অনেক গুণের অধিকারী। কোন মানুষের মধ্যে জন্ম থেকেই হিংসা অনেক বেশী, কেউ বা সময়ে সময়ে এমন হিংস্র হয়ে যান যে তখন আর তাঁকে মানুষ ব'লে মনে হয় না। আবার কারোর কাছে আসলে মন প্রাণ শান্ত হয়, তাকে খুব আপন মনে হয়, তার প্রতি শ্রদ্ধা মনের ভিতর থেকে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে প্রকাশ পায়। একই বাবা-মায়ের দুই সন্তানের প্রকৃতি ভিন্নমুখী—সমাজে এও বিরল নয়। বৈজ্ঞানিকরা দেখেছেন অনাত্মীয় দু'জন মানুষের মধ্যে প্রকৃতিগত তফাৎ অনেক থাকে। আবার কিছু মিল থাকে যার জন্য এদের দু'জনকেই মানুষ বলা হয়।

আমাদের প্রকৃতি, চারিত্রিক, বৈশিষ্ট্য, ব্যক্তিত্ব, কোন বিষয়ে পারদর্শিতা বা আরও অনেক বিশেষত্ব আমরা আমাদের জনক-জননীর কাছ থেকে পাই। বিধাতাপুরুষ কপালে ভাগ্য লিখে দেন কিনা বিজ্ঞান এখনও প্রমাণ করেনি। কিন্তু আমাদের জিন এর মধ্যে যে নির্দেশ দেওয়া থাকে ডি এন এ, আর এন এ সেই মত কাজ করে আর আমাদের চেহারা, ব্যক্তিত্ব সেই মত হয়। শিক্ষা, পারিপার্শ্বিক পরিবেশ আমাদের প্রকৃতিতে কিছু পরিবর্তন আনে। কখনও বাবা-মায়ের প্রকৃতির সঙ্গে সন্তানের প্রকৃতির আমূল পার্থক্য দেখা যায়। তার কারণ হচ্ছে জিনের নির্দেশ সন্তানের মধ্যে ঠিকমত সঞ্চারিত হয় নি। এই কারণে বংশ পরম্পরায় বংশের বৈশিষ্ট্য পরিবর্তিত হয়।

জিনের নির্দেশ কাটিয়ে ওঠা খুব শক্ত। যখন আমরা জিনের প্রভাব কাটিয়ে উঠতে চেষ্টা করি তখন আমাদের নিজ প্রকৃতির সঙ্গে

মূল্যবোধ ও নারী

শ্রীমতী আরতি সেন

স্বামী বিবেকানন্দ ব'লে গেছেন—স্ত্রী পুরুষ উভয়ে একটি পাখীর দুটি ডানার মত। দেশের উন্নতি, অগ্রগতি ও সংহতির জন্য উভয়েরই মিলিত প্রয়াস প্রয়োজন।

আন্তর্জাতিক নারী বর্ষ, দশক, দিবস যথাযথভাবে যথা সময়ে পালন করা হয়ে থাকে পৃথিবীব্যাপী। শিক্ষা, যোগ্যতা, মেধা, কর্মক্ষমতা, কুশলতা ইত্যাদি কোন ক্ষেত্রেই নারী আজ পিছিয়ে নেই। প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে আরম্ভ ক'রে বিচারক, শিক্ষিকা, চিকিৎসক ইত্যাদি নানা পদে নারী মর্যাদার সঙ্গে কাজ ক'রে যাচ্ছেন। তবু দেখি প্রতিদিন সকালে খবরের কাগজে একটি দুটি বধূহত্যা, নারী নির্যাতন, অপহরণ ইত্যাদির খবর থাকে। যেন স্বাভাবিক ব্যাপার এমনি ভঙ্গিতে আমরা কাগজ রেখে দৈনন্দিন কর্মে লিপ্ত হই। মনের ভেতর তীব্র যাতনা বা অপমান অনুভব করি না। কেন? নারীকে তো বৈদিক যুগ থেকে দেবী রূপে স্তুতি করা হয়েছে। এখনও করা হয় তবু তাকে পণ্যের মত ব্যবহার করা হয় কেন?

বিবাহের জন্য পাত্রীর রূপ গুণের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়। পাত্রেরও হয় বিজ্ঞাপন। তবু পাত্র ব'লে কথা! সোনার আংটি বাঁকা হলেও ভাল। অথচ রূপে গুণে বরণীয়া একটি মেয়েকেও অনেক ক্ষেত্রেই পাত্র পক্ষর অবহেলা, অপছন্দের শিকার হতে হয় টাকা বা কন্যার পিতা মাতা, ভ্রাতার আর্থিক পরিস্থিতি পাত্র পক্ষর মনোমত না হলে। ব্যাপারটা গভীর লজ্জা এবং দুঃখের। বিবাহ ছাড়া মেয়েদের অনেক করণীয় আছে। এটা চিন্তা করার দিন এসেছে।

[বিজ্ঞান ও মূল্যবোধের শেষাংশ]

যুদ্ধ করতে হয়। আমাদের ব্যক্তিগত মূল্যবোধ রচনায় জিনের প্রভাব খুবই বেশী। আর যখন আমরা এই প্রভাব কাটিয়ে উঠতে চেষ্টা করি তাও অন্য কোন মূল্যবোধের প্রভাবে।

মধ্যবিত্ত পরিবারের কোন মা যদি কোনদিনও ভেবে থাকেন আমার কন্যা বরের ঘরে যাবে কোন প্রকার দেনা পাওনা বা বিজ্ঞাপন ছাড়া নিজগুণে, নিজগৌরবে, তা'হলে তাঁর স্বপ্ন বা আশা আকাঙ্খা পূরণ হওয়া কঠিন। আজকাল মেয়েরা স্বয়ংবরা হন। প্রেম বিবাহ ক'রে থাকেন তবুও দেখি প্রচুর অলঙ্কার আসবাব বস্ত্রাদির সমারোহ। মেয়েরা নিজেরাই উদ্যোগী হয়ে দামী উপহার পাওয়ার ব্যবস্থা করেন। যৌতুক অন্যরূপে অন্য নামে বধূর সঙ্গে যায়। তাহলে একটি মেয়ের নিজস্ব মূল্য কি? কিছু নেই? একটি গরু, ছাগল ভেড়ার মত নারীকে হাটে বিকোতে হত এক সময়। আজকের দিনে একটি শিক্ষিতা মেয়েকেও বিবাহের জন্য পাত্রপক্ষের কাছে প্রদর্শিত করতে হয়। এটা আমাদের কাছে গৌরবের কি? অথচ সবাই বলবেন এটাই তো সামাজিক নিয়ম। চিরকালের মাসী পিসিরা বলবেন এমনটিই তো চিরকাল হয়ে আসছে নইলে মেয়ের বিয়ে হবে কি ক'রে? তা হ'লে দেখা যাচ্ছে মেয়েরাই মেয়েদের প্রগতির পথে বাধা।

মেয়েদের প্রতি অত্যাচার বধূহত্যা ইত্যাদি জঘন্য অপরাধগুলিতে দেখা যায় পরিবারের অনেক মহিলা সক্রিয়ভাবে যুক্ত থাকেন। শাশুড়ী ননদরা ভুলে যান তাঁরাও মেয়ে। অনেক সময় দেখা যায় রূপসী, বিদুষী বা গুণবতীর অনেক শত্রু এবং তাঁরা তার নিকট জন, বোন কিংবা বান্ধবী।

তা'হলে মেয়েরাই কি মেয়েদের নিজস্ব মূল্য স্থির থাকতে দিচ্ছে না। অনেক পরিবারে ছোট বেলা থেকে বাবা মা আত্মীয় পরিজন নিজেদের অজান্তেই ছেলেমেয়েদের মাঝে একটা অদৃশ্য সীমারেখা টেনে দেন। বলেন মেয়েদের এটা করতে নেই, ওটা করতে নেই। দুটি পিঠো-পিঠি ভাইবোন থাকলে কিছু গৃহকর্মের দায়িত্ব মেয়েটির উপর এসে যায়। কেউ আপত্তি করেন না। ছেলে দেরী করে বাড়ী ফিরলে চিন্তা হ'লেও অশোভন কিছু মনে হয় না। হয়ত পরিস্থিতি মেয়েদের পক্ষে অনুকূল নয় বলেই এমন ঘটে থাকে।

আজকাল যুবসমাজ বা যুবশক্তি এক বিরাট অবক্ষয়ের মুখে

[শেষাংশ ৫৩ পৃষ্ঠায়]

জীবন গড়িয়ে যায়

শ্রীমতী মানসী মজুমদার

জীবন গড়িয়ে যায়——
গৌরবের পাহাড় আর একঘেয়েমির মালভূমি থেকে
শোক দুঃখের খানাখন্দে ভরা নিম্নভূমি দিয়ে—
কিন্তু শেষ হবে কোথায় কিভাবে ?

তোমার কর্মফল প্রতিহত করার শক্তি আছে ?
তাহ'লে তুমি গিয়ে পড়বে চিরন্তন সেই সমুদ্রে।
আর, তোমার চারপাশের বেড়াজাল
ভেদ করার শক্তি না থাকলে
হারিয়ে যাবে হোঁচট খাওয়া জীবনের কালিয়াড়িতে
আবদ্ধ হয়ে থাকবে, অথবা শুকিয়ে যাবে,
সমুদ্রে পৌছানো হবে না।

জীবন গড়িয়ে যায়——
যদি, উৎস শুকিয়ে না যায়
যদি সমুদ্র থাকে শেষে,
তবে, দুর্নিবার স্রোতধারায় তোমার জাগবে চাপল্য
পদে পদে ভেঙে যাবে বাধার প্রাচীর
ঢেউতে ঝিলমিল্ করবে চাঁদ সূর্যের আলো,
তীরে তীরে বনভূমি স্বপ্ন দেখবে পাখীর গানে
মূক পাথরের দেওয়ালে ছবি উঠবে সুন্দর।

তুমি আরও প্রাণরস নিয়ে এসো,
তোমার পরিচয়ের গণ্ডি আরও বড় হোক ;
এনে দাও প্লাবন তোমার ভালোবাসার, শুভবুদ্ধির ;
ব'লে যাও কানে কানে জীবনের সার কথাগুলি

'বেঁচে থাকা শুধু বাঁচা নয়'—
দৈন্য গ্লানি মুছে নিয়ে যাওয়া,
আনন্দের বোধটুকু সবার মর্মে পৌঁছে দেওয়া,
সত্যের বীজ বোনা, মূলে তার বিবেক সিঞ্চন,
সত্যকে মহীরুহ ক'রে দিয়ে যাও বন্ধু
যার ছায়াহীনতায় মানুষের এত ক্লান্তি ক্লেশ,
যার স্নিগ্ধ হাওয়ায় মানুষ অভিন্ন হয় দেবতার সাথে।

['মূল্যবোধ ও নারীর শেষাংশ']

এসে দাঁড়িয়েছে। বিভেদ বা বিদ্বেষকে মুছে ফেলে ভালবাসার দ্বারা জীবনের মূল্যবোধ বাড়াতে হবে। এটির সূচনা শৈশব থেকে মা বাবারা করতে পারেন। প্রবল যুব শক্তি বা জীবনী শক্তির অপচয় বন্ধ ক'রে তাকে গঠনমূলক কাজে লাগানো প্রয়োজন।

মাদক দ্রব্য অথবা কোন কু নেশা যে কোন দেশের পক্ষে ক্ষতিকর। মানুষ অমৃতের সন্তান। আনন্দ উৎসাহ দ্বারা মা সন্তানকে উন্নতির পথে নিয়ে যেতে পারেন। কু নেশা ছাড়াতে পারেন। পড়াশুনার ব্যাপারে চাপসৃষ্টি অনেক ক্ষেত্রে সন্তানকে ভুল পথে নিয়ে যায়। এ ক্ষেত্রেও মা বোন তাকে সঠিক পথ দেখাবেন। একটি জীবনকে মূল্যবান করার জন্য শুধুমাত্র B A পাশ করার প্রয়োজন আছে কি? হাতের কাজ, শিল্পচর্চা খেলাধূলার, মাধ্যমেও জীবন সুন্দর করা যায়। জীবনের মূল্যবোধ বাড়ানো যায়। প্রয়োজন শৃঙ্খলা, সদাচার, সৎশিক্ষা।

মূল্যবোধ কি? মূল্যবোধ একটি শক্তি যা মানুষকে মনুষ্যত্ব অর্জনে সাহায্য করে। মূল্যবোধ যুগে যুগে রাজনৈতিক, প্রাকৃতিক সামাজিক ও ব্যক্তিগত কারণে পরিবর্তিত হয়ে থাকে।

একটি সুস্থ সুন্দর সংহতিপূর্ণ বলিষ্ঠ উন্নতিশীল জাতি গঠনের জন্য প্রতিটি মা বোনের সহযোগিতা প্রয়োজন। জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে মূল্যবোধ বৃদ্ধি দ্বারা সে কাজ সুসম্পন্ন হতে পারে।

মূল্যবোধ ও আমরা

[Value Orientation এ প্রকাশিত 'Values & Ourselves' অনুসরণে]

—পূর্বপ্রকাশিতের পর—

মূল্যবোধ এবং সমাজতন্ত্রবাদ :

মূল্যবোধ হিসাবে সমাজতন্ত্র কেবলমাত্র একাধিক ব্যাখ্যাই দেয় না উপরন্তু কতকগুলি পরস্পর বিরোধী ব্যাখ্যা দেয়। মূল্যবোধের তাড়নাই কাজ নির্ধারণ করায়।

সমাজতান্ত্রিক ধারায় কোন একটি গোষ্ঠী সামগ্রিক ভাবে নিজের উৎপাদন পদ্ধতি, মূলধন, ভূমি, সম্পত্তি ইত্যাদি সব কিছুই নিয়ন্ত্রণ করে। গোষ্ঠীই আবার সকলের স্বার্থে শাসন, পরিচালনা এবং বণ্টন ব্যবস্থার ওপরও নজর রাখে, এই সংজ্ঞা অনুযায়ী মূল্যবোধ হিসাবে সমাজতন্ত্রবাদ একটি রাজনৈতিক দলের মূল্যবোধ হতে পারে যা দলকে সরকার গঠন করতে, দেশের শাসন পরিচালনা করতে এবং অধিবাসীদের নিয়মানুযায়ী কাজ করানোর জন্য আইন বিধিবদ্ধ করতে প্রণোদিত করে যা ঐ দলের রাজনৈতিক মূল্যবোধেরই প্রকাশ। এটা চিন্তা করা প্রায় অসম্ভব যে সমাজতন্ত্রবাদ সার্বিকভাবে ব্যক্তিগত মূল্যবোধে পর্যবসিত হবে। উৎপাদন পদ্ধতি, মূলধন বা ভূমির উপর কর্তৃত্বেরও একটি মূল্যবোধ আছে যা ব্যক্তিগত মালিকানা উচ্ছেদ করার প্রচেষ্টার সময়ও প্রতিফলিত হয়। কোন বস্তুকে পাবার এবং তার মালিক হবার জন্য কোন মানুষের একান্ত আগ্রহেই নিজস্ব মালিকানা সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গী বেড়ে ওঠে।

সমাজের একটি অবস্থা হিসেবে সমাজতন্ত্র মানুষের মধ্যে মূল্যবোধ সঞ্চারিত করে। এই রকম সামাজিক গঠনে বস্তু, সম্পত্তি ইত্যাদি জনসাধারণের দ্বারা সার্বিক ভাবে ব্যবহৃত হয়। কিছু কিছু উৎপাদন পদ্ধতি, মূলধন, ভূমি, সম্পত্তি সার্বজনীন ভাবে ব্যবহার করার দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে সব মানুষই পরিচিত। যেমন নদী, বড় হ্রদ, পর্বত, অরণ্য, সোনার খনি ইত্যাদির মালিক রাষ্ট্র, পার্ক বা রাস্তা সর্বসাধারণের জন্য।

যে অন্তর্নিহিত অর্থ সামনে তুলে ধরে তা হচ্ছে সমাজতন্ত্রবাদ একজন ব্যক্তি জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই বাতাস, জল, সূর্যালোক, আশ্রয় এবং খাদ্য পাবার অধিকারী। কাজেই মূল্যবোধ হিসেবে সমাজতন্ত্রবাদকে অস্বীকার করা যায় না। গোষ্ঠীর নিয়ম হিসেবে সমাজতন্ত্রবাদ মানুষকে এই বিষয়ে সচেতন ক'রে তোলে, যে কোন মানুষকেই তার বিকাশের বা অগ্রগতির ক্ষেত্র থেকে বঞ্চিত করা যায় না। অপরকে বঞ্চিত ক'রে বিশেষ সুবিধা পাওয়াকে সমাজতন্ত্রবাদ বাধা দেয়।

মুষ্টিমেয় মানুষের অতিরিক্ত সম্পত্তির অধিকারও সমাজতন্ত্রে সম্ভব নয়। এই ধারাবাহিক প্রচেষ্টায় শুধুই যে জীবন ধারণ এবং বিকাশকেই সমাজতান্ত্রিক ধারায় নিয়ন্ত্রিত করার চেষ্টা হয় তা নয় এছাড়াও মজুত করা এবং অত্যধিক ব্যয় করাকেও নিয়মাধীন করার চেষ্টা করা হয়।

মানুষ সামাজিক জীব। একক ভাবে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে থাকা তার পক্ষে সম্ভব নয়। মানুষ যে সঙ্গলিপ্সু তা কোন দুর্ঘটনা নয়। মানুষ সমাজবদ্ধ ব'লেই সে অপরের সঙ্গ চায়। সুতরাং সমাজবদ্ধভাবে জীবন ধারণ করা, বিকাশের সুযোগ, বিশেষ ব্যক্তির কলা, বিজ্ঞান প্রযুক্তি, আধ্যাত্মিকতা বা সাহিত্য ক্ষেত্রে কৃতিত্ব অর্জন ইত্যাদি সমাজের স্বতঃস্ফূর্ত চাহিদা। যেখানে যখনই এই সব ক্ষেত্র কেন্দ্রীভূত হয়ে বিশেষ গোষ্ঠীর হাতে গেছে তখনই দেখা গেছে সামাজিক বিপ্লব। এমন কি বিভিন্ন মূল্যবোধের ক্ষেত্রেও সমাজবদ্ধকরণের প্রয়োজনীয়তা দেখা গেছে যখনই সেই মূল্যবোধের সম্বন্ধে সচেতনতা বেড়েছে যদিও মূলতঃ মূল্যবোধ ব্যক্তিগত ধারণা। এই ভাবে দেখলে সমাজতন্ত্রবাদকে বলা যেতে পারে মানবিক গুণাবলীর উন্নয়ন এবং জীবনের উন্নয়নকে সমাজবদ্ধ করা।

ভারতীয় সংবিধানে গণতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্রবাদের মূল্যবোধকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে এবং নীতি হিসেবে এই সব মূল্যবোধকে শিক্ষা ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। গণতন্ত্রের মূল্যবোধ যখন আলোচিত হয়েছিল, তখন আমরা দেখেছি গণতন্ত্রে ব্যক্তিকে সর্বাধিক মর্যাদা দেওয়া হয়। কিন্তু সমাজতন্ত্রে যখনই কোন ব্যক্তি তার নিজস্ব গণ্ডীর বাইরে অপরের অধিকারে হস্তক্ষেপ করতে যায় তখনই তাকে

বাধা দেওয়া হয়। ব্যক্তিগত স্বাধীনতাকে ততক্ষণ পর্যন্ত স্বীকার করা হয় যতক্ষন পর্যন্ত তা অপরের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করছে না। যেমন ভারতীয় সমাজের ধারায় দুজন মানুষের বিয়ে যদিও তা ব্যক্তিগত তবুও যদি কোনভাবে সামাজিক নিয়মকে ভঙ্গ করে বা খারাপ দৃষ্টান্ত স্থাপন করে তবে তা সমাজে গৃহীত হয় না। সুতরাং মূল্যবোধ হিসেবে গণতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্র একে অপরের পরিপূরক।

[ক্রমশঃ]

ঘাস মাটিতে

শ্রীপ্রীতি ভূষণ চাকী

'দেশটা গেল' সবাই বলে,
উল্‌টা চালে নিজেই চলে।
এ কথাতে লাভ কী বলো ?
ধান্দা ছেড়ে সিধে চলো।
সবার কথা একটু ভাবো
ঘাস মাটিতে এবার নাবো
শিশুদে'কে জড়িয়ে ধরো
বিভেদ ভুলে দেশকে গড়ো।

নিধির খবর

শ্রীমতী পূর্ণিমা সেন এবং স্বামী যুক্তানন্দ ঝাড়গ্রামের শ্রীরামকৃষ্ণ সারদাপীঠ (কন্যাগুরুকুল) এর তৃতীয় থেকে দশম শ্রেণীর ছাত্রীদের জন্য শ্রেণীকক্ষে মূল্যবোধ প্রতিবিন্যাসের অভ্যাস সম্পর্কিত পাঠ প্রবর্তন করেন। এই ক্লাস অনুষ্ঠিত হয় ২৩—২৫শে মার্চ। এর আগে ঐ বিদ্যালয়ের কয়েকজন শিক্ষিকা এই বিষয়ে বিবেকানন্দ নিধিতে প্রশিক্ষণ নেন। গত বছরে ঝাড়গ্রামে মূল্যবোধ প্রতিবিন্যাস বিষয়ক বেশ কয়েকটি আলোচনা সভা ও শিক্ষাক্রম অনুষ্ঠিত হয়।

*

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজের জন্ম শতবার্ষিকী পালন করেন ২১ এবং ২২শে মার্চ কলকাতার শিশির মঞ্চে। উপাচার্য অধ্যাপক রমারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, স্বামী যুক্তানন্দ প্রমুখ ঐ অনুষ্ঠানে যোগ দেন।

*

এপ্রিল এবং মে মাসে বিবেকানন্দ নিধির কার্যসূচী :

(i) শান্তিনিকেতনের পাঠভবনে তিনদিনব্যাপী শিক্ষাক্রম ৩—৫ এপ্রিল।

(ii) বিবেকানন্দ নিধির গবেষণা ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ১৭—১৯ এপ্রিল আয়োজিত হবে একটি শিক্ষাক্রম।

(iii) বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে মূল্যবোধ প্রতিবিন্যাস বিষয়ক ভাষণ (তারিখ পরে জানানো হবে)।

(iv) বিবেকানন্দ কেন্দ্র শিক্ষক শিক্ষিকাদের জন্য দশদিনব্যাপী একটি ক্যাম্প আয়োজন করবেন। অরুণাচল প্রদেশের শের এ অবস্থিত বিবেকানন্দ কেন্দ্র বিদ্যালয়ে আয়োজিত এই ক্যাম্পে অংশ-গ্রহণ করবেন আসাম এবং অরুণাচল প্রদেশের প্রায় ১০০ জন শিক্ষক শিক্ষিকা। স্বামী যুক্তানন্দ এই ক্যাম্পে কিছুদিনের জন্য অতিথি হিসাবে যোগ দেবেন এবং যোগদানকারী শিক্ষক-শিক্ষিকা ও কর্মীদের সঙ্গে আলোচনা করবেন।

পরিবেশ ও নির্বাচন

পরিবেশ সংক্রান্ত ভাবনা চিন্তার দুটি দিক। একদিকে পরিবেশের পক্ষে মঙ্গলজনক সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়া, অন্যদিকে সেই সিদ্ধান্তকে কাজে লাগিয়ে পরিবেশের উন্নতি সাধন করা। এই সঠিক সিদ্ধান্ত নেবার জন্য চাই গভীর অন্তর্দৃষ্টি।

একটি বিষয় আজকাল সারা পৃথিবীতেই দেখা যাচ্ছে যে প্রধান পরিবেশ বিষয়ক সিদ্ধান্তগুলি যা আমাদের জীবনকে প্রভাবিত করে সেগুলি নিচ্ছেন রাজনীতিবিদরা। কাজেই পরিবেশের উন্নতিসাধনের গুরুদায়িত্বের একটা বিরাট অংশই পড়ছে তাঁদের এবং তাঁদের নিয়োগ করা কর্মচারীদের ওপর। কেননা তাঁরাই সিদ্ধান্ত নেবেন কিভাবে পরিবেশকে দূষণমুক্ত করা যায় যাতে মানুষ বিশুদ্ধ বাতাসে নিঃশ্বাস নিতে পারে, পানের জন্য বিশুদ্ধ জল পেতে পারে ইত্যাদি। অর্থাৎ দূষণমুক্ত সুস্থ পরিবেশ গ'ড়ে তোলার দায়িত্ব অনেকটাই রাজনীতি-বিদদের।

তবে এক্ষেত্রে জনগণও তাঁদের দায়িত্ব এড়িয়ে চলতে পারে না। প্রথমতঃ তাঁরাই নেতা নির্বাচন করেন। সুতরাং তাঁদের দায়িত্ব নিয়ে এমন নেতা নির্বাচন করতে হবে যিনি হবেন চিন্তাশীল এবং আগ্রহী। দ্বিতীয়তঃ শুধুমাত্র ভালো সিদ্ধান্তই কোন কিছুকে উন্নত করতে পারে না। সিদ্ধান্তকে কাজে প্রয়োগও সুষ্ঠুভাবে করা দরকার। এ বিষয়ে জনগণের দায়িত্ব অপরিসীম। তাঁদের সবসময়ই নির্বাচিত নেতার সঙ্গে সহযোগিতা করতে প্রস্তুত থাকতে হবে যাতে তাঁদের বাধা বা অনাগ্রহের ফলে কোন কাজ ব্যাহত না হয়। যদি আমরা প্রয়োজনে নেতাদের সাহায্য করতে প্রস্তুত থাকি, তবেই তো নিজেদের প্রয়োজনে আমরা তাঁদের সহায়তা পাব।

বিজ্ঞান

ধুলোর মূল্য

ধূলোকে আমরা নোংরা হিসেবেই মনে করি এবং ধূলো পরিষ্কার করা আমাদের নিত্য-নৈমিত্তিক কাজ। আমরা ভেবে থাকি যে জায়গায় ধূলো কম সে জায়গাটি কি সুন্দর। কিন্তু আমরা অনেকেই হয়তো জানিনা এই সুন্দর জায়গার সুন্দর আবহাওয়া তৈরীর পেছনে ধূলোর অবদান যথেষ্ট বেশী।

মেঘ তৈরী হয় বাতাসের ধূলোকণার উপরে। একটা ছোট্ট ধূলোকণার উপরে জলীয় বাষ্প জল কণা হয়ে জমে খুব ছোট্ট এক বিন্দু জল তৈরী করে আর এই রকম ১০০০ লক্ষ বিন্দু জল দিয়ে এক ফোঁটা বৃষ্টি তৈরী হয়। এক খণ্ড মেঘের মধ্যে কোটি-কোটি জলবিন্দু থাকে। তার মানে যে কয় ফোঁটা জলবিন্দু এক খণ্ড মেঘের মধ্যে আছে সে কয়টি ধূলোকণা ঐ মেঘ তৈরীর মূল উপাদান।

আকাশে যখন ধূলোর ঝড় হয় তখন আমাদের মনে হয় না আকাশটা খুব সুন্দর। কিন্তু আবহাওয়ার মধ্যে যদি ধূলো না থাকত তাহ'লে আকাশের রঙ সুন্দর নীল হ'ত না। আর গোধূলিতে সূর্য ডোবার সময় আকাশ ঐ রকম সিঁদুর রাঙা হ'ত না। সূর্যের আলো পৃথিবীর বায়ু মণ্ডলের ধূলো কণাতে ধাক্কা খায়। সূর্যের আলোর নানান তরঙ্গ এই ধাক্কাতে বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে যায়। এরই ফলে আকাশের রঙ নীল দেখি আর গোধূলিতে দিগন্ত লাল হয়ে যায়।

মহাশূন্যে ধূলোর এবং গ্যাস এর মেঘ দেখা যায়। বৈজ্ঞানিকরা মনে করেন এই ধূলোর মেঘ থেকেই বিভিন্ন নক্ষত্র তৈরী হয়েছে। ধূলোর মেঘ ও গ্যাস মহাশূন্যে চলতে থাকে এবং প্রচণ্ড চাপে যখন এই গ্যাস জ্বলে ওঠে তখনই তারকার সৃষ্টি হয়। হয়ত এই ভাবেই সূর্য তৈরী হয়েছে। সূর্য তৈরীর পরে ধূলো এবং অন্য যা কিছু বেঁচে গিয়েছিল তাই দিয়ে অনেক গ্রহ তৈরী হয়েছে। তার মধ্যে পৃথিবীও একটি।

মহাজীবন

দাউ মিয়ের

আমরা আজকাল নানান ছবির প্রদর্শনীতে যাই। ছবির প্রদর্শনীতে শিল্পীর নানান ছবি থাকে, পছন্দ হলে কেউ তা কিনে নেন। কমার্শিয়াল আর্টিষ্ট যাঁরা তাঁদের হাতে অনেক কাজ। কেউ বিভিন্ন প্রদর্শনীর নকশা তৈরী ক'রে মোটা রোজগার করেন। কেউ বা বইয়ের প্রচ্ছদ আঁকেন। অন্যেরা আরও কোন কিছু নকশার কাজ করেন। খুব বড় শিল্পী না হলেও আজকের কোন শিল্পীর আধপেট খেয়ে থাকতে হয় না।

কিন্তু আগের দিনে শিল্পে যাঁরা নতুন দিক খুলে দিয়েছিলেন তাঁদের দুরবস্থার শেষ ছিলনা। দাউমিয়ের একজন এইরকম শিল্পী ছিলেন। তিনি হাস্যরসাত্মক, ব্যঙ্গচিত্র আঁকতে শুরু করেন। খুব গরীব ঘরে জন্মে ছিলেন ব'লে তাঁর পড়াশুনো একেবারেই হয়নি। তিনি ছোটবেলায় কোর্টে ফাইফরমাস খাটতেন পরে বই বিক্রি করতেন। ছবি আঁকার প্রতি তাঁর ভীষণ ঝোঁক ছিল। তাই যখনই তিনি সময় পেতেন ছবি আঁকতেন, যেটুকু রোজগার করতেন তাই দিয়ে ছবি আঁকার সরঞ্জাম কিনতেন। এইভাবে দাউমিয়ের খুব ভাল লিথোগ্রাফী শিখলেন।

দাউমিয়ের হঠাৎ ব্যঙ্গচিত্র আঁকতে শুরু করলেন। এই ব্যঙ্গচিত্র আঁকার একট উদ্দেশ্য ছিল। তিনি সত্যপ্রকাশ করতে চাইতেন। সরকারের উচ্চপদস্থ অফিসারদের অসততা ও অন্যান্য দুর্বলতা তাঁর ছবিতে প্রকট হত। তিনি এত সাহসী ছিলেন যে, সমাজের সর্বোচ্চ পদের লোকের মিথ্যা মুখোশ ব্যঙ্গচিত্রের মাধ্যমে খুলে দিতে পিছিয়ে যেতেন না। একবার রাজা লুই ফিলিপ-এর ছবি আঁকার জন্য দাউমিয়েরকে জেলে যেতে হয়েছিল, কিছু পয়সাও দণ্ড দিতে হয়েছিল।

ফরাসী সরকার আইন ক'রে দাউমিয়ের এর রাজনৈতিক ব্যঙ্গচিত্র আঁকা বন্ধ ক'রে দেন। কিন্তু দাউমিয়ের-এর কাজ তাতে বন্ধ হলনা।

জানবার কথা

২য় বিশ্বযুদ্ধ

(১৯৩৯-'৪৫)

১৯৩৯ সালের ১লা সেপ্টেম্বর জার্মান সৈন্যবাহিনী হঠাৎ পোল্যাণ্ড আক্রমণ করে। ২ দিন পরেই ফ্রান্স এবং গ্রেট্ ব্রিটেন জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। এই ভাবেই ইউরোপে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা হয়।

২য় বিশ্বযুদ্ধই ছিল ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা বিধ্বংসী যুদ্ধ এবং সবচেয়ে বেশী এলাকা জুড়ে চলেছিল এই যুদ্ধ। ১৯৩৯ থেকে ১৯৪৫ সাল ব্যাপী এই বিশ্বযুদ্ধের সঙ্গে স্বভাবতই যুক্ত হয়ে পড়েছিল সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী দেশগুলি এবং প্রায় সব ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলি। এমনকি, যে সব দেশগুলি নিরপেক্ষ ছিল, তারাও যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতির অংশীদার হয়েছিল। ২য় বিশ্বযুদ্ধের মুখ্য প্রতিদ্বন্দ্বী দেশগুলি হ'ল—জার্মানী, ইটালী এবং জাপান, যারা 'Axis Powers' নামে পরিচিত ছিল—এছাড়া অন্যদিকে ছিল যুক্তরাষ্ট্র, গ্রেট্ ব্রিটেন্, সোভিয়েত ইউনিয়ন, ফ্রান্স এবং চীন, যারা 'Allies Powers' নামে পরিচিত ছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সর্বাপেক্ষা ত্রাস সৃষ্টি করেছিলেন জার্মানীর নাৎসিবাদী নেতা অ্যাডল্ফ্ হিট্লার এবং ইটালীর ফ্যাসীবাদী নেতা মুসোলিনী। যুদ্ধক্ষেত্রের বিস্তার ঘটেছিল ইউরোপ থেকে উত্তর আফ্রিকা এবং প্রশান্ত মহা-সাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ থেকে পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া পর্যন্ত।

এই বিশ্বযুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ যে কি সাংঘাতিক আকার ধারণ ক'রেছিল, তা অকল্পনীয়। প্রচুর সম্পদ বিনষ্ট হয়েছিল এবং মৃতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল ১৬,০০০,০০০ এরও বেশী, যার মধ্যে অসামরিক জীবনও ছিল অগুনতি। লক্ষ লক্ষ মানুষ গৃহহারা হয়েছিল।

[মহাজীবনের শেষাংশ]

তিনি কৌতুক নক্সা আঁকতে শুরু করলেন। এই কৌতুক নক্সা খুব প্রশংসা পেল। কিন্তু তাঁর দুবেলা পেটভরার জন্য রোজগার হলনা। জীবনের শেষ বয়সে তাঁকে খুব কষ্টের মধ্যে চলতে হল। ক্রমে তিনি একেবারে অন্ধ হয়ে গেলেন আর ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে পৃথিবী ছেড়ে চলে গেলেন।

পুতুলের ইতিকথা

তোমাদের বসবার ঘরের আলমারীতে কতরকমের সৌখিন পুতুল। কোনটা তোমদের মা কৃষ্ণনগরের কোন মেলা থেকে কিনে এনেছেন মাটির পুতুল। কোনোটা বা তোমাদের বন্ধুরা জন্মদিনে উপহার দিয়েছে প্লাস্টিকের খুব সুন্দর ফ্রক পরা একটা বাচ্চা মেয়ের··· একটু নাড়লেই ওর চোখ পিটপিট করে আর একটা মজার আওয়াজ হয়। আর বাবা বিদেশ থেকে যে পুতুলটা এনে দিয়েছিলেন সেটা তো অনেক কিছু করে। ওকে চাবি দিয়ে দিলে ও মেঝের ওপরে বাচ্চা ছেলের মতো হাঁটতে শুরু করে আর মুখে পা-পা, মা-মা বলতে থাকে। তোমরা বিলেতের ম্যাডাম টুসোর বিরাট বিরাট পুতুলগুলোর ছবি দেখে অনেকেই ভেবেছো ওগুলো পুতুল নয়, সত্যিকারের মানুষের ছবি। তোমরা কি জানো এই পুতুল তৈরী কতদিন আগে শুরু হয়েছে ?

কেউ জানেনা। তবে মিশরের বড় বড় পিরামিডগুলোর মধ্যে হাজার হাজার বছর আগের তৈরী পুতুল পাওয়া গেছে। কোনটা পোড়ামাটির, কোনটা বা কাঠের। খুব প্রাচীন গ্রীস বা রোমের বইতে মোমের পুতুলের কথা পাওয়া গেছে কিন্তু সেগুলো কেউ চাক্ষুষ দেখার আগেই হয় গলে গেছে অথবা ধ্বংস হয়ে গেছে।

একইরকম দেখতে হাজার হাজার পুতুল তৈরী করবার কৌশল প্রথমে জার্মানীতে আবিষ্কার হয়। বইয়ে দেখা গেছে যে ১৪১৩ সালে নুরেন বার্গে 'অট' নামে একজন পুতুল তৈরী করত। তার পরে শীত-কালে যখন চাষ করা যেত না তখন চাষীরা বনের গাছ কেটে কাঠের

[জানবার কথার শেষাংশ]

ইউরোপের বহু শহর এবং এশিয়ার কোন অঞ্চল আংশিকভাবে ও কোন অঞ্চল সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল তেজস্ক্রিয় বোমা বিস্ফোরণের ফলে। এ ছাড়াও বিস্তীর্ণ অঞ্চল সমূহ বিধ্বস্ত হয়ে গিয়েছিল।

অবশেষে ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে এই বীভৎস ধ্বংসলীলার অবসান ঘটলেও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সুদূর প্রসারী কুফলের শিকার এখনও স্তব্ধ হয়ে যায় নি।

পুতুল তৈরী করতে শুরু করতো। ব্যবসায়ীরা জার্মানীর জঙ্গলে এই সব পুতুল দেখে তা ইউরোপ ও আমেরিকায় বিক্রি করতে শুরু করল। এই জার্মানীর লোকেরা ১৭শতকে মোমের পুতুল তৈরী করা শুরু করেন। তারপরে আরও সুন্দর ক'রে মোমের পুতুল তৈরী করার নানান পদ্ধতি উদ্‌ভাবিত হয়।

চীন দেশে বহুদিন আগে থেকে কাগজের মণ্ড দিয়ে পুতুল তৈরী করা শুরু হয়। ১৮৫০ সাল থেকে ড্রেসডেন, জার্মানীতে যেসব পুতুল তৈরী শুরু হল সেগুলো খুব সৌখিন। এগুলোর মাথায় ফুল থাকত, রিবন থাকত, আরও কতকি থাকত।

ইউরোপে ১৮ ও ১৯ দশকে যান্ত্রিক পুতুল তৈরী করা শুরু হয়। এইসব পুতুল মানুষের মতো ভঙ্গী করে। এমনকি ফিক ক'রে একটু হেসেও দেয়। ফরাসী দেশে প্রায় ২০০ বছর আগে তিনটে খুব উচু দরের যান্ত্রিক পুতুল তৈরী হয়। এর মধ্যে একটা ছবি আঁকতে পারত আর একটা লিখতে পারত। আর তৃতীয় পুতুলটা হারমোনিয়াম বাজাতে পারত।

পুতুল বিক্রি ক'রে মানুষ যে শুধু রোজগারই করে তা নয়। পুতুল বিনিময় ক'রে দুই দেশের মধ্যে বন্ধুত্বের নিদর্শনও রাখা হয়। ১৯২৭ সালে আমেরিকার বাচ্চারা জাপানের বাচ্চাদেরকে অনেক পুতুল উপহার দিয়েছিল। আর জাপান থেকেও তাদের জন্য ৫৮টা চমৎকার পুতুল উপহার পাঠনো হয়েছিল।

নোবেল পুরস্কার

প্রতি বছরই শোনা যায় কেউ না কেউ বিজ্ঞানে, সাহিত্য ক্ষেত্রে বা শান্তির প্রয়াসের জন্য নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। এই নোবেল পুরস্কার যাঁর নামে তিনি হলেন সুইডেনের বিখ্যাত রসায়নবিদ্ ও যন্ত্রশিল্পী স্যার আলফ্রেড বার্নার্ড নোবেল। বিজ্ঞানের জগতে তাঁর সেরা দান নাইট্রোগ্লিসারিন বিস্ফোরিত করার পদ্ধতি এবং ডিনামাইট। এই আবিষ্কার তাঁকে প্রচুর যশ ও অর্থ এনে দিয়েছিল। কিন্তু তাঁর আবিষ্কার ভুল পথে কাজে লাগিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে বহু মানুষের প্রাণহানির জন্য ব্যবহার করতে দেখে স্যার নোবেল প্রচণ্ড আত্মগ্লানি ও কষ্টে ভুগতে থাকেন।

তাঁর এই আত্মগ্লানিই তাঁকে মৃত্যুর পূর্বে একটি উইল করতে প্রণোদিত করে যাতে তিনি নিজে লিখে তাঁর বিপুল সম্পত্তির অধিকাংশই দিয়ে যান বিশ্ববাসীকে। এই সম্পত্তির পরিমাণ ছিল ৯২ লক্ষ ডলার।

এই উইলের মূল কথা ছিল তাঁর সম্পত্তির আয় থেকে যেন বছরে পাঁচটি পুরস্কার দেওয়া হয়। শান্তি, সাহিত্য, রসায়ন, শারীর বিদ্যা বা চিকিৎসা বিদ্যা ও পদার্থ-বিজ্ঞানে বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শনকারীর জন্য নির্দিষ্ট হবে এই পুরস্কার। তাঁর নির্দিষ্ট পাঁচটি বিষয় ছাড়াও ১৯৬৯ সাল থেকে অর্থনীতির জন্যও দেওয়া শুরু হয়েছে এই পুরস্কার। বর্তমানে ভারতীয় মুদ্রায় এই পুরস্কারের টাকার অঙ্ক হচ্ছে ১৮ লক্ষ টাকা। স্যার আলফ্রেড নোবেল মারা যান ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে। মৃত্যুর পরে তাঁর সম্পত্তি নিয়ে কিছু মতবিরোধ দেখা দেওয়ায় সঙ্গে সঙ্গে পুরস্কার দেওয়া শুরু করা যায় নি। প্রথম এই পুরস্কার দেওয়া হয় ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে।

প্রতি বছর কে কে নোবেল পুরস্কার পাবেন তা নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় ৩১শে জানুয়ারী। এর জন্য বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হয় প্রায় ৬০০ থেকে ৭০০ জন বিশিষ্ট ব্যক্তির মধ্যে যাঁরা নোবেল কমিটীর সদস্য। নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয় প্রতি বছর নোবেলের মৃত্যুদিন ১০ই ডিসেম্বর সুইডেনের রাজধানী স্টকহোমে।

নিয়মাবলী

লেখক–লেখিকাদের জন্য ঃ মূল্যবোধ ও পরিবেশ বা আজকের দিনের কোন সমস্যা নিয়ে আপনার গল্প বা প্রবন্ধ ছাপতে আমরা আগ্রহী।

লেখা কাগজের একদিকে বাঁদিকে অন্ততঃ এক ইঞ্চি ছেড়ে স্পষ্ট-ভাবে লিখবেন। লেখার নকল রেখে পাঠাবেন।

উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে যথাযথভাবে উদ্ধৃতি চিহ্ন থাকা প্রয়োজন। যে বই থেকে নেওয়া হয়েছে তার নাম, গ্রন্থকারের নাম, প্রকা-শকের নাম ঠিকানা, প্রকাশন বর্ষ, সংস্করণ সংখ্যা ইত্যাদির নির্ভুল উল্লেখ আবশ্যক।

অমনোনীত লেখা ফেরত পেতে হ'লে রেজিষ্ট্রী ডাকের উপযুক্ত ডাকটিকিট পাঠাতে হবে।

চিঠির উত্তরের জন্য পঞ্চাশ পয়সার স্ট্যাম্প বা ঠিকানা সম্বলিত খাম / ইনল্যাণ্ড / পোষ্টকার্ড পাঠাতে হবে। লেখা বা চিঠি সংযুক্ত সম্পাদক বা সম্পাদকের নামে পাঠাবেন।

গ্রাহকদের জন্য ঃ জানুয়ারী মাস থেকে বছর আরম্ভ। বছরের প্রথম সংখ্যা থেকে এক বছরের জন্য গ্রাহক হওয়া যায়। বছরের যে কোন সময় বার্ষিক চাঁদা গৃহীত হলেও গ্রাহক করা হবে জানুয়ারী মাস থেকে। বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা সডাক ১৫·০০ টাকা। ভারতের বাইরে $ ১০।

পরের মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে পত্রিকা না পেলে, অবিলম্বে কার্যালয়ে জানালে পুনরায় ঐ সংখ্যা দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু পরবর্তী মাসের মধ্যে না জানালে পত্রিকা প্রাপ্তির নিশ্চয়তা থাকবে না।

রোদসীর চাঁদা মণিঅর্ডারে পাঠালে কুপনে পুরো নাম, ঠিকানা পরিষ্কার ক'রে লেখা প্রয়োজন। মণিঅর্ডার বা পোস্টাল অর্ডারে টাকা পাঠানো যাবে। পোস্টাল অর্ডার বিবেকানন্দ নিধিকে দেয়। **মণিঅর্ডার পাঠানোর ঠিকানা ঃ** ১৪৯/১ই রাসবিহারী অ্যাভিনিউ, কলকাতা-৭০০০২৯। সরাসরি টাকা দিতে গেলে এই ঠিকানা ছাড়াও বিবেকানন্দ নিধি, ৯৯, কড়েয়া রোড, কলকাতা-১৯ ঠিকানায় যে কোন কাজের দিন বিকেল পাঁচটা থেকে সাড়ে সাতটার মধ্যে দেওয়া যাবে।

ঠিকানার পরিবর্তন হলে অন্ততঃ একমাস আগে জানাতে হবে।

Postal Regn No. WB/SC223
৫ম বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা, এপ্রিল ১৯৮৭ Regn No. RN-41095/83

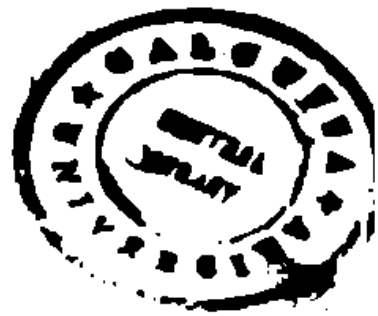

আমি বিশ্বাস করি ভারতবর্ষ এক, অবিভাজ্য। এক আবাস, এক স্বার্থ ও এক সম্প্রীতির উপরই জাতীয় ঐক্য বর্তিত।

—ভগিনী নিবেদিতা

সম্পাদনা, প্রকাশনা ও মুদ্রণ : স্বামী মুক্তানন্দ। সংযুক্ত সম্পাদক—লিপিকা গাঙ্গুলী। সহকারী—ছন্দা বাগচী।
বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা ১৫ টাকা। প্রতি কপি ১ টাকা ৫০ পয়সা।
বিবেকানন্দ নিধি, ৮৬এফ, মনোহরপুকুর রোড, কলিকাতা-২৯,
পাপাই প্রিন্টার্স ২৩৭, এন এস সি বোস রোড, কলিকাতা-৪৭ হইতে মুদ্রিত।

বোধসী

৫ম বর্ষ ।। ৫ম সংখ্যা ।। মে ১৯৮৭

জগতে সমুদয় ধনরাশির চেয়ে 'মানুষ' হচ্ছে বেশী মূল্যবান

— স্বামী বিবেকানন্দ

বিবেকানন্দ নিধি ও ইনষ্টিট্যুট অফ ভ্যালু ওরিয়েন্টেশন অ্যাণ্ড
এনভায়রনমেন্টাল এডুকেশন-এর মাসিক মুখপত্র

সূচীপত্র

শান্তিনিকেতনের শিক্ষা	৬৫
শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্যাশ্রম প্রতিষ্ঠাদিবসের উপদেশ	৬৭
পাঠভবনে মূলাবোধ সচেতনতার শিক্ষাক্রম	৬৮
মূলাবোধ সচেতনতার শিক্ষাক্রম কাদের জন্য ?	৭২
মনস্থিতি অভ্যাসের অভিজ্ঞতা	৭৪
শিক্ষাক্রমে অংশগ্রহণকারী ছাত্রছাত্রীবৃন্দের নাম	৭৮
নিধির খবর	৮০

রোদসী
৫ম বর্ষ ।। ৫ম সংখ্যা ।। মে ১৯৮৭

শান্তিনিকেতনের শিক্ষা

জীবনের কোন লক্ষ্য নাই অথচ শিক্ষা আছে—ইহার কোন অর্থই নাই—এই হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা সম্বন্ধে দৃষ্টিভঙ্গী। রবীন্দ্রনাথের কাছে জীবনের লক্ষ্যই মূল এবং 'জীবনধারণ ও সমাজ রক্ষার সমস্ত লক্ষ্যই ইহার অনুবর্তী' আর শিক্ষার অর্থ ডিগ্রী নেওয়া নয়, শিক্ষার অর্থ 'চরিত্রকে বলিষ্ঠ, কর্মিষ্ঠ করা, সকল অবস্থার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করা।'

শিক্ষা রবীন্দ্রনাথের কাছে সহায়ক মূল্যবোধ। জীবধর্ম ও সমাজধর্মকে রবীন্দ্রনাথ ত্যাগ করতে বলেননি। বলেছেন শিক্ষা হচ্ছে জীবধর্ম ও সমাজধর্মকে আত্ম উপলব্ধির অনুগত করার সাধনা—অর্থাৎ শিক্ষা বড় কিছু লাভের জন্য সাহায্য করবে। এই বড় কিছু হচ্ছে জীবনের লক্ষ্য অর্থাৎ চূড়ান্ত মূল্যবোধ। 'মানবাত্মার মুক্তিই মানব-জীবনের চরম লক্ষ্য'—জীবনের চূড়ান্ত মূল্যবোধ।

শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয়ের মুখ্য উদ্দেশ্য মনুষ্যত্ব লাভের ভিত্তি যে শিক্ষা—সেই শিক্ষা দেওয়া। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন 'মনুষ্যত্ব লাভ স্বার্থ নহে পরমার্থ"। মনুষ্যত্ব লাভের ভিত্তি যে শিক্ষা তা শুধুমাত্র পুঁথিগত বিদ্যা আহরণ করায় না—'সংসারাশ্রমের জন্য এবং সংসারা-শ্রমের অতীত ব্রহ্মের সহিত অনন্ত যোগসাধনের জন্য প্রস্তুত হইবার সাধনাই' এই শিক্ষা।

বিবেকানন্দ নিধির মূল্যবোধের শিক্ষাক্রমের মূল ধারণা পাওয়া যায় একটি দৃষ্টান্ত থেকে। পঙ্কজের দৃষ্টান্ত। পঙ্কজের পঙ্ক প্রয়োজন খাদ্য আহরণের জন্য—উদ্দেশ্য পঙ্ক উত্তীর্ণ হয়ে বিকশিত হওয়া। বিকশিত হয়ে ওঠাই প্রধান মূল্যবোধ, আর সব কিছুই সহায়ক। জীবনের কোন পর্যায়ই মূল্যহীন নয়, প্রত্যেকটি পর্যায় সামনের দিকে

এগিয়ে নিয়ে যায় যদি লক্ষ্য হয় চরম পর্যায়ে উত্তরণ করা। খুব ক্ষুদ্র জীবকোশ থেকেই এই জীবনের শুরু। বিভিন্ন স্তর পেরিয়ে আসে মানুষের ব্যক্তিত্ব। শুরু হয় সমাজের সঙ্গে দেওয়া, নেওয়ার শুরু তো হয়েছে আগেই। ব্যক্তিত্ব বিকশিত হলে এই দেওয়া-নেওয়ার হিসেবে নেওয়াটাই বড় হয়ে ওঠে না—জীবধর্ম সমাজ-ধর্মে রূপান্তরিত হয়। বিকশিত হয়ে উঠলেই ক্ষুদ্র আমি থেকে বৃহৎ আমি'তে উত্তরিত হওয়া যায়। দৃষ্টিভঙ্গী হয় মুক্ত, সামগ্রিক। থাকে না খণ্ডচিন্তা। মনে হয় আমি সবকিছুর সঙ্গে সম্পর্কিত, যুক্ত। গেয়ে ওঠা যায়

আকাশ ভরা সূর্য তারা বিশ্বভরা প্রাণ
তাহারি মাঝখানে আমি পেয়েছি মোর স্থান।

আর তখনই মানবাত্মার মুক্তি যা মানবজীবনের চরম লক্ষ্য।

মূলাবোধ সচেতনতা'র এই শিক্ষাক্রমই বিবেকানন্দ নিধি আর পাঠভবনের যৌথ উদ্যোগে দেওয়া হ'ল শান্তিনিকেতনের পাঠভবনে, এপ্রিল মাসের ৩, ৪ ও ৫ তারিখে। শিক্ষাক্রমে অংশ নিয়েছিলেন প্রধানত সপ্তম থেকে দশম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীরা, এছাড়াও ছিলেন কয়েকজন কলেজের শিক্ষক, শিক্ষিকা ও একজন ছাত্রী।

রোদসীর বর্তমান সংখ্যায় এই শিক্ষাক্রমের বিবরণ দেওয়া হচ্ছে। সেইজন্য অন্যান্য নিয়মিত বিষয় প্রকাশন স্থগিত থাকছে।

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষানীতি বৈদিক শিক্ষাধারার আদর্শে অনু-প্রাণিত। রবীন্দ্রনাথের রচনে, যজনে, যাজনে ভারতের সংস্কৃতিই উদ্ভাসিত। আমরা যেন রবীন্দ্র-রচনার বহিরঙ্গ পেরিয়ে অন্তরঙ্গে প্রবেশ করতে পারি।

শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্যাশ্রম প্রতিষ্ঠা দিবসের উপদেশ

আজ থেকে তোমরা সত্যব্রত গ্রহণ করলে। মিথ্যাকে কায়-মনোবাক্যে দূরে রাখবে। প্রথমত সত্য জানবার জন্য সবিনয়ে সমস্ত মন বুদ্ধি ও চেষ্টা দান করবে, তার পরে যা সত্য বলে জানবে তা নির্ভয়ে সতেজে পালন ও ঘোষণ করবে।

আজ থেকে তোমাদের অভয়ব্রত। ধর্মকে ছাড়া জগতে তোমাদের ভয় করবার আর কিছুই নেই। বিপদ না, মৃত্যু না, কষ্ট না—কিছুই তোমাদের ভয়ের বিষয় নয়। সর্বদা দিবা রাত্রি প্রযুল্ল-চিত্তে প্রসন্নমুখে শ্রদ্ধার সঙ্গে সত্য-লাভে ধর্ম-লাভে নিযুক্ত থাকবে।

আজ থেকে তোমাদের পুণ্যব্রত, যা-কিছু অপবিত্র কলুষিত, যা-কিছু প্রকাশ করতে লজ্জা বোধ হয়, তা সর্বপ্রযত্নে প্রাণপণে শরীর-মন থেকে দূর করে প্রভাতের শিশিরসিক্ত ফুলের মতো পুণ্যে ধর্মে বিকশিত হয়ে থাকবে।

আজ থেকে তোমাদের মঙ্গল ব্রত। যাতে পরস্পরের ভালো হয় তাই তোমাদের কর্তব্য। সেজন্য নিজের সুখ নিজের স্বার্থ বিসর্জন।

এককথায় আজ থেকে তোমাদের ব্রহ্মব্রত। এক ব্রহ্ম তোমাদের অন্তরে বাহিরে সর্বদা সকল স্থানেই আছেন। তাঁর কাছ থেকে কিছুই লুকোবার জো নেই। তিনি তোমাদের মনের মধ্যে স্তব্ধ হয়ে দেখছেন। যখন যেখানে থাক, শয়ন কর, উপবেশন কর, তাঁর মধ্যেই আছ, তাঁর মধ্যেই সঞ্চরণ করছ। তোমার সর্বাঙ্গে তাঁর স্পর্শ রয়েছে তোমার সমস্ত ভাবনা তাঁরই গোচরে রয়েছে। তিনিই তোমাদের একমাত্র ভয়, তিনি তোমাদের একমাত্র অভয়।

– রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পাঠভবনে মূল্যবোধ সচেতনতার শিক্ষাক্রম

হলদিয়া। ১৯৮৫ সালের নভেম্বর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ। হলদিয়ার রোটারি ক্লাবের উদ্যোগে বিবেকানন্দ নিধির 'মূল্যবোধ এবং মানব সম্পদ উন্নয়ন' বিষয়ক শিক্ষাক্রম চলছে। অংশগ্রহণ করেছেন প্রধানতঃ হলদিয়ার বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানের উচ্চপদস্থ কর্মীরা। একটি স্কুলের দুজন শিক্ষকও ছিলেন। আর ছিল বিশ্বভারতীর স্নাতক শ্রেণীর দুজন ছাত্র ও স্নাতকোত্তর শ্রেণীর একজন ছাত্রী—তিলক চ্যাটার্জী, ইন্দ্রনীল হাজরা আর মালা চ্যাটার্জী।

এই তিনজনের সঙ্গে বিবেকানন্দ নিধির পরিচয় মাত্র কয়েক মাস আগে শান্তিনিকেতনে একটি আলোচনাচক্রে। ওরা ঐ আলোচনায় অংশগ্রহণ করেছিল এবং মূল্যবোধ সচেতনতা সংক্রান্ত আলোচনার প্রয়োজন উপলব্ধি করেছিল। কিছুদিনের মধ্যে হলদিয়ায় মূল্যবোধ সংক্রান্ত শিক্ষাক্রম হবে জানতে পেরে ওরা ঐ শিক্ষাক্রমে যোগ দিতে চেয়েছিল।

'আমি যে শিক্ষাক্রমটিতে যোগদান করেছি তার কারণ এই নয় যে আমি নতুন মূল্যবোধ খুঁজছি। আমার ধারণাকে সংশোধন ক'রে নেওয়া এবং প্রয়োজনে পরিবর্তন করার রাস্তা খোঁজাই আমার উদ্দেশ্য। এই ধরণের শিক্ষাক্রম এই বিষয়ে পথপ্রদর্শক হতে পারে' শিক্ষাক্রমের শেষে বলেছিল মালা চ্যাটার্জী।

হলদিয়ার পর থেকেই মালা, তিলকের খুব ইচ্ছে ছিল শান্তিনিকেতনে এই রকম একটা অনুষ্ঠান করবার। শান্তিনিকেতন প্রতিষ্ঠার মূল উদ্দেশ্য মানুষকে সত্য ও মঙ্গলের দিকে উদ্বুদ্ধ করা। কিন্তু মানুষ সাধারণতঃ এই মূল সুরে পৌঁছবার চেষ্টা করে না। তাই ওখানকার শিক্ষার্থীদের সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা করতে পারলে বেশ হয়।

এরপরে ওরা সুযোগ খুঁজেছে কি ক'রে কর্তৃপক্ষের কাছে এ ব্যাপারে প্রস্তাব রাখা যায়। এর মধ্যে আরও দু-একটা মূল্যবোধ সংক্রান্ত আলোচনাচক্র শান্তিনিকেতনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুষ্ঠানগুলি আয়োজনে বিশেষ উৎসাহী ছিলেন বিনয় ভবনের অধ্যক্ষা শ্রীমতী

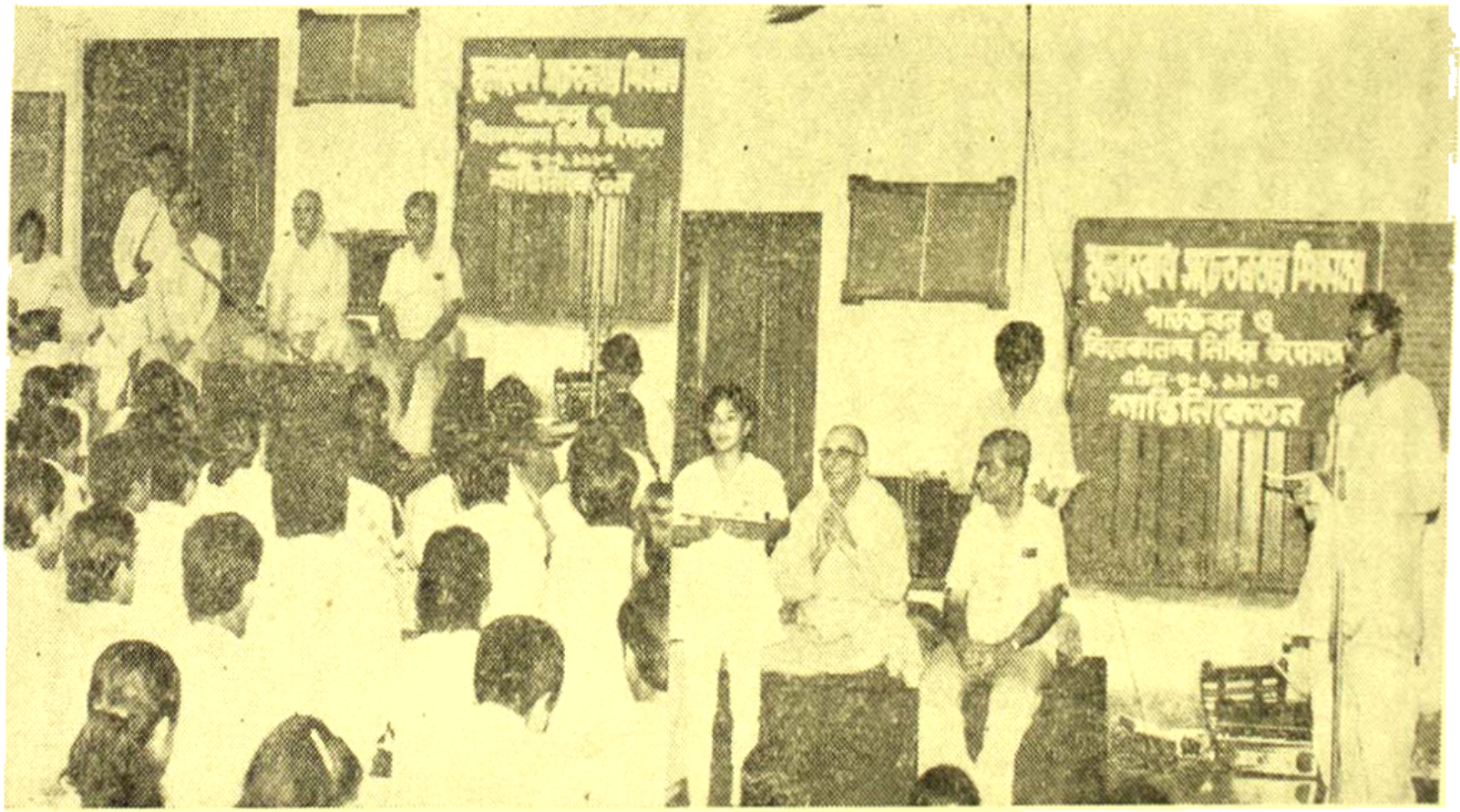

'মনুষ্যত্ব লাভ স্বার্থ নহে পরমার্থ'

আরতি সেন। তাঁর সঙ্গেও শিক্ষাক্রম আয়োজন সম্পর্কে আলোচনা হ'ল। পাঠভবনের অধ্যক্ষ শ্রীসুপ্রিয় ঠাকুরের কাছে আবেদন গেল পাঠভবনে মূল্যবোধ সচেতনতা বিষয়ে তিনদিনের শিক্ষাক্রম আয়োজন করার। বিবেকানন্দ নিধির সঙ্গে সুপ্রিয়বাবুর এই বিষয়ে যোগাযোগ হ'ল। ঠিক হ'ল এপ্রিল মাসের শুরুর দিকে সপ্তম থেকে দশম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের জন্য তিনদিনের একটি শিক্ষাক্রম আয়োজন করা যেতে পারে।

মূল্যবোধ সচেতনতার নিয়মিত পাঠক্রমের আলোচনায় মূল্যবোধের উৎস এবং ভূমিকা সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা হয়। মূল্যবোধ কত রকমের আর কিভাবে তা আমাদের প্রত্যেকটি কাজ, আচরণ এবং ব্যবহারকে নিয়ন্ত্রণ করে তা বিশ্লেষণ করা হয়। আমরা যদি কোন কাজ শুরু করার আগে সেই কাজ কি উদ্দেশ্য নিয়ে করছি বিশ্লেষণ করতে পারি তাহ'লে আমাদের কাজটি লক্ষ্য অভিমুখী হয়। তার আমাদের লক্ষ্য যদি কল্যাণ হয়, আমরা যদি সত্যকে পরিত্যাগ না করি তাহলে আমরাই এই পৃথিবীটাকে সুন্দর ক'রে তুলতে পারি। শিক্ষাক্রমে এই বিষয়টি বিভিন্ন দিক থেকে বিচার করা হয়। মূল্যবোধ কিরকম হলে আমরা আমাদের সামাজিক পরিবেশকে সুস্থ রাখতে পারি, প্রাকৃতিক পরিবেশকে অক্ষত রাখতে পারি তাও আলোচনা করা হয়: বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে মূল্যবোধকে বিশ্লেষণ করা হয়। জীববিজ্ঞান, পরিবেশবিজ্ঞান, ভৌতবিজ্ঞানের সঙ্গে মূল্যবোধ কিভাবে জড়িত – বিজ্ঞান এবং কারিগরীবিদ্যার উন্নতিতে মূল্যবোধ কিভাবে পরিবর্তিত হয় তা আলোচনা করা হয়। শিক্ষা ও মূল্যবোধের সম্পর্ক সম্বন্ধেও আলোচনা হয়।

এবারের আয়োজন হবে রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতনে। তাই সবাই ভাবলেন নতুন কোন বিষয় শিক্ষার্থীদের কাছে উপস্থাপন করা যায় কিনা। শুধু বিষয় ঠিক করলেই তো হবে না। সেই বিষয়ে আলোচনাতে শিক্ষার্থীদের যিনি উৎসাহিত করবেন, প্রশ্ন করতে উদ্বুদ্ধ করবেন, প্রশ্নগুলির সঠিক উত্তর দেবেন তাঁকেও খুঁজে বার করতে হবে।

রবীন্দ্রনাথ এবং তাঁর সমসাময়িক কয়েকজন পুরুষ আমাদের জাতীয় জীবনকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেন। রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ, গান্ধীজী এবং শ্রীঅরবিন্দ প্রত্যেকেই এক একটি আদর্শ নিয়ে কাজ করেছেন। এই আদর্শের পেছনে তাঁদের মূল্যবোধ কাজ করছে। চারজনের আদর্শে কিছু পার্থক্য নিশ্চয়ই ছিল আবার অনেক মিলও ছিল। প্রত্যেকেই ভারতবর্ষের সংস্কৃতিকে শ্রদ্ধা করেছেন কিন্তু আন্তর্জাতিকতা থেকে বিচ্ছিন্ন হননি। জাতীয়তাবোধ রেখে আন্তর্জাতিকতাকে আপন ক'রে গ্রহণ করেছেন। চারজনেই কাজের মাধ্যম হিসেবে শিক্ষাকে গ্রহণ করেছেন। প্রত্যেকেই বলেছেন ধর্মকে বাদ দেওয়া যাবে না কেননা ব্যক্তিত্বের বিকাশের জন্য ধর্ম একান্ত প্রয়োজনীয়। এই ধর্ম কিন্তু গোঁড়ামি নয়। দেশের স্বাধীনতার জন্য এই চারজনই অত্যন্ত উৎসাহী ছিলেন এবং দেশের মানুষকে দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। এঁরা বুঝেছিলেন দেশের দারিদ্র মোচন না হলে যেমন কোন উন্নতি হবে না, দারিদ্র মোচনের পন্থাটিও কিন্তু ভারতীয় হতে হবে। নারী প্রগতি ছাড়া ভারতবর্ষের উন্নতি যে অবাস্তব সে বিষয়ে প্রত্যেকেই ছিলেন দ্বিধাহীন।

নিজেদের এই আদর্শের প্রচারে প্রত্যেককেই কঠিন কষ্ট স্বীকার করতে হয়েছে। বিবেকানন্দ দেশে-বিদেশে অভিনন্দন যত পেয়েছেন অবমাননাও সহ্য করেছেন যথেষ্ট। রবীন্দ্রনাথ সর্বস্ব দিয়ে ভিক্ষে ক'রে শান্তিনিকেতনের আশ্রম তৈরী করলেন। কোন্ মূল্যবোধের জন্য? গান্ধীজী সুখ পরিত্যাগ ক'রে যে রাস্তা বেছে নিলেন তা পৃথিবীকে একটা নতুন দিক দেখাল। অহিংসা দিয়ে হিংসাকে রোধ করা। গান্ধীজীর এই আদর্শ একান্ত ভারতীয়। গান্ধীজীর সময় পৃথিবীর মানুষ তাঁর নীতি যতটা সমর্থন করেছে আজকে সমর্থন করছে অনেক বেশী। শ্রীঅরবিন্দ ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করলেন। তারপরে মানবজীবনের সত্য অনুসন্ধানে নিজেকে সমর্পণ করলেন। শ্রীঅরবিন্দের দর্শন মানুষের চেতনার বিভিন্ন স্তরকে বিশ্লেষণ করে।

মূল্যবোধ সচেতনতার শিক্ষাক্রম—কাদের জন্য ?

আপনারা যে কাজ করছেন তা নিশ্চয়ই খুব সময়োপযোগী। কিন্তু আপনাদের টার্গেট গ্রুপ ঠিক হয়নি। স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের এই সব কথা বলার থেকে আরও জরুরী হচ্ছে তাদের বাবা-মা-অভিভাবকদের মূল্যবোধ সম্বন্ধে সচেতন করা। অনেকদিন শান্তি-নিকেতনে আছি। অনেক ছাত্রছাত্রী, তাদের অভিভাবক, শান্তি-নিকেতনের অনেক দর্শনার্থী দেখলাম। ঐ গ্রুপকে যদি সচেতন না করা যায় তা হলে ছোটদের সচেতন করা অসম্ভব। একজন ছাত্রীর আচরণ শান্তিনিকেতনের মূল ভাবের বিপরীত ছিল। তার বাবা-মাকে তা বলা হ'ল। এ অনুরোধও করা হ'ল যেন তাঁরা তাঁদের সন্তানের আচরণ পরিবর্তন করায় সচেষ্ট হন। কিন্তু তাঁরা এ কথার কোন

['পাঠভবনে মূল্যবোধ সচেতনতার শিক্ষাক্রম' এর শেষাংশ]

এই চারজন পুরুষের জীবন এবং মূল্যবোধ নিয়ে শান্তিনিকেতনের অনুষ্ঠানে আলোচনা হবে ঠিক হ'ল। আলোচনাটা মূলতঃ পরিচালনা করার জন্য পাওয়া গেল অধ্যাপক অম্লান দত্ত মহাশয়কে। বিশ্ব-ভারতীর পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক শ্রীদীপঙ্কর চট্টোপাধ্যায় ও স্বামী যুক্তানন্দও এই আলোচনায় অংশ নেন।

শিক্ষাক্রমে মাইণ্ড স্টিলিং বা মনস্থিতি অভ্যাসের ক্লাস ছিল। উদ্দেশ্য শিক্ষার্থীদের একাগ্রতা অভ্যাস করানো। সপ্তম, অষ্টম, নবম বা দশম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের এই মনস্থিতি বা 'প্রত্যাহার' অনুষ্ঠান যে যথেষ্ট আকর্ষণীয় লাগতে পারে তা আমরা আগে বুঝিনি। মনস্থিতি অভ্যাসের বিভিন্ন অভিজ্ঞতার কথা আমরা আলাদা ক'রে উপস্থাপন করছি। এছাড়াও ছিল মূল্যবোধের ধাঁধার ক্লাস যা শিক্ষার্থীদের কাছে অত্যন্ত আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছিল।

মূল্যবোধের শিক্ষাক্রম শান্তিনিকেতনে পাঠভবন থেকে শুরু হ'ল। আমাদের বিশ্বাস এই শিক্ষাক্রমে আলোচিত বিভিন্ন বিষয় শিক্ষার্থীদের চিন্তার রসদ যোগাবে। এই চিন্তার ঢেউ হয়তো একদিন বিশ্বভারতীর শিক্ষার্থীদেরও চিন্তার জগতে আলোড়ন আনবে।

শুরুই দিলেন না। ঐ মেয়েকে তিন দিনের ক্লাস ক'রে কি কিছু করা সম্ভব ? ও তো বাবা-মার প্রশ্রয়ে যা করবার নয় তাই করবে।

আরো শুনুন। কত রকমের দর্শক আসে এখানে। একজন জিজ্ঞেস করলেন রবীন্দ্রনাথের জন্ম কোন্ ঘরে হয়েছিল। অবশ্যই বঙ্গসন্তান। কিশোর নয়। তাহ'লেই দেখুন শান্তিনিকেতনকে রবীন্দ্রনাথের জন্মস্থান ব'লে জানা লোকও আছে। এদের এই অজ্ঞতার কারণ কি ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি প্রচণ্ড অবহেলা নয় ?

—শান্তিনিকেতনের একজন কর্মী

★

এই তিনদিনের শিক্ষাক্রমে আমরা অনেক কথা, অনেক তথ্য অনেক তত্ত্ব নতুন শুনলাম। তার মধ্যে আমার এবং হয়ত আমার অন্য বন্ধুদেরও একটা কথা খুবই নতুন মনে হয়েছে। আমরা বলি আমাদের দেশ ধর্মনিরপেক্ষ। কিন্তু ধর্মনিরপেক্ষ হওয়া মানে তো মানবধর্মকেই বাদ দেওয়া। মানবধর্মকে ত্যাগ করে বেঁচে থাকলে আমরা কি মানুষ হিসেবে বেঁচে থাকব ? ..... এই তিন-দিনে আমরা আর একটা বিষয় শিখেছি আমরা নিজেরা নিজেদের মূল্যবোধ সম্বন্ধে সচেতন হয়ে কোন কাজ করা উচিত, কোনটা নয়—নিজেরাই ঠিক করব। আমরা নিজেরা নিজেদের দেখব।

এই শিক্ষার প্রভাব আমাদের চিন্তাধারায় নিশ্চয়ই পড়বে। এই শিক্ষা ভবিষ্যতে অনেক সমস্যার সমাধান নিজে নিজে খুঁজতে সাহায্য করবে। তাই আমরা এই শিক্ষা লাভ ক'রে উপকৃত মনে করছি।

—সমাপ্তি অনুষ্ঠানে পাঠভবনের ছাত্র সম্পাদকের বিবৃতির অংশ

★

আমি আমার শরীরের সম্বন্ধে সচেতন হয়ে বসলাম। শান্ত স্নিগ্ধ আমি। আমি আমার ভিতরে আমার বড় আমি'কে খুঁজে পাচ্ছিলাম। আমি হয়ে গিয়েছিলাম মুগ্ধ। আজ আমার চোখের কোনায় দু ফোঁটা জল জমে গিয়েছিল। আমার মধ্যে একটা চাপা দুঃখ আমরা যে অবাধ স্বাধীনতা পেয়েছিলাম তা আবার হারালো। স্কুলেও আমরা এতোটা স্বাধীনতা পাই কিন্তু তা মন দিয়ে গ্রহণ করতে পারি না।

—অষ্টম শ্রেণীর একজন ছাত্রীর ডাইরী থেকে

মনস্থিতি অভ্যাসের অভিজ্ঞতা

(মনস্থিতি অভ্যাসের সময় ছাত্রদের অভিজ্ঞতা এখানে লিপিবদ্ধ করা হ'ল। পরপর কয়েকটি পর্যায়ে অনুষ্ঠিত এই ক্লাসে বিভিন্ন শিক্ষার্থীর অভিজ্ঞতা পর্যায়ক্রমে দেওয়া আছে)

ছাত্র 'ক' (দশম শ্রেণী) ঃ

• আমার মন প্রথমেই চলে গিয়েছিল আমার বাঁ পায়ের বুড়ো আঙুলের কাছে যেখানে গতকাল খেলতে গিয়ে চোট লেগেছিল। পরক্ষণেই আমার মন চলে গেল বহুদূরে, আমার বাড়ীতে। আমার বোনের পরীক্ষা চলছিল তাই দেখতে চেষ্টা করছিলাম।

• একসময় যখন আমার মন স্থির হ'ল তখন মনে হ'ল আমি যেন এক অন্ধকার জগতে প্রবেশ করছি। সেখানে ভীষণ আওয়াজ। এই আওয়াজটার সঙ্গে সমুদ্রের গর্জনের মিল আছে। হঠাৎই আমার মন আবার ফিরে আসে এই ঘরে। তখন সত্যি খুব আনন্দ হয়েছিল কিন্তু তার আগে যে খুব ভয় বা দুঃখ পেয়েছিলাম তা নয়।

• আজ আবার সেই একই রকম অভিজ্ঞতা। সেই বিশাল অন্ধকার আর ভয়ঙ্কর আওয়াজ। কিন্তু আজ আর এক নতুন অভিজ্ঞতা হ'ল। আমি দেখলাম যে আমি কিছুতেই সেই অন্ধকার থেকে বেরিয়ে আসতে পারছিনা।

• আজ নিজেকে বেশ হালকা লাগছিল, আর আমি যখন আমার আদর্শকে সামনে রেখে তাঁর কথা চিন্তা করছিলাম তখন শুধু তাঁর চুল সহ মাথাটা ধারণা করতে পারলাম। আর সব সময় মন অন্যদিকে চলে গিয়েছিল।

• আজ অভ্যাস করার সময় যেহেতু কোন আওয়াজ হয়নি তাই সহজে মন স্থির হয়েছে। যার ফলে এই ব্যায়াম ক'রে অন্যান্য দিনের তুলনায় নিজেকে আরও হালকা লাগছিল। আজ আমার মন অন্যদিকে ছুটে যায়নি কারণ যে মনটা দেখে তার বিশেষ সচেতনতার ফলে অন্য মনটা স্বাধীনভাবে একজায়গায় স্থির হয়েছিল।

ছাত্র 'ধ' (অষ্টম শ্রেণী) ঃ

* আমার ভাই এর জন্য মন খারাপ লাগছিল। সেও আমার মতো হস্টেলে থেকে পড়ে। অনেকদিন ওকে দেখিনি। মায়ের জন্যও খুব মন খারাপ লাগছিল। নিজেকে খুব পবিত্র মনে হচ্ছিল। ভাবছিলাম রোজ যদি এরকম ধ্যানস্থ হয়ে বসে থাকা যায় কিছুক্ষণ তাহলে মনঃসংযোগ বাড়ানো যায়।

* আমি যেন চলে গিয়েছি স্বপ্নপুরীতে একা। অন্ধকার সেই নগর। আমার ভয় করছিল। আমার প্রিয় বন্ধু যে স্কুল ছেড়ে চলে গেছে তার কথা মনে হচ্ছিল। আর মনে হচ্ছিল অঙ্কের মাস্টারমশাইকে। উনি খুব রেগে আমাদের বকছেন।

* আজ বারবার মনে হয়েছে মার কথা আর বাড়ীর কথা। কিছুক্ষণ স্তব্ধ থাকার পর যখন স্বামীজী হঠাৎ কথা বললেন তখন খুব চমকে উঠেছিলাম ফলে চিন্তার প্রসঙ্গটাই পাল্টে গেল। শুধু খারাপ চিন্তা আসছিল। জোর ক'রে আবার চিন্তার মোড় ঘোরালাম। এই অভ্যাস করার ফলে আমার মনঃসংযোগ বেড়েছে। সব কিছুতে মন দিতে পারি।

* আজ যখন মনকে দেখছিলাম তখন হঠাৎ রাসবিহারী বসুর কথা মনে এল। তিনি কি সুন্দর ভাবে ইংরেজদের চোখকে ফাঁকি দিয়ে চলে গিয়েছিলেন।

ছাত্র 'গ' (সপ্তম শ্রেণী) ঃ

* আমি এই প্রত্যাহার অনুষ্ঠানে এক নতুন রাজ্যে চলে গিয়েছিলাম। আমার মনে হচ্ছিল আমি গ্রামে গিয়ে এই অনুষ্ঠানের নেতা হয়েছি এবং ছ'মাস পরে সফল হয়েছি। তাই আমি গর্ব অনুভব করছিলাম।

* আজ আমার মনে হ'ল যে চারজনের জীবনের মূল্যবোধ নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ, গান্ধীজী ও শ্রীঅরবিন্দ এঁরা একটা মূল্যবোধ বিষয়ে সভা আয়োজন করেছেন এবং আমি তাঁদের বরণ করছি ও মূল্যবোধ সম্পর্কে কথা বলছি।

* আজকে আমি আমার প্রিয় মহাপুরুষ মহাত্মা গান্ধীর কাছে

চলে গিয়েছিলাম। দেখলাম আমিও অহিংস ও দয়ালু হয়েছি তাঁর মতো। অন্য কিছু মনে করতে যাব এমন সময় স্বামীজী কিছু কথা বলায় মনোযোগ নষ্ট হয়ে গেল।

* আজ দেখলাম বড় হয়ে গেছি। একদিন সিনেমা হলে গিয়ে দেখছি যে সিনেমায় মূল্যবোধ সম্পর্কে অনেক কথা হচ্ছে কিন্তু দাদাদের সে কথা ভাল না লাগায় তারা চেয়ার পাখা ভেঙে দিচ্ছে। আমি তাদের পায়ে ধরে থামাতে গেলে তারা প্রচণ্ড মারল। পরে মূল্যবোধ সম্বন্ধে তাদের বোঝালে তারা বোঝে ও আমার সঙ্গে হাত মেলায়।

ছাত্র 'ঘ' (সপ্তম শ্রেণী) ঃ

* যখন মনকে শান্ত রাখছিলাম তখন মনে হচ্ছিল আমিই একমাত্র মানুষ যে নিজেকে দেখতে পাচ্ছে। তারপর শেষের দিকে শিরদাঁড়ায় ভীষণ ব্যথা করছিল তাই মন চঞ্চল হয়ে পড়ছিল।

* যখন আমি শরীর সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন থাকার চেষ্টা করছিলাম তখন বারবার মনে হচ্ছিল যে আমি আজ খুব কম খেলতে পেরেছি। আর সারা দিনের পর পা দুটো টনটন করছিল। মনে হচ্ছিল আমি মন স্থির না করার ফলে অন্যের অসুবিধে হচ্ছে।

* যখন আমি আমার মনকে দেখার চেষ্টা করছিলাম স্বামীজীর কথাগুলো তখন শোনার চেষ্টা করছিলাম। কিন্তু অদূরে সুমধুর বাজনা বাজলেও তা আমার পক্ষে সুমধুর হয়নি। গত দুবারের প্রত্যাহারের সময় যে গা-হাত-পা ব্যথা করছিল তা আজ করেনি বরং পরে শরীর ঝরঝরে লাগছিল। যখন আমার আদর্শের কথা ভাবতে বলা হচ্ছিল তখন আমার বারবার সুভাষ বসুর বুদ্ধিদীপ্ত চোখের কথা মনে পড়ছিল।

* যখন আমি মনকে দেখছিলাম মন দিয়ে তখন আমার মন ছাড়া আর কিছুকেই বুঝতে পারছিলাম না। যখন আমি আমার আদর্শ সুভাষ বসুকে চিন্তা করছিলাম তখন খুব দুঃখ হচ্ছিল তাঁকে দেখিনি ব'লে।

* যখন নিজেকে স্থির করছি বারবার মনে হচ্ছে বাড়ীতে কি হচ্ছে ? গতকাল আর একটু চাটনি পেলে বেশ হত। শুধু সুভাষ বসুকে চিন্তা করার সময় মন ছিল সম্পূর্ণ একাগ্র।

ছাত্র 'ঙ' (সপ্তম শ্রেণী) ঃ

* আমি চুপ ক'রে বসে অনেক কথা ভেবেছি। বাড়ীতে এখনও হয়তো সবাই ঘুমোচ্ছে, রোদ এসে পড়েছে মানুষের গায়ে। সব মানুষই মারা যায় কেন? পৃথিবীতে এত লোক গরীব কেন? এর কোন কিছুর উত্তর মন বলছেনা। মন খালি দেখছে। কবে আমি পড়াশুনোয় ভালো হব? যাঁদের কোন আত্মীয় মারা যান তাঁদের কত দুঃখ। শেষের দিকে একটু ঘুম এসেছিল।

* আমি ভাবছিলাম শালবীথির রাস্তায় গাছে গাছে হলুদ রঙের সূর্যের মতো ফুল ফুটেছে। সেই সুন্দর রাস্তা দিয়ে একটি ভিখারী ছেঁড়া পোশাক পরে যাচ্ছিল। তাকে দেখে আমার খুব দয়া হ'ল। তাকে বাড়ী নিয়ে গিয়ে কিছু খেতে দিলাম। রবীন্দ্রনাথ সেই রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন। আমার গায়ে খুব জোর।

* আমি যেন নেই। খালি আমার মন দেখছে। আমি বাবা-মার সঙ্গে আলমোড়া বেড়াতে গিয়ে বরফের পাহাড়ের ওপর বসে কবিতা লিখছি। আমি একটা তৃণক্ষেত্রে লুকিয়ে আছি এমন সময় দস্যুরা এসে আমাকে মেরে ফেলল। মা-বাবা খুব কাঁদছেন। ছোট-মামা আমাকে দুখানা গল্পের বই দিয়েছেন সেটা পড়তে ইচ্ছে করছিল।

* আমার একটু একটু ঘুম পাচ্ছিল। পাখির ডাক শুনতে পাচ্ছিলাম। আমাকে আমার বন্ধু মিথ্যে কথা ব'লে অপমান করেছে সেই কথা ভাবছিলাম। আর মনে হচ্ছিল আমি অন্ধকার জগতে শুন্যে ভাসছি।

* আমার মন দেখছে আমার তিনটে পরীক্ষা হয়েছে। আমি খুব ভাল নম্বর পেয়েছি। তাই সবাই আমাকে খুব আদর করছে। স্বর্গের দেবদূতেরাও। আমি জন্মদিনে সবাইকে কেক খাওয়াচ্ছি। আমি ড্রাকুলা হয়ে একটা জন্তুর রক্ত খাচ্ছি।

শিক্ষাক্রমে অংশগ্রহণকারী ছাত্রছাত্রীবৃন্দ

১। রঞ্জনা ঘোষ
২। মধুলিকা সামন্ত
৩। ইন্দ্রানী বিশ্বাস
৪। শালিনী মিশ্র
৫। তনয়া ভট্টাচার্য
৬। প্রদীপ্তা ভট্টাচার্য
৭। সুদেষ্ণা দত্ত
৮। মণিশীলা মণ্ডল
৯। আত্রেয়ী মিত্র
১০। পাপিয়া গুহ
১১। সুচরিতা আঢ্য
১২। সুনন্দিতা রুদ্র
১৩। সুদেষ্ণা লাহিড়ী
১৪। ইন্দ্রজিৎ মিত্র
১৫। সুমন্ত্র মিত্র
১৬। সুপ্রতীম ব্যানার্জী
১৭। সুমন্ত্র কুণ্ডু
১৮। জয়দেব সেনগুপ্ত
১৯। নীলাঞ্জন ব্যানার্জী
২০। সুমণ্ড গৌর
২১। অলক রায়
২২। সৌভিক চৌধুরী
২৩। শুভাশিস দাস
২৪। লোপামুদ্রা সরকার
২৫। মহুয়া চ্যাটার্জী
২৬। সুরঞ্জনা দত্ত
২৭। কেকা রায়
২৮। সুপর্ণা চক্রবর্তী
২৯। রুণা মজুমদার
৩০। জয়িতা চ্যাটার্জি
৩১। অনিতা পাল
৩২। কাকলি ভট্টাচার্য
৩৩। সুস্মিতা দাস
৩৪। শুকতারা রুদ্র
৩৫। অরুন্ধতী ভৌমিক
৩৬। দেবরর্ণা ব্যানার্জি
৩৭। এষা সেন
৩৮। অরুণিমা বসু মজুমদার
৩৯। কাকলি পাল
৪০। মুক্তা বসু
৪১। অনামিকা কুণ্ডু
৪২। সঞ্চয়িতা সিংহ
৪৩। সোমনাথ চ্যাটার্জী
৪৪। প্রদীপ্ত রায়
৪৫। সুদীপ্ত চক্রবর্তী
৪৬। স্বাগত মিত্র
৪৭। সবুজ কান্তি দত্ত
৪৮। অনিরুদ্ধ নায়েক
৪৯। ইন্দ্রদীপ সেন
৫০। ত্রিপুরা শঙ্কর বিশ্বাস
৫১। শঙ্কর মুখার্জি
৫২। জ্যোতির্ময় প্রামানিক
৫৩। পার্থ সারথি পাল
৫৪। সৌগত সেনগুপ্ত
৫৫। বিশ্বপতি মিত্র

৫৬। বিশ্বজিৎ দেবনাথ
৫৭। সমরজিৎ মণ্ডল
৫৮। ফারুক আহমেদ
৫৯। আবুল কালাম মহম্মদ হাসানুজ্জামান
৬০। তৌসিফ হোসেন চৌধুরী
৬১। জ্যোৎস্না হালদার
৬২। গৌরী কানুনগো
৬৩। পারুল ঠাকুর
৬৪। আম্রপালী সোম
৬৫। অমিয় কুমার চৌধুরী
৬৬। কণিকা হেমব্রম
৬৭। সুমিতা মুখার্জী
৬৮। মৌসুমী ভদ্র
৬৯। অপিতা গাঙ্গুলী
৭০। সঙ্গীতা সরকার
৭১। সুস্মিতা দে
৭২। রচনা বসু
৭৩। মৌবনী সেনগুপ্ত
৭৪। মালিনা মুন্সী
৭৫। কাঞ্চন মালা সেনাপতি
৭৬। পারমিতা মিত্র
৭৭। চন্দ্রচূড় সোম
৭৮। সৌরশ্রী প্রধান
৭৯। শুভব্রত দত্ত
৮০। ত্রিদীপ ঘোষ
৮১। চঞ্চল ব্যানার্জী
৮২। ইন্দ্রনীল ভট্টাচার্য
৮৩। অজিতেশ পাল
৮৪। কুন্দন গাঙ্গুলী
৮৫। রাজেন্দ্র নাথ সরকার
৮৬। পীযূষ ব্যানার্জী
৮৭। জিতমনু চক্রবর্তী
৮৮। অপূর্ব লাল সাহা
৮৯। ইন্দ্রনীল ঘোষ
৯০। রেশমী মিত্র
৯১। অনিন্দিতা রায়
৯২। জয়িতা মৈত্র
৯৩। স্বাতী বসু
৯৪। অরুন্ধতী কেশ
৯৫। শ্রীরূপা চ্যাটার্জী
৯৬। প্রকৃতি প্রতিম ঘোষ
৯৭। সুস্মিতা পাল
৯৮। সুজাতা গাঙ্গুলী
৯৯। কল্পনা বিশ্বাস
১০০। অনুপলক্ষ্মী প্রসাদ
১০১। মনীষা দাস
১০২। গার্গী সাউ
১০৩। ঋতশ্রী চ্যাটার্জী
১০৪। নিবেদিতা রায়
১০৫। নন্দনা রায় চৌধুরী
১০৬। শুভশ্রী বিশ্বাস
১০৭। শ্রাবণী ঘোষ
১০৮। তিষ্যপালী সরকার
১০৯। বর্ণালী সেনগুপ্ত
১১০। সোমালি চ্যাটার্জী
১১১। অপিতা পাল
১১২। নন্দনা বিশ্বাস
১১৩। আয়েষা সিংহ
১১৪। সংহিতা দেবনাথ
১১৫। শীলা মুখার্জী
১১৬। কল্পিতা দাস
১১৭। চন্দ্রানী মুখার্জী
১১৮। বর্ণালী মজুমদার
১১৯। ভাবনা রাঠোর
১২০। সুগন্ধা ভট্টাচার্য
১২১। জয়িতা মাঝি
১২২। সুধাংশু মুখার্জী
১২৩। তথাগত মুখার্জী
১২৪। সুদীপ্ত সরকার
১২৫। দেবশ্রী দাস

নিধির খবর

শান্তিনিকেতনের পাঠভবনে, বিবেকানন্দ নিধির সহায়তায় 'মূল্যবোধ সচেতনতা' বিষয়ক একটি তিনদিন ব্যাপী শিক্ষাক্রম অনুষ্ঠিত হয় ৩-৫ এপ্রিল। শিক্ষাক্রম শেষে সার্টিফিকেট পান ১২৫ জন অংশগ্রহণকারী, যাঁদের মধ্যে তিনজন শিক্ষক এবং একজন বিশ্বভারতীর ছাত্রী ছাড়া বাকী সকলেই ছিলেন পাঠভবনের সপ্তম-দশম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রী।

★

৬ই এপ্রিল বিশ্বভারতীর দর্শন ও ধর্ম বিভাগে 'ধর্ম, নীতি, মূল্যবোধ ও আমি' এই বিষয়ে আলোচনা করেন স্বামী যুক্তানন্দ।

★

ট্রেড নার্সেস্ অ্যাসোসিয়েশন অফ্ ইণ্ডিয়ার সাধারণ সম্পাদক শ্রীমতী নাগপাল বিবেকানন্দ নিধির কর্মীদের সঙ্গে পরিষেবা বৃত্তির জন্য মূল্যবোধ নিয়ে আলোচনা করেন। TNAI এর সদস্যাদের 'মূল্যবোধ ও মানবিক গুণাবলীর উন্নয়ণ' বিষয়ে পর্যায়ক্রমে বিবেকানন্দ নিধিতে শিক্ষাক্রম গ্রহণ করা এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিষেবা স্নাতক পর্যায়ে মূল্যবোধ প্রতিনিধ্যাসকে পাঠ্যসূচীতে অন্তর্ভুক্ত করাকে তিনি প্রশংসা করেন।

★

বিবেকানন্দ নিধির গবেষণা ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ১৭-১৯ এপ্রিল একটি শিক্ষাক্রম অনুষ্ঠিত হয়। শিক্ষাক্রমের বিষয় ছিল 'মূল্যবোধ এবং মানবিক গুণাবলীর উন্নয়ণ'। অংশগ্রহণকারীরা ছিলেন প্রধানতঃ TNAI এর সদস্যা। শিক্ষাক্রমের প্রারম্ভিক অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পূর্ত ও আবাসন দফতরের মন্ত্রী শ্রীযতীন চক্রবর্তী। শিক্ষাক্রম সম্পূর্ণ করে সার্টিফিকেট পান ৩৪ জন অংশগ্রহণকারী।

★

বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণে স্বামী যুক্তানন্দ সেখানকার বিভিন্ন বিভাগে 'মূল্যবোধ অভিমুখী শিক্ষা' নিয়ে আলোচনা করেন ২৪-২৮শে এপ্রিল।

নিয়মাবলী

লেখক-লেখিকাদের জন্য ঃ মূল্যবোধ ও পরিবেশ বা আজকের দিনের কোন সমস্যা নিয়ে আপনার গল্প বা প্রবন্ধ ছাপতে আমরা আগ্রহী।

লেখা কাগজের একদিকে বাঁদিকে অন্ততঃ এক ইঞ্চি ছেড়ে স্পষ্ট-ভাবে লিখবেন। লেখার নকল রেখে পাঠাবেন।

উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে যথাযথভাবে উদ্ধৃতি চিহ্ন থাকা প্রয়োজন। যে বই থেকে নেওয়া হয়েছে তার নাম, গ্রন্থকারের নাম, প্রকাশকের নাম ঠিকানা, প্রকাশন বর্ষ, সংস্করণ সংখ্যা ইত্যাদির নির্ভুল উল্লেখ আবশ্যক।

অমনোনীত লেখা ফেরত পেতে হ'লে রেজিষ্ট্রী ডাকের উপযুক্ত ডাকটিকিট পাঠাতে হবে।

চিঠির উত্তরের জন্য ষাট পয়সার স্ট্যাম্প বা ঠিকানা সম্বলিত খাম / ইনল্যাণ্ড / পোষ্টকার্ড পাঠাতে হবে। লেখা বা চিঠি সংযুক্ত সম্পাদক বা সম্পাদকের নামে পাঠাবেন।

গ্রাহকদের জন্য ঃ জানুয়ারী মাস থেকে বছর আরম্ভ। বছরের প্রথম সংখ্যা থেকে এক বছরের জন্য গ্রাহক হওয়া যায়। বছরের যে কোন সময় বার্ষিক চাঁদা গৃহীত হলেও গ্রাহক করা হবে জানুয়ারী মাস থেকে। বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা সডাক ১৫'০০ টাকা। ভারতের বাইরে $ ১০।

পরের মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে পত্রিকা না পেলে, অবিলম্বে কার্যালয়ে জানালে পুনরায় ঐ সংখ্যা দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু পরবর্তী মাসের মধ্যে না জানালে পত্রিকা প্রাপ্তির নিশ্চয়তা থাকবে না।

রোদসীর চাঁদা মণিঅর্ডারে পাঠালে কুপনে পুরো নাম, ঠিকানা পরিষ্কার ক'রে লেখা প্রয়োজন। মণিঅর্ডার বা পোস্টাল অর্ডারে টাকা পাঠানো যাবে। পোস্টাল অর্ডার বিবেকানন্দ নিধিকে দেয়। **মণিঅর্ডার পাঠানোর ঠিকানা ঃ** ১৪৯/১ই রাসবিহারী অ্যাভিনিউ, কলকাতা-৭০০০২৯। সরাসরি টাকা দিতে গেলে এই ঠিকানা ছাড়াও বিবেকানন্দ নিধি, ৯৯, কড়েয়া রোড, কলকাতা-১৯ ঠিকানায় যে কোন কাজের দিন বিকেল পাঁচটা থেকে সাড়ে সাতটার মধ্যে দেওয়া যাবে।

ঠিকানার পরিবর্তন হলে অন্ততঃ একমাস আগে জানাতে হবে।

Postal Regn No. WB/SO233
৫ম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, মে ১৯৮৭ Regn No. RN-41095/83

21 MAY 87

মানুষের একটা দিক আছে যেখানে বিষয়বুদ্ধি নিয়ে সে আপন সিদ্ধি খোঁজে। সেইখানে আপন ব্যক্তিগত জীবযাত্রা নির্বাহে তার জ্ঞান, তার ধর্ম, তার রচনাশক্তি একান্ত ব্যাপৃত। সেখানে সে জীবরূপে বাঁচতে চায়।

কিন্তু, মানুষের আর একটা দিক আছে যা এই ব্যক্তিগত বৈষয়িকতার বাইরে। সেখানে জীবনযাত্রার আদর্শে যাকে বলি ক্ষতি তাই লাভ, যাকে বলি মৃত্যু, সেই অমরতা। সেখানে জ্ঞান উপস্থিত প্রয়োজনের সীমা পেরিয়ে যায়; কর্ম স্বার্থের প্রবর্তনাকে অস্বীকার করে। সেখানে আপন স্বতন্ত্র জীবনের চেয়ে যে বড়ো জীবন সেই জীবনে মানুষ বাঁচতে চায়।

-- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সম্পাদনা, প্রকাশনা ও মুদ্রণ : স্বামী যুক্তানন্দ। সংযুক্ত সম্পাদক—লিপিকা গাঙ্গুলী। সহকারী—ছন্দা বাগচী।

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা ১৫ টাকা। প্রতি কপি ১ টাকা ৫০ পয়সা।

বিবেকানন্দ নিধি, ৮৬এফ, মনোহরপুকুর রোড, কলিকাতা-২৯ এবং ৯৯, কড়েয়া রোড, কলিকাতা-১৯, টেলিফোন ৪৪-৪৮১৩.

পাপাই প্রিন্টার্স ২৩৭, এন এস সি বোস রোড, কলিকাতা-৪৭ হইতে মুদ্রিত।

রোজধী

৫ম বর্ষ ।। ৬ষ্ঠ সংখ্যা ।। জুন ১৯৮৭

জগতে সমুদয় ধনরাশির চেয়ে 'মানুষ' হচ্ছে বেশী মূল্যবান।

—স্বামী বিবেকানন্দ

বিবেকানন্দ নিধি ও ইনষ্টিট্যুট অফ ভ্যালু ওরিয়েন্টেশন অ্যাণ্ড
এনভায়রনমেন্টাল এডুকেশন-এর মাসিক মুখপত্র

সূচীপত্র

বিজ্ঞান ও মূল্যবোধ ৮১

সফিস্‌টিকেশন

—শ্রীঋতেন ভট্টাচার্য ৮২

জেহাদ (কবিতা)

—শ্রীমতী মানসী মজুমদার ৮৪

মূল্যবোধ ও আমরা ৮৫

নিধির খবর ৮৭

ছোটদের বিভাগ

বিজ্ঞান ৮৮

'অমনোযোগী হয়ো না'—কথাটা ভুল

—শ্রীমতী পৃথা বল ৮৯

খাঁচায় বন্দী পাখি

—শ্রীপ্রীতিভূষণ চাকী ৯১

তুমি কি করবে ?

— স্বামী যুক্তানন্দ ৯৩

জানবার কথা ৯৫

রোদসী
৫ম বর্ষ ।। ৬ষ্ঠ সংখ্যা ।। জুন ১৯৮৭

বিজ্ঞান ও মূল্যবোধ

[৫]

বিজ্ঞানের নতুন নতুন আবিষ্কারের সঙ্গে প্রযুক্তিবিদ্যার পরিবর্তন হয়। এই ভাবেই হয় প্রযুক্তিবিদ্যার অগ্রগতি। প্রযুক্তিবিদ্যার অগ্রগতি এবং পরিবর্তনের সঙ্গে কিছু সামাজিক পরিবর্তন সম্পর্কিত। পরিবর্তন আসে আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে, ব্যবহারিক জীবনে। মানুষ এই পরিবর্তনে সায় দেয় যখন তার মূল্যবোধও পরিবর্তন হয়। এইসব মূল্যবোধ পরিবর্তনশীল। আমরা কয়েকটি দৃষ্টান্তের সাহায্যে বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তিবিদ্যার সঙ্গে মূল্যবোধ পরিবর্তনের সম্পর্ক বুঝবার চেষ্টা করব।

বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তিবিদ্যার উন্নতি আমাদের বেঁচে থাকার সময় অনেক বড় করেছে। মানুষের জীবন এখন অনেক বড়। কেন না অকাল মৃত্যু কমেছে। অনেক অসুখ আর হয়ই না। অনেক অসুখ মহামারী রূপে দেখা দেয় না কেননা চিকিৎসা বিজ্ঞান তা হতে দেয় না। এখন হার্ট, কিড্‌নি বা অন্য কোন অঙ্গ কাজ না করলে মানুষকে কৃত্রিম অঙ্গ দিয়ে বাঁচিয়ে রাখা যায়। ফলে কোন একটা নির্দিষ্ট সময়ে দেখা যাচ্ছে যে পৃথিবীর লোক সংখ্যা অনেক বেড়ে গেছে। ~~ফলে~~ মানুষ চিন্তা করল জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধ করার। মানুষের মূল্যবোধ বদলে গেল। কেননা কৃষির যুগে প্রয়োজন ছিল একই পরিবারের জনসংখ্যা বৃদ্ধির যাতে সবাই চাষের কাজে লাগতে পারে। মানুষ শুধু জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমাবার কথা চিন্তা করল না, চেষ্টা করল পৃথিবীতে যাকে আনা হবে সে যেন ভ লোভাবে শিক্ষিত হতে পারে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে। তার জন্য চাই ভালো শিক্ষা, ভালো পরিবেশ। অর্থাৎ মানুষ নতুন প্রজন্মের উৎকর্ষ অথবা কোয়ালিটির কথাও চিন্তা করল, আগে গুরুত্ব দেওয়া হত শুধু সংখ্যা বা কোয়ান্টিটীকে। কৃষিযুগ থেকে শিল্পবিপ্লবের যুগের ব্যবধানে মানুষের মূল্যবোধ কত বদলে গেল। এই পরিবর্তনের মূলে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিকাশ।

সফিস্‌টিকেশন্‌

শ্রীঅতন ভট্টাচার্য

শিবেটার মাথায় অনেক আইডিয়া আসে। ও ব'লে উঠল, 'বুঝলি, হিন্দুরা অনেক দূরদর্শী ছিল। সেই কোনযুগে শিবের মত একটা মডার্ন এবং সফিস্‌টিকেটেড দেবতা বানিয়েছে।'

রানার শিবেকে খোঁচানো অভ্যাস। ও বলল, 'কিন্তু তুই এখনও সফিস্‌টিকেটেড হতে পারলি না। দৃষ্টিভঙ্গীটা মান্ধাতার আমলেরই রয়ে গেছে। মডার্ন বা সফিস্‌টিকেটেড কোন দেবতা নেই সবই দেবী। দেখিস না দুর্গা বা সরস্বতীকে কেমন নব নব সাজে প্রতি বছর দেখা যায়। কলেজে পড়ার সময় দেখতাম সরস্বতী যেন সিসি লিসি —ফ্যাশানের পসরায় আপাদ মস্তক মোড়ক করা— শাড়িটা গায়ে তির্যগ্‌ভঙ্গিতে আঁট করে ল্যাপ্‌টানো। আর এ কয়বছরে রূপ পাল্টে একেবারে মন্দাকিনী মার্কা।'

শিবেটা বলল, 'বিবর্তনের মূলে যেতে গেলে গ্রে ম্যাটার লাগে যা তোর ধার করা উচিত। সরস্বতীর বিবর্তন এত জলদি কেন? ঐ বাবা মায়ের জন্য। বাবা মা এত মড না হলে কি ছেলে মেয়ে অত আধুনিক হয়?'

আমি ওদের তর্ক এতক্ষণ বেশ উপভোগ করছিলাম। এখন প্রশ্ন করলাম, 'তুই কি শিব দুর্গা জুটীকেই মডার্ন বা সফিস্‌টিকেটেড বলছিস?'

শিবে বলল, 'হ্যাঁ। তবে শিবটা একটু বেশী সফিস্‌টিকেটেড এবং মডার্ন। দেখিস না এখন যে বউ যত সুন্দরী বা খাণ্ডারী তিনি তাঁর স্বামী সম্বন্ধে বলেন 'উনি না একেবারে বোম্‌ভোলা মহাদেব। আমারই সব সামলাতে হয়। এমনকি অফিসের ব্যাপারও। প্রোমোশনের জন্য বড় সাহেবকে আমারই আপ্যায়ন করতে হয়।' ব'লে আমার স্বামী বোম্‌ভোলা মহাদেব। তাহলেই দেখছিস মডার্ন এবং সফিস্‌টিকেটেড মহিলাদের মডেল স্বামী হচ্ছেন শিব।'

রানার মাথাটা বোধ হয় পরিষ্কার হচ্ছে। ও বলল 'এগ্রিড।

শিবের এই পয়েন্ট মানছি। আরও একটা পয়েন্ট আছে। শিবের নেশাটা খুব আধুনিক। একুশ শতকের নেশার পথপ্রদর্শক শিব একথা বোধ হয় বলা চলে।'

আমি বললাম, 'কেন শিবের হিপি হিপি ভাবটা? বাড়ী ঘর থেকে পাহাড়-পর্বত শ্মশান অনেক বেশী পছন্দ। সেটাও তো আধুনিক।'

'শিবের একটা ব্যাপার কিন্তু মডার্ন নয়'—বলল রানা। 'বউটা মরে গিয়েছিল বলে এত তাণ্ডব করবার দরকারটা কি ছিল? বউ বেঁচে থাকতেই বউ পাল্টান তো এখন কোন অবিবেচনার কাজ নয়। আর মরে গেলে নতুন বউ আনা—সে ট্র্যাডিশন তো বন্ধ হয় নি।'

আমি বললাম, 'হ্যাঁ, এরকম শুনেছি স্বামী স্ত্রীর রুম টেম্পারেচার দু রকম লাগে ব'লে বিয়েই ভেঙ্গে গেল। পাত্র পাত্রীর বায়োডাটাতে আজকাল এই সব রিকোয়ারমেন্ট দেওয়া থাকে আর বোধহয় ঠিকুজীর থেকে এইসব ব্যাপারের মিল দেখাটাই বেশী উচিত।'

শিবে বলল, 'শিবের সফিস্টিকেশন এর প্লাস পয়েন্টটা এত ভারী যে অতটুকু এরর্ এ কিছু এসে যায় না। শিবের সফিস্টিকেশন্ কোথায় হান্ড্রেড পারসেন্ট বলত? ত্যাগে।'

রানার বোধহয় কথাটা খুব একটা মনে লাগেনি। ও বলল, 'তার মানে যে যত বেশী ত্যাগী সে তত সফিস্টিকেটেড?'

শিবে উচ্ছ্বসিত হলে বলল, 'তোর হয়ে গেছে, গ্রে ম্যাটার আর ধার করতে হবে না—শুধু একটু ঘুরিয়ে নে। যে যত সফিস্টিকেটেড সে তত ত্যাগী। শিবের ত্যাগ দেখিস না? মিনিমাম রিকোয়ারমেন্ট বসনে। যা পরেন তা প্রায় ফার। টপে এ শুধু উপবীত। কেবল বিশ্বকর্মার হাত তখনও পাকেনি বলে বিউটি পারলার গজায়নি—শিব ভ্রূ চাঁছতে পারেননি। শিবের লজ্জা নেই, ভয় নেই। একেবারে সফিস্টিকেশন পারসনিফায়েড। তাই না?'

জেহাদ

শ্রীমতী মানসী মজুমদার

তোমরা আবার বড়াই কর সৃষ্টির ?
ঠেলে উঠতে চাও আকাশ ভেদ ক'রে
তোমাদের কল্পিত না-জানা কোন স্বর্গে ?
তারই জন্য জোগান চাই অফুরন্ত শক্তির !
তাই অণুতে অণুতে ঘটাও সংঘর্ষ
বিস্ফোরণ হয় শক্তির—মদমত্ততার
ভিতরে কিন্তু শুকিয়ে যায় সৃষ্টির মূল,
প্রাণরস নিংড়ে নিয়ে লাভ কার, কিংবা কতটুকু ?
ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে নিয়ে বাইরে দেখানো শুধু বাঁচা-,
রূপ রস-শব্দ-গন্ধের বোধগুলো হারিয়ে
শুধু যান্ত্রিক নড়াচড়া, মেপে কথা বলা
বে-হিসাবের সৌন্দর্যটুকু আণবিক তাপে শুষে গেছে।

সৃষ্টি করতে তুমি পার কি পার না—
সে তত্ত্ব নিয়ে তর্কের তাড়না নাইবা করলে।
নিজের আনন্দে মশগুল হয়ে একটা ফুল ফোটাও
নয়তো কারো মুখে হাসি এনে দাও,
একটা গান গাও, যাতে রুদ্ধ থাকা ঝরনার মতো
হৃদয়ের বদ্ধ দুয়ার ভেঙে ফেলে বেরিয়ে আসবে আনন্দ,
জমে থাকা কান্নার স্তূপ খান্‌খান্‌ হয়ে ভেঙে
গুঁড়িয়ে গড়িয়ে যাক বিস্মৃতির অতল গহ্বরে।

মূল্যবোধ ও আমরা

[Value Orientation এ প্রকাশিত 'Values & Ourselves' অনুসরণে]

—পূর্বপ্রকাশিতের পর—

মূল্যবোধ ও সমাজতন্ত্রবাদ :

বৌদ্ধিক প্রচেষ্টার সামাজিকীকরণ ভারতীয় মনীষায় অত্যন্ত সমাদৃত। সমাজতাত্ত্বিকেরা সমাজের বিভিন্ন স্তরে রক্ষণশীলতা খুঁজে বার করতে পারেন কিন্তু প্রাচীন ভারতের দৃষ্টিতে মৌলবাদের অধিকার বিরল। যদিও প্রাচীন ভারত ধর্মবিশ্বাসে অত্যন্ত স্পর্শকাতর তবুও প্রত্যেকের তার নিজের মতো ক'রে ধর্মশাস্ত্রকে ব্যাখ্যা করার পূর্ণ স্বাধীনতা ছিল। জীবনের যে সব ক্ষেত্রে মানুষ প্রচণ্ড আবেগ তাড়িত হয়ে যায় সেগুলিরও সমাজিকীকরণ হয়েছিল এবং জনসাধারণের ধর্মব্যাখ্যার পূর্ণ স্বাধীনতা ছিল। ধর্মই যে জনগণের মধ্যে সবথেকে বেশী আবেগ জাগিয়ে তুলতে পারে তা স্বীকার ক'রে নিয়ে অসংখ্য মত ও পথের মধ্য দিয়ে তাদের ধর্মাচরণের পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছিল। অর্থাৎ শাস্ত্রকে কেবলমাত্র স্বীকার ক'রেই তাকে স্বকীয়-ভাবে ব্যাখ্যা করা সমাজস্বীকৃত ছিল। এমনকি ভারতীয় সংস্কৃতিতে ভাব ও প্রতীকের একমুখীনতাও ঘৃণিত। এই জন্যই ভারতীয় সংস্কৃতি বহুধাবিচিত্র। ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গীর প্রসঙ্গে গণতন্ত্রে ও সমাজতন্ত্রে নিহিত এই মূল্যবোধ সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা থাকলে আমাদের পক্ষে সংবিধানে অন্যতম মূল্যবোধ হিসেবে গৃহীত ধর্ম-নিরপেক্ষতার সঠিক অর্থ হৃদয়ঙ্গম করা সহজ হবে।

গণতন্ত্রের মূল্যবোধ ব্যষ্টির জন্য। কিন্তু সমাজতন্ত্রের মূল্যবোধ সমষ্টির জন্য। একটি অপরটি থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। ব্যক্তির পরিপূর্ণতা যেমন সমাজকে ঋদ্ধতর ক'রে তোলে তেমনই সমাজের ঋদ্ধতাও ব্যক্তি-মানুষের নিজস্ব উন্নততর মূল্যবোধকে খুঁজতে ও ধ'রে রাখতে সাহায্য করে। প্রত্যেক ব্যক্তিই শেষপর্যন্ত কোন না কোন গোষ্ঠীভুক্ত। অসচেতনভাবে হলেও গোষ্ঠীর সঙ্গে তার সম্পর্কের মধ্য দিয়েই তার

মূল্যবোধ গ'ড়ে ওঠে। তাই ব্যক্তি ও সমাজ জীবনের মূল্যবোধ অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। একে অপরের থেকে আলাদা ও পরস্পর বিরোধী নয়।

সমাজতন্ত্রে নিহিত মূল্যবোধ আমাদের শ্রেণীচেতনার মূল্যবোধের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে। প্রত্যেক ব্যক্তিই নিজ গোষ্ঠীর স্বার্থকে অপর গোষ্ঠীর স্বার্থ অপেক্ষা বেশী মূল্যবান ভাবতে অভ্যস্ত। একইভাবে জাতীয়, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক মূল্যবোধগুলিও আগের থেকেই মূল্যবোধ নির্ধারকের শ্রেণীচেতনার দ্বারা প্রভাবিত। এই শ্রেণীচেতনা সম্বন্ধে সচেতনতা মূল্যবোধেও পরিবর্তন ঘটায়। জমি ও উৎপাদন ব্যবস্থার নিরিখে শ্রমিক ও মালিক শ্রেণীর মধ্যেও এই মূল্যবোধের পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। রাজনৈতিক চেতনার অগ্রগতি নতুন আর্থ-সামাজিক চেতনার উদ্ভব ও ব্যাখ্যা আর প্রযুক্তিবিদ্যাই শ্রেণীচেতনাকে অধিকতর জাগ্রত করছে। পরিবারে প্রচলিত শ্রমসংস্কৃতি প্রযুক্তির অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। ফলতঃ প্রজন্ম প্রজন্ম বাহিত মূল্য-বোধগুলি আমাদের কাছে মূল্যহীন কুসংস্কারে পর্যবসিত হয়েছে।

এই ভাবেই আজকে সমাজতন্ত্রের মূল্যবোধ আমাদের জীবনে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ও সুদূরপ্রসারী হয়ে উঠেছে। এটা আরো তীব্র হয়েছে বিভাজন জাত প্রেয়বাদ ও স্বার্থান্ধতার জন্য অপরপক্ষে যেখানে সমাজতন্ত্রবাদ 'সমগ্র' কে নিয়ে সমগ্রের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে আনন্দ পাবার জন্য সামনে তাকাচ্ছে। সমাজ-তন্ত্রবাদ আমাদের ব্যক্তিজীবনকে প্রদত্ত আদর্শানুযায়ী গঠিত হতে সাহায্য করে এবং বিভাজন মানুষকে দৈহিক ও তাৎক্ষণিক মোহে বেঁধে রাখে। সমাজতন্ত্রবাদ মানুষকে সামগ্রিকভাবে, সার্বিক প্রেক্ষাপটে মানবিকতায় উন্নীত করে।

[ক্রমশঃ]

নিধির খবর

অরুণাচল প্রদেশের শের-এ বিবেকানন্দ কেন্দ্র আয়োজন করেন একটি শিক্ষক শিক্ষণ শিবির। সেখানে স্বামী যুক্তানন্দ এবং কানাডার সেন্ট জনস মেমোরিয়াল ইউনিভারসিটীর প্রফেসর এবং বিবেকানন্দ নিধির গবেষক কর্মী শ্রীমতী পূর্ণিমা সেন একটি চারদিনব্যাপী মূল্যবোধ প্রতিবিন্যাস বিষয়ক শিক্ষাক্রম পরিচালনা করেন ২০-২৩ মে। প্রায় তিরিশজন শিক্ষক শিক্ষিকা এই শিক্ষাক্রম গ্রহণ করেন।

*

৩১শে মে 'রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিক চেতনা' এই বিষয়ে স্বামী যুক্তানন্দ আলোচনা করেন।

*

৭ই জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে বিবেকানন্দ নিধির উদ্যোগে আয়োজিত হয় একটি আলোচনাচক্র। Trees our life, trees for beauty বিষয়ক এই আলোচনাচক্রটি অনুষ্ঠিত হয় বিড়লা ইণ্ডাস্ট্রিয়াল অ্যাণ্ড টেকনোলজিক্যাল মিউজিয়ামে অনুষ্ঠানটি উদ্বোধন করেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পরিবেশ বিভাগের মন্ত্রী ডঃ অম্বরীশ মুখার্জি।

মূল আলোচনাটি কয়েকটি অধিবেশনে ভাগ করা হয়েছিল। এই অধিবেশন গুলির বিষয় ছিল 'Why adopt trees?' এবং 'Is it possible to adopt trees in metropolitan cities' এই অধিবেশন দুটি পরিচালনা করেন যথাক্রমে কলকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সহ উপাচার্য ডঃ ডি কে সিন্‌হা এবং বেনারস হিন্দু বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কলা বিভাগের ডীন ডঃ অঞ্জন ব্যানার্জি।

দীক্ষান্ত ভাষণ দেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ শঙ্করী প্রসাদ ব্যানার্জি। [বিশদ বিবরণ পরবর্তী সংখ্যায়]

বিজ্ঞান

হীরা

হীরা বলতে আমরা বুঝি ঝলমলে একটা পাথর যার দাম খুব বেশী। হীরার ওপর আলো ফেললে আর হীরার দিকে তাকানো যায় না, চোখ ঝল্‌সে ওঠে। মনে হয় হীরার থেকে নানান রঙের আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছে। তখন আমরা আন্দাজই করতে পারি না যে হীরা তৈরী হয়েছে একটা খুব কুৎসিত কালো জিনিস থেকে। এই কালো জিনিস আমরা খুব ভালো চিনি। এর নাম কয়লা, বিজ্ঞানের ভাষায় কার্বন।

নিভে যাচ্ছে এই রকম আগ্নেয়গিরিতে হীরা তৈরী হয়। লাভা যখন তরল থেকে শক্ত হ'তে থাকে তখন লাভার মধ্যে যে কার্বন থাকে তার ওপর প্রচণ্ড তাপ এবং চাপ পড়ে। এই গরমে এবং চাপে কার্বনের অ্যাটম্ অন্যভাবে সংগঠিত হয়। এর ফলে আটকোনা কেলাস তৈরী হয়। যার নাম হীরা।

হীরা শুধু অলঙ্কারের জন্য নয়, বিজ্ঞানের পরীক্ষা ঘরে কিংবা কোন কারখানাতে, অন্য কোন কাজে ব্যবহার করা হয়। তার কারণ হীরা খুব শক্ত বস্তু এবং খুব গরমেতে গ'লে যায় না বা বিকীর্ণ হয় না। খুব শক্ত ব'লে অনেক যন্ত্রে হীরার bearing ব্যবহৃত হয়। এই সব bearing মিনিটে ৯০ হাজার পাক ঘুরতে পারে। আর এই ঘোরার ফলে bearingটাকে ঠিক রাখার জন্যে কোন পিচ্ছিল পদার্থ ব্যবহার করা হয় না।

আজকাল কৃত্রিম উপায়েও হীরা তৈরী হচ্ছে। কৃত্রিম উপায়ে হীরা তৈরীর জন্য আগ্নেয়গিরির মধ্যে যতটা তাপ ও চাপ থাকে তার দ্বিগুণ চাপ ও তাপ তৈরী করা দরকার। বৈজ্ঞানিকরা দেখেছেন যে কয়লার মধ্যে কোন ক্যাটালিস্ট ঢুকিয়ে দিলে হীরা তৈরীর কাজ অনেক

'অমনোযোগী হয়োনা'—কথাটা ভুল

শ্রীমতী পৃথা বল

যে কোনও কাজ করার সময় বা পড়াশুনার সময় গুরুজনেরা প্রায়ই তোমাদের বলেন 'অমনোযোগী হয়োনা। যারা অমনোযোগী তাদের কিছু হয়না'। এই ধরনের কথা তোমাদের সকলের কানেই সর্বক্ষণ লেগে আছে। স্কুলে মাস্টারমশাই বা দিদিমণি কোন পড়া বোঝাচ্ছেন, তুমি একটু অন্য দিকে তাকাতেই তিনি বললেন 'কি হচ্ছে, বোঝার সময় অমনোযোগী হয়োনা।'

আসলে কিন্তু অমনোযোগ কথাটাই ভুল। অমনোযোগ বলতে আমরা সাধারণতঃ মনোযোগের অভাবকেই বুঝি। পড়ার সময় সেইমুহূর্তে তোমার পড়াতে মনোযোগের অভাব ছিল তাই তিনি ও-কথা বলেছিলেন। কিন্তু মনে রাখবে অমনোযোগী আমরা কখনই হই না। স্বাভাবিক অথবা সুস্থ মানুষের পক্ষে কখনই অমনোযোগী হওয়া সম্ভব নয়। আসলে আমরা যাকে বলি অমনোযোগ তার অর্থ কিন্তু মনোযোগের অভাব নয়, কম মনোযোগ। অর্থাৎ অপেক্ষাকৃত প্রয়োজনীয় বিষয়বস্তু থেকে মনকে সরিয়ে অপ্রয়োজনীয় আকর্ষণীয় অন্য কোনও বিষয়বস্তুর প্রতি মনোযোগী হওয়া।

[বিজ্ঞান এর শেষাংশ]

তাড়াতাড়ি শুরু হয়। তাঁরা কয়লাতে ক্যাটালিস্ট ঢুকিয়ে তারপর তা খুব চাপের মধ্যে রাখলেন। রাসায়নিক কাজ শেষ হবার পর কয়লাকে ঠাণ্ডা অ্যাসিডে ফেলা হ'ল। হীরা অ্যাসিডে গলে না তাই অন্য সব জিনিস অ্যাসিডে গলে যাবার পর হীরা পড়ে থাকল। অবশ্য এই পদ্ধতিতে ভালো হীরা তৈরীর খরচ অনেক।

পৃথিবী'র সেরা হীরাটি একদিন আমাদের দেশেই ছিল, নাম কোহিনুর।

যে মেয়েটিকে শিক্ষিকা বকুনি দিলেন—'বাড়ীর কাজের সেলাই ভালো হয়নি, 'তুমি তো এত খারাপ সেলাই করো না, এই ব'লে। সত্যিই মেয়েটি হয়তো সেলাই করার সময় সেলাই এর দিকে বেশী মনোযোগ না দিয়ে গান শুনতে শুনতে কম মনোযোগ দিয়ে সেলাইটা করেছিল। তাই তার সেলাইটা মনোযোগ দিয়ে করার মতো ভালো হয়নি। প্রকৃতপক্ষে জাগ্রত অবস্থায় সম্পূর্ণ অমনোযোগী হবার কোন প্রশ্নই ওঠে না। শুধু শিশুরা কেন অনেক ছাত্র ছাত্রীই স্বভাবত চঞ্চল মতি সম্পন্ন হয়। তাই তাদের মনোযোগ এক বিষয় থেকে অন্য বিষয়ে চট ক'রে চলে যায়। ঠিক এই অবস্থাকেই আমরা অমনোযোগ বলি।

কোন কিছুতে মনোযোগ দেওয়া মানে হ'ল চারপাশের অসংখ্য বিষয় থেকে একটি বিষয়কে নির্বাচন ক'রে তাতে মনকে নিবিষ্ট করা।

তুমি পড়ার সময় হয়তো পাশের ঘরে ফুটবল খেলার আলোচনাতে মনোযোগ দিয়েছ। সেই সময় তুমি যে তোমার পড়ার থেকে মন সরিয়ে নিয়েছ তা তোমার শিক্ষক চান না তাই তিনি তোমাকে বলবেন অমনোযোগী।

মনে রাখবে সুস্থ মানুষ জেগে থেকে কোন না কোন দিকে মনোযোগ দেবেই। তবে মনোযোগ দ্রুত এদিক ওদিক চলে যায়। মনোযোগ নিজেই খুব ছটফটে প্রকৃতির। তাই চেষ্টা করলেই তুমি খুব সহজেই মনোযোগকে তোমার ইচ্ছামতো দরকারী বিষয়ে ফিরিয়ে আনতে পার। কোন বিশেষ দিকে মনঃসংযোগ করতে হলে অপর বিষয় থেকে মনোযোগকে অপসারিত করা দরকার। পড়ার সময় গল্প-গুজব, গানবাজনা, খেলাধূলার আলোচনা থেকে মনকে সরিয়ে আনতে পারলেই যে বিষয়ে মন দেওয়া দরকার তা সম্ভব হবে। তাই বলছি পড়তে বসে কেউ যদি বলে অমনোযোগী হয়োনা তাতে রাগ কোর না। মনে মনে শুধু জেনে নিও—অমনোযোগী কখনই হওয়া যায় না।

খাঁচায় বন্দী পাখি

শ্রীপ্রীতি ভূষণ চাকী

গাঁয়ের ধারে এক জঙ্গল ছিল। সেখানে একটা ঝাঁকড়া গাছের ডালে একটা পাখি বাসা বাঁধল। তার তিনটে বাচ্চা হ'ল। আস্তে আস্তে বড় হয়ে উঠতে লাগল বাচ্চারা। একদিন পাখি মা ওদের জন্যে খাবার আনতে গেল। এসে দেখল বাসাটা শূন্য পড়ে আছে। বাচ্চা-গুলো নেই। মনের দুঃখে সে এদিক ওদিক ছোটাছুটি করতে লাগল। কেউ-ই বলতে পারলনা বাচ্চা তিনটে কোথায়? শেষে এক ফিঙে পাখি বলল – 'আমি দেখেছি একটা দুষ্টু ছেলে এসে ওদের চুরি ক'রে নিয়ে গেছে। পাশের গাঁয়েই এক চাষী বউ এক খাঁচায় পুরে রেখেছে ওদের, ছাখো গে ওরা এখন বন্দী।'

পাখি মা শুনতে পেয়েই ছুটে চলল। উড়তে উড়তে সেই বাড়ীর কাছে পৌঁছে গেল। সে দেখল বাড়ীর শূন্য দাওয়ায় একটা খাঁচা ঝুলছে আর তার বাচ্চারা মনমরা হয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে।

খাঁচার কাছটিতে এসে পাখি মা শিকের ফাঁক দিয়েই ওদের আদর জানালো। ঠোঁট দিয়ে চুমো খেল। তারপর বলল, 'দাঁড়া আসছি। তোদের জন্যে খাবার নিয়ে আসি'। কিছুক্ষণ বাদেই সে একটা গাছের কটি লতা এনে, বাচ্চাদের বলল, 'নে চটপট তোরা এটা খেয়ে নে।'

আসলে সেটা ছিল বিষলতা। বাচ্চারা ওটা খাওয়া মাত্র মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল।

পাখি মার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল বটে কিন্তু 'আঃ বাঁচলুম' ব'লেই সে আকাশে ডানা মেলে উড়ে গেল।

'বন্দী জীবনের চেয়ে মৃত্যু ভালো'– একথাটি কজন ভাবতে পারে?

এই গল্পটি লিখেছিলেন, লিওনার্দো দা ভিঞ্চি। ইটালীতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি পৃথিবীর একজন শ্রেষ্ঠ চিত্রশিল্পী ও ভাস্কর। তাঁর 'মোনালিসা' নামে বিখ্যাত ছবিটির কথা তোমরা নিশ্চয়ই শুনেছ। তাঁর চেহারা ছিল দারুণ। প্রায় সাড়ে ছ ফুট লম্বা,

তুমি কি করবে ?

স্বামী মুক্তানন্দ

[১]

আমাদের স্কুলবাস বাড়ীথেকে স্কুলে নিয়ে আসে, আবার স্কুল থেকে বাড়ীতে নিয়ে যায়। আসবার সময় যে যার বাড়ী থেকে বাসে উঠে যেমন জায়গা পাই বসে পড়ি। জায়গা না থাকলে দাঁড়িয়েও থাকি। ফেরবার সময় কিন্তু স্কুল থেকে বেরিয়ে সবাই একসঙ্গে হুড়মুড় ক'রে উঠে পড়ি। মাঝে মধ্যে কোন দিদিমনি বকে লাইন করালে সেদিনটা ভয়ে ভয়ে লাইন ক'রে যেমন জায়গা পাই বসি। কিন্তু সেদিন লাইন করাবার কেউ ছিলেন না। বাসটা আসতেই সামনের দুজন উঠবার আগেই অতীন পেছন থেকে এসে ধাক্কা দিয়ে বাসে উঠে গেল। ধাক্কা খেয়ে অরূপের হাত ছড়ে গেল। অরূপ সমু ধাক্কা দিয়েছে ভেবে তার সঙ্গে মারামারি লাগিয়ে দিল। এই অবস্থায় আমার নীচের কোন কথাটা ঠিক ব'লে মনে হয় ?

পছন্দমতো জায়গার জন্য যেভাবেই পারি আগে ওঠাটা দোষের কিছু নয়।

অতীনের গায়ে জোর আছে তাই ধাক্কা মেরে উঠেছে। তাতে কেউ পড়ে গেলে দোষের কিছু নেই।

অরূপ ক্যাবলা তাই ওরকম পড়ে যায়। আবার ক্যাবলার মতো রাগ করে মারতেও যায়।

[খাঁচায় বন্দী পাখি'র শেষাংশ]

মজবুত গড়নের এই মানুষটি ছিলেন সবারই বিস্ময়। তাঁর গায়ে ছিল অসাধারণ শক্তি। তিনি ছিলেন গতি ও শক্তির পূজারী। ভীষণ ভালোবাসতেন পাখি। পাখিকে বলতেন মুক্তির প্রতীক। তিনি ভালো বাঁশি বাজাতে পারতেন। যে বাঁশিটি তিনি বাজাতেন সেটি ছিল প্রকাণ্ড আর তার মুখে খোদাই করা ছিল একটা ঘোড়ার মুখ। তিনি ছোটদের জন্য এরকম অনেকগুলি গল্প লিখেছিলেন।

অতীনের ব্যবহার ভদ্র নয়। নিশ্চয়ই ওদের বাড়ীতে সবার আচরণ ভদ্র নয়।

আমার ব্যাপার হলে অতীনকে দেখিয়ে দিতাম। ওদের ব্যাপার নিয়ে আমার মাথা ঘামাবার প্রয়োজন নেই।

[২]

একদিন স্কুল থেকে ফেরার সময় ঐ সেদিনের মতো একই অবস্থা। আমি পাদানিতে পা দিয়েছি, রবি আমার পা মাড়িয়ে কনুইয়ের ধাক্কা মেরে গাড়ীতে গিয়ে উঠল। যন্ত্রনায় আমি কেঁদে ফেললাম। তাই দেখে কেউ কেউ রবিকে বকল, অন্য সকলে আমার কান্না দেখে হাসাহাসি করল। এই অবস্থায় আমার কি মনে হ'ল।

এরকম প্রায়ই হয়। কেউই তো দিদিমনির কথা শোনে না। সুতরাং এমনই চলবে

হেডমিস্ট্রেসের কাছে অতীন ও রবি বা অন্য যারা এমন করে তাদের নাম টুকে জানাতে হবে।

দিদিমনিদের বলতে হবে তাঁরা যেন রোজই লাইন করিয়ে দিয়ে নজর রাখেন যাতে গোলমাল না হয়।

আমরা নিজেরাই ক্লাসে ক্লাসে সকলে মিলে এই বিষয়ে আলোচনা করব যে ভদ্র আচরণ করলে সকলের পক্ষেই সুবিধে। গায়ের জোরে নিজের সুবিধে যে আদায় করে তার ব্যবহার অশোভন।

[৩]

নববর্ষের পরের দিন মায়ের সঙ্গে বণ্ডেল রোডের কাছে এক বাড়ীতে গেছি। ও বাড়ীর মাসীর ছোট মেয়ে শুচি আমার সঙ্গে পড়ে। মা আর মাসী যখন গল্প করতে ব্যস্ত আমি আর শুচি ওপাশে জানলার গ্রীলে মুখ লাগিয়ে বাইরের দিকে মুখ ক'রে অনেক কথা বলতে লাগলাম। এই ফ্ল্যাটের উল্টো দিকের দুতলার বারান্দায় প্রায় মাসীর মতো একজন দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়াচ্ছিলেন। শুচি বলল যে ওঁর নাম রিঙ্কি ভাটা, ফ্লোরিডাতে থাকেন. দেশে বেড়াতে এসেছেন। আমাদের বাড়ীতেও একদিন এসেছিলেন। আমাকে খুব সুন্দর একটা খামে গুঁড়ো গুঁড়ো কি খেতে দিলেন। মুখে দিলে পুট পুট ক'রে ফাটে।

ভয় ভয় করে আবার মজাও লাগে। আমাকে উনি আন্টি ব'লে ডাকতে বললেন। রিঙ্কি আন্টি বললেন আমাদের কলকাতার লোকগুলো অসভ্য নোংরা। ওদের ফ্লোরিডার রাস্তা ঘাট কত পরিষ্কার। সব মানুষ সভ্য।

আমি আর শুচি যখন এই গল্প করছি তখন একটা চুলের গোলা এসে মুখে লাগল। বুঝলাম রিঙ্কি আন্টি চুল ছাড়িয়ে যাবার সময় হুতলা থেকে থুতু মাখিয়ে ফেলে গেছেন। শুচি বলে ফেলল রিঙ্কি আন্টি লেকচার দেন কিন্তু কাজে তো আমাদের চেয়েও নোংরা। তাতে আমার মনে হ'ল কোন কথাটা :

আমার মা যেমন ব'লে দিয়েছেন নোংরা একটা জায়গায় রেখে ঠিকমতো জায়গায় ফেলতে হবে, এ অভ্যাস সবার করা উচিত।

বিদেশের গর্ব করলেই পরিচ্ছন্নতার অভ্যাস হয়না।

শুচির উচিত চুল শুদ্ধ আন্টিকে দেখিয়ে আসা তাঁর কাজে আর আর লেকচারে কত তফাৎ।

এই ঘটনাটা ক্লাসে সবাইকে লিখে জানানো, যেন তারা অন্যকে আবার দেয়। যাতে সকলে ঠিক করে তাদের বাড়ী থেকে এভাবে নোংরা যেন ফেলা না হয়।

[ক্রমশঃ]

"The state of our physical environment indicates how moral we are"

জানবার কথা

॥ অজ্ঞাতকের শতবার্ষিকী ॥

'অজ্ঞাতকের শতবার্ষিকী' কথাটা একটু অদ্ভুত শোনায়, কারণ—কোনদিনই যে জন্মগ্রহণ করেনি, তার আবার শতবার্ষিকী পালন কি ক'রে সম্ভব ? কিন্তু বাস্তবে তাই ঘটেছে এবং এই ঘটনা ঘটানোর জন্য সম্পূর্ণ কৃতিত্বের দাবীদার হলেন স্যার আর্থার কোনান্ ডয়েল, যিনি সৃষ্টি ক'রেছিলেন এক অতুলনীয় জীবন্ত ডিটেক্‌টিভ্ চরিত্র (বাংলায় গোয়েন্দা বললে যেন কিছুটা খেলো শোনায়)—শার্লক হোম্‌স্।

খুব কম লেখকের কলম থেকেই এমন জীবন্ত চরিত্র বেরিয়ে আসে। শার্লক হোম্‌সের আবির্ভাব হয় ১৮৮৭ সালে 'এ স্টাডি ইন্ স্কারলেট' উপন্যাসে। যদিও উপন্যাসটি লেখা হয়েছিল ১৮৮৬ সালে, কিন্তু প্রকাশিত হয় পরের বছর। এরপর একের পর এক ছোট গল্প এবং উপন্যাস বের হতে থাকে এই অদ্বিতীয় ডিটেক্‌টিভ্ এবং তাঁর জুড়ি ডক্টর ওয়াট্‌সন্‌কে নিয়ে। স্যার আর্থার শার্লক হোম্‌স্‌কে নিয়ে ৫৬টি ছোট গল্প এবং ৪টি উপন্যাস লিখেছিলেন। শেষ গল্পটি লেখেন ১৯১৪ সালে, ১ম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হবার আগের দিন। এক দুর্দান্ত জার্মান গুপ্তচরকে হাতে-নাতে ধ'রে ফেলার ব্যাপার নিয়ে 'হিজ লাস্ট বাউ' নামে শেষ গল্পটি বের হয় ১৯১৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে। শার্লক হোম্‌স্ শুধুমাত্র ইংরাজী সাহিত্যেরই সম্পদ ন'ন, বহু ভাষায় বহুবার অনূদিত হয়ে তিনি অন্যান্য দেশের সাহিত্যেও নিজের স্থান তৈরী ক'রে নিয়েছেন। শার্লক হোম্‌সের গল্প ও উপন্যাস নাটক এবং ফিল্মে রূপায়িত হয়েছে অসংখ্যবার অসংখ্যভাবে। হোম্‌স্‌কে নিয়ে তৈরী হয়েছে নানান্ রসিকতা ও কার্টুন। হোম্‌স্ অনুরাগীদের সংখ্যা এবং প্রতাপ ক্রমশঃ এমন প্রচণ্ড আকার ধারণ করে যে তার সামনে কোনান্ ডয়েলকেও নতি স্বীকার করতে হয়। তাই একসময় হোম্‌স্ কাহিনী লেখায় তাঁর বিরাগ দেখা দেয় যার ফলস্বরূপ তিনি শার্লক হোম্‌সের উপসংহার টানেন 'দ্য ফাইনাল প্রব্‌লেম্' গল্পে—রাইকেন্‌বাক্ ফলসে হোম্‌স্ এবং তাঁর চিরশত্রু প্রোফেসর মরিয়ার্টির জীবন মরণ সংগ্রামে দুজনেরই

রহস্যঘন মৃত্যু ঘটে। কিন্তু এর ফল হয় সম্পূর্ণ বিপরীত। অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে ইংরাজ পাঠকেরা। পাঠক এবং প্রকাশকদের কাছ থেকে সাংঘাতিক চাপ আসতে থাকে স্যার আর্থারের ওপর। গত্যন্তর না দেখে পুনর্জীবিত ক'রলেন তাঁর ডিটেক্‌টিভ্‌কে 'দ্য রিটার্ন অফ্‌ শার্লক হোম্‌স্‌' গল্পে।

কিন্তু সবথেকে আশ্চর্যের ব্যাপার হ'ল, আজও ইংল্যাণ্ড এবং আমেরিকাবাসীদের কাছে সাহিত্যের বাইরেও শার্লক হোম্‌স্‌ জীবিত রয়েছেন। তাদের দৃঢ় ধারণা যে, হোম্‌স্‌ এখনও লণ্ডনের ২২১বি, বেকার ষ্ট্রিটে—তাঁর নিজের বাড়ীতে পেশায় রত আছেন। তাই আজও ঐ ঠিকানায় সপ্তাহে গড়ে ৪০টা ক'রে চিঠি আসে বিভিন্ন সমস্যা দূর করার কাতর প্রার্থনা নিয়ে (কোন কোন ক্ষেত্রে একেবারে উপযুক্ত পারিশ্রমিক দানের প্রস্তাব জানিয়ে)। অ্যাবে ন্যাশানাল বিল্ডিং সোসাইটি থেকে হোম্‌সের সেক্রেটারী মারফৎ সব চিঠিরই একই উত্তর আসে।

উত্তরটা এইরকম —'আমরা দুঃখিত, শার্লক হোম্‌স্‌ এখন তাঁর পেশা থেকে অবসর নিয়ে সাসেক্সে মৌমাছি-চাষের নেশায় ব্যস্ত। আপনার চিঠির জন্য ধন্যবাদ।' এর থেকে প্রমাণিত হয় শার্লক হোম্‌স্‌ এখনও সাধারণ মানুষের কাছে কত জনপ্রিয়, তাদের জ্ঞানে, বিশ্বাসে, ভালোবাসায় কত জীবন্ত। বিশ্বসাহিত্য আজ পর্যন্ত কোন লেখকের লেখনী দিয়ে এই রকম জীবন্ত চরিত্র সৃষ্টি হয়নি।

স্যার আর্থার কোনান্‌ ডয়েলের অসাধারণ প্রতিভাদীপ্ত লেখনীর-দ্বারা সৃষ্ট ডিটেক্‌টিভ্‌ শার্লক হোম্‌স্‌ অমরত্ব লাভ করলেন। সৃষ্টি স্রষ্টাকে ছাপিয়ে তৈরী ক'রে গেল এক অতুলনীয়—অত্যুজ্জ্বল ইতিহাস।

নিয়মাবলী

লেখক–লেখিকাদের জন্য ঃ মূল্যবোধ ও পরিবেশ বা আজকের দিনের কোন সমস্যা নিয়ে আপনার গল্প বা প্রবন্ধ ছাপতে আমরা আগ্রহী।

লেখা কাগজের একদিকে বাঁদিকে অন্ততঃ এক ইঞ্চি ছেড়ে স্পষ্ট-ভাবে লিখবেন। লেখার নকল রেখে পাঠাবেন।

উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে যথাযথভাবে উদ্ধৃতি চিহ্ন থাকা প্রয়োজন। যে বই থেকে নেওয়া হয়েছে তার নাম, গ্রন্থকারের নাম, প্রকাশকের নাম ঠিকানা, প্রকাশন বর্ষ, সংস্করণ সংখ্যা ইত্যাদির নির্ভুল উল্লেখ আবশ্যক।

অমনোনীত লেখা ফেরত পেতে হ'লে রেজিষ্ট্রী ডাকের উপযুক্ত ডাকটিকিট পাঠাতে হবে।

চিঠির উত্তরের জন্য ষাট পয়সার স্ট্যাম্প বা ঠিকানা সম্বলিত খাম / ইনল্যাণ্ড / পোস্টকার্ড পাঠাতে হবে। লেখা বা চিঠি সংযুক্ত সম্পাদক বা সম্পাদকের নামে পাঠাবেন।

গ্রাহকদের জন্য ঃ জানুয়ারী মাস থেকে বছর আরম্ভ। বছরের প্রথম সংখ্যা থেকে এক বছরের জন্য গ্রাহক হওয়া যায়। বছরের যে কোন সময় বার্ষিক চাঁদা গৃহীত হলেও গ্রাহক করা হবে জানুয়ারী মাস থেকে। বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা সডাক ১৫·০০ টাকা। ভারতের বাইরে $ ১০।

পরের মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে পত্রিকা না পেলে অবিলম্বে কার্যালয়ে জানালে পুনরায় ঐ সংখ্যা দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু পরবর্তী মাসের মধ্যে না জানালে পত্রিকা প্রাপ্তির নিশ্চয়তা থাকবে না।

রোদসীর চাঁদা মনিঅর্ডারে পাঠালে কুপনে পুরো নাম, ঠিকানা পরিষ্কার ক'রে লেখা প্রয়োজন। মনিঅর্ডার বা পোস্টাল অর্ডারে টাকা পাঠানো যাবে। পোস্টাল অর্ডার বিবেকানন্দ নিধিকে দেয়। **মনিঅর্ডার পাঠানোর ঠিকানা ঃ** ১৪৯, ১ই রাসবিহারী অ্যাভিনিউ, কলকাতা-৭০০০২৯। সরাসরি টাকা দিতে গেলে এই ঠিকানা ছাড়াও বিবেকানন্দ নিধি, ৯৯, কড়েয়া রোড, কলকাতা-১৯ ঠিকানায় যে কোন কাজের দিন বিকেল পাঁচটা থেকে সাড়ে সাতটার মধ্যে দেওয়া যাবে।

ঠিকানার পরিবর্তন হলে অন্ততঃ একমাস আগে জানাতে হবে।

Postal Regn No. WB/SC223
৫ম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, জুন ১৯৮৭ Regn No. RN-41095/83

মানুষের একটা দিক আছে যেখানে বিষয়বুদ্ধি নিয়ে সে আপনার সিদ্ধি খোঁজে। সেইখানে আপন ব্যক্তিগত জীবযাত্রা নির্বাহে তার জ্ঞান, তার মন, তার রচনাশক্তি একান্ত ব্যাপৃত। সেখানে সে জীবরূপে বাঁচতে চায়।

কিন্তু, মানুষের আর একটা দিক আছে যা এই ব্যক্তিগত বৈষয়িকতার বাইরে। সেখানে জীবনযাত্রার আদর্শে যাকে বলি ক্ষতি তাই লাভ, যাকে বলি মৃত্যু, সেই অমরতা। সেখানে জ্ঞান উপস্থিত প্রয়োজনের সীমা পেরিয়ে যায়; কর্ম স্বার্থের প্রবর্তনাকে অস্বীকার করে। সেখানে আপন স্বতন্ত্র জীবনের চেয়ে যে বড়ো জীবন সেই জীবনে মানুষ বাঁচতে চায়।

-- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সম্পাদনা, প্রকাশনা ও মুদ্রণ : স্বামী যুক্তানন্দ। সংযুক্ত সম্পাদক — লিপিকা গাঙ্গুলী। সহকারী—ছন্দা বাগচী।
বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা ১৫ টাকা। প্রতি কপি ১ টাকা ৫০ পয়সা।
বিবেকানন্দ নিধি, ৮৬এফ, মনোহরপুকুর রোড, কলিকাতা-২৯ এবং ৯৯, কড়েয়া রোড, কলিকাতা-১৯, টেলিফোন ৪৪-৪৮১৩,
পাপাই প্রিন্টার্স ২৩৭, এন এস সি বোস রোড, কলিকাতা-৪৭ হইতে মুদ্রিত।

রোজধী

৫ম বর্ষ ।। ৭ম সংখ্যা ।। জুলাই ১৯৮৭

জগতে সমুদয় ধনরাশির চেয়ে 'মানুষ' হচ্ছে বেশী মূল্যবান

—স্বামী বিবেকানন্দ

বিবেকানন্দ নিধি ও ইনষ্টিট্যুট অফ ভ্যালু ওরিয়েণ্টেশন অ্যাণ্ড
এনভায়রনমেণ্টাল এডুকেশন-এর মাসিক মুখপত্র

সূচীপত্র

বিজ্ঞান ও মূল্যবোধ		৯৭
আমাদের জীবনে মূল্যবোধ		৯৮
পরিবর্তন	শ্রীস্বপন বসু	১০৪
মূল্যবোধ ও আমরা		১০৫
নিধির খবর		১০৬
ছোটদের বিভাগ :		
বিজ্ঞান		১০৯
তুমি কি করবে ?	—স্বামী যুক্তানন্দ	১১০
জানবার কথা		
তাল নিয়ে	—শ্রীপ্রীতি ভূষণ চাকী	১১২

রোদসী
৫ম বর্ষ ।। ৭ম সংখ্যা ।। জুলাই ১৯৮৭

বিজ্ঞান ও মূল্যবোধ

[৬]

সময়ের সঙ্গে মানুষের জাগতিক প্রগতি হয়। সেই সঙ্গে পরিবর্তিত হয় কিছু মূল্যবোধ। আগের যুগ ছিল 'পর্যাপ্তর' যুগ। পৃথিবীর সম্পদ ছিল অফুরন্ত। মানুষের জীবনের প্রতিটি স্তরে এই পর্যাপ্ততার চিহ্ন দেখা যেত। বসবাস করবার জন্য তৈরী হত বিরাট বাড়ী। সেই বাড়ী ঘিরে থাকত উদ্যান। উদ্যান রুচির পরিচায়ক। সেই সঙ্গে উদ্যানের 'পরিখা' দুটো পাশাপাশি বাড়ীর মধ্যে দূরত্ব রচনা করত। মানুষ প্রয়োজন মতো অনেক কিছুই গোপন রাখতে পারত। খাদ্যদ্রব্যও ছিল পর্যাপ্ত। রেশনিং কথাটা তখনও কাজে লাগানো হয় নি। প্রাকৃতিক তেলের অভাব হবে এ কথা ঐ যুগের সাধারণ মানুষ ভাবেই নি। সম্পদ ছিল অপরিমিত, সম্পদের ব্যবহারও ছিল লাগামছাড়া।

যুগ পাল্টে গেল। একই মাপের জমিতে বেশী মানুষ থাকতে শুরু করল। সম্পদে পড়ল টান। পরিমিতি বোধ এল মানুষের নতুন মূল্যবোধ রূপে। যা আছে তা এখনই খরচ করলে চলবে না, ভবিষ্যতের জন্য রাখতে হবে। প্রাসাদ তৈরীর জায়গা নেই, বাড়ী ছোট হবে। হয়ত একটা বাড়ী একার জন্য ব্যবহার করতে পারা যাবে না—অনেকে মিলে ব্যবহার করতে হবে। বিজ্ঞান ব্যবস্থা করেছে ঘর ঠাণ্ডা করবার, বিশোধিত বাতাস ছোট ঘরে পরিচালন করবার। ফলে অল্প জায়গাতে অনেকে থাকতে পারছেন, কাজ করতে পারছেন। সম্পদ যা রয়েছে তা নষ্ট করা যাবে না—যতটা সম্ভব বেশী ব্যবহার করতে হবে। প্রাকৃতিক শক্তি কমে যাচ্ছে। বিজ্ঞান আবিষ্কার করল 'রিনিউএব্‌ল এনার্জি'। আবর্জনাও আর আবর্জনা নয়—আবর্জনা থেকে তৈরী হচ্ছে শক্তি, যা অনেক কাজে লাগছে। একবাড়ীতে অনেকে থাকলে অনেক বিষয়ে গোপনীয়তা রক্ষা করা যায় না। তাই

আমাদের জীবনে মূল্যবোধ

[বিবেকানন্দ নিধিতে ডঃ এস কে চক্রবর্তী পরিচালিত
গবেষণার প্রাথমিক কাজের প্রতিবেদন]

বর্তমান সমাজে মূল্যবোধ প্রতিবিন্যাস নিয়ে বিবেকানন্দ নিধির পক্ষ থেকে গবেষণার কাজ শুরু হয়েছিল কলকাতাবাসীদের নিয়ে একটি ছোট অনুসন্ধানমূলক কাজের মাধ্যমে। আমাদের সামাজিক জীবনে প্রতিমুহূর্তেই নানান প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়। গবেষণার প্রথম ধাপ ছিল কিছু প্রশ্ন চিহ্নিত করে একটি প্রশ্নাবলী তৈরী করা। প্রাথমিক এই প্রশ্নাবলীটিতে ছিল শিক্ষা, বিবাহ, গার্হস্থ্য জীবন, সামাজিক আদান-প্রদান এবং কিছু সাধারণ বিষয়ের ওপর ত্রিশটি প্রশ্ন।

প্রধানতঃ খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে আগ্রহী হয়ে বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত এবং বিভিন্ন শিক্ষাগত যোগ্যতা সম্পন্ন অনেকেই এই প্রশ্নাবলী পূর্ণ করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে ১১৮ জনের (৪৯ জন পুরুষ, ৬৯ জন মহিলা) বক্তব্যের ভিত্তিতে গবেষণার প্রাথমিক কাজ শুরু হয়। ত্রিশটি প্রশ্নকে সমান ছটি ভাগে ভাগ করে প্রাপ্ত উত্তরগুলি সমীক্ষা করা হয়। প্রথম ১৫টি প্রশ্নের উত্তর একেবারেই কাম্য নয় (Highly Undesirable), কাম্য নয় (Undesirable), অমীমাংসিত (Undecided), কাম্য (Desirable), দৃঢ়ভাবে কাম্য (Highly Desirable) এর মধ্যে বেছে নেওয়ার জন্য বলা হয় এবং একেবারেই একমত নই (Strongly Disagree), একমত নই (Disagree), অমীমাংসিত (Undecided), একমত (Agree) ও দৃঢ়ভাবে একমত (Strongly Agree) এর মধ্যে থেকে পরের ১৫টি প্রশ্নের উত্তর বেছে নেবার কথা প্রশ্নাবলীতে ছিল।

['বিজ্ঞান ও মূল্যবোধ' এর শেষাংশ]

'প্রাইভেসি'কে মানুষ অন্য ভাবে দেখতে শুরু করল। বর্তমান যুগে প্রাইভেসির শর্ত হল টেলিফোন 'বাগ্' করতে না দেওয়া। সময়ের সঙ্গে, বিজ্ঞানের প্রগতির সঙ্গে আমাদের মূল্যবোধ কত বদলে গেল।

প্রথম ১৫টি প্রশ্ন ছিল এইরকম :

১। ছাত্রদের রাজনীতিতে সক্রিয় অংশগ্রহণ।

২। ছাত্রজীবনে ব্রহ্মচর্য পালন করা।

৩। স্কুল কলেজে আধ্যাত্মিক শিক্ষা।

৪। সাধারণ শিক্ষার বদলে বৃত্তিমূলক শিক্ষা।

৫। সহশিক্ষা।

৬। আয়োজিত বিবাহ।

৭। ছেলেমেয়েদের স্বইচ্ছায় জীবনসঙ্গী/সঙ্গিনী বেছে নেবার স্বাধীনতা দেওয়া।

৮। স্বামী/স্ত্রী/জামাই পুত্রবধূর এমন কাজে নিযুক্ত থাকা যা বহু সময় দাবী করে।

৯। রেজিষ্ট্রী বিয়ের পরিবর্তে ধর্মীয় রীতি অনুসারে বিয়ে।

১০। ধনী সম্প্রদায়ের সঙ্গে নিজেকে তুলনা করা।

১১। বিবাহপূর্ব বা বিবাহোত্তর অন্যের সঙ্গে সম্পর্ক।

১২। নিজের ইচ্ছা বা প্রয়োজনের ওপর নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা।

১৩। কর্মফল সম্বন্ধে নিস্পৃহ থাকা।

১৪। সুবিধা পেলে বিদেশে স্থায়ীভাবে বসবাস করা।

১৫। দুর্গতদের দান করা।

প্রশ্নগুলির প্রাপ্ত উত্তর পর্যালোচনার ফল নীচে দেওয়া হল :

ছাত্রদের রাজনীতিতে সক্রিয় অংশগ্রহণ, নিজের অবস্থা ধনীদের সঙ্গে তুলনা করা এবং বিবাহপূর্ব বা বিবাহোত্তর অন্যের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন এই কটি বিষয় উত্তরদাতারা সাধারণভাবে কাম্য নয় বা একেবারেই কাম্য নয় বলে মনে করেছেন। অপরপক্ষে ছাত্রজীবনে ব্রহ্মচর্য পালন ও স্কুল কলেজে আধ্যাত্মিক শিক্ষা কাম্য অথবা দৃঢ়ভাবে কাম্য বলেছেন। এই দুই ধরণের প্রশ্নের উত্তর যথেষ্ট সঙ্গতিপূর্ণ।

কিছু প্রশ্নের উত্তরে আবার অসঙ্গতিও দেখা গেছে। ছেলেমেয়েদের জীবনসঙ্গী সঙ্গিনী বেছে নেবার প্রশ্নের সাধারণ উত্তর কাম্য আবার আয়োজিত বিবাহের প্রশ্নের উত্তর কাম্য বা অমীমাংসিতর মধ্যে পাওয়া গেছে। হয়তো ভাবী স্বামী বা স্ত্রী খোঁজার জন্য আরো বেশী

ক্ষমতার অধিকারী হবার কথাই উত্তরদাতারা প্রকাশ করেছেন। বিয়েকে এখন আর ততটা সামাজিক ধারা বলে মনে করা হয়না, মনে করা হয় ব্যক্তিগত। এই প্রজন্মের অধিবাসীরা বিয়ের সঙ্গে ধর্মের যোগাযোগও মানতে চাননা। এই সিদ্ধান্তও আর একটি প্রশ্নে প্রাপ্ত উত্তর থেকে করা যায়, কেননা রেজিষ্ট্রী বিয়ে না ধর্মীয় রীতি অনুসারে, এ প্রশ্নে রেজিষ্ট্রী বিয়েকেই বেশীরভাগ কাম্য মনে করেছেন। বাকীদের এবিষয়ে কোন মত নেই। স্কুল কলেজে সহশিক্ষা প্রচলন যোগদানকারীদের কাছে কাম্য বলে মনে হয়েছে, যদিও এর আগে ছাত্রজীবনে ব্রহ্মচর্য পালনকেও তাঁরা কাম্য বলেছেন। আমাদের শাস্ত্রে ছেলেমেয়েদের মেলামেশাকে ব্রহ্মচর্য বিরুদ্ধ বলা হয় এই ধারণার সঙ্গে হয়তো উত্তরদাতারা পরিচিত নন। নিজের ইচ্ছা ও প্রয়োজনের ওপর নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতাও কাম্য বলে মনে হয়েছে।

অমীমাংসিত থেকে গেছে বিদেশে স্থায়ীভাবে বসবাস করার প্রশ্ন। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য উত্তরদাতাদের মধ্যে দুই এক জন ছাড়া কেউ কখনও বিদেশে যাননি। ফলের আকাঙ্খা ছাড়া কাজ করা, এই বিষয়টি বোধহয় অনেকেই উপলব্ধি করতে পারেননি তাই এই বিষয়টিও অমীমাংসিত থেকে গেছে। দুর্গতদের দান করার বিষয়ে সবাই একমত, প্রত্যেকেরই একে কাম্য মনে হয়েছে।

উত্তর যথেষ্ট ওঠানামা করেছে বহু সময় লাগে এমন চাকরী করা উচিত কিনা সেবিষয়ে। মনে হয় উত্তরদাতারা প্রচুর আয় ফলতঃ অনেক জিনিস কেনার ক্ষমতা এবং সামাজিক জীবন ধ্বংস হয়ে যাওয়া নিয়ে দ্বিধায় ছিলেন।

আজকের যুগের অর্থনীতি এবং ক্রমবর্ধমান বেকার সমস্যায় সকলেই চিন্তিত। এই চিন্তা প্রকাশ পেয়েছে সাধারণ শিক্ষার তুলনায় বৃত্তিমূলক শিক্ষা কাম্য এই কথায়। কিন্তু এক্ষেত্রে সামগ্রিক শিক্ষা যে মানুষকে অনেক বেশী মূল্যবোধ অভিমুখী করে তুলতে পারে একথা ভুলে থাকা হয়েছে। দক্ষতা অর্জনই জীবনের শেষ কথা নয়। দক্ষতা জৈবিক উন্নতি ঘটাতে পারে কিন্তু জীবনের পরম লক্ষ্যে পৌছবার জন্য চাই শিক্ষা, একথা বিস্মৃত হলে চলবেনা। আবার স্কুলে কলেজে

আধ্যাত্মিক শিক্ষাও কাম্য। এই উত্তর এর আগের উত্তরের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ। সুতরাং এই সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে যে বৃত্তিমূলক শিক্ষার কথা তার ব্যবহারিক প্রয়োজনের কথা ভেবে বলা হচ্ছে এবং সেইসঙ্গে মূল্যবোধ সংক্রান্ত আধ্যাত্মিক শিক্ষাকেও কেউ অস্বীকার করছেন না। উত্তরদাতারা শিক্ষা ও শিক্ষণের সংহত দৃষ্টিভঙ্গী পছন্দ করছেন।

এবারে আমরা বাকী ১৫টি প্রশ্নের উত্তর পর্যালোচনা করতে পারি। এই প্রশ্নগুলি ছিল :

১। একজন ভালো শিক্ষক প্রথমেই হবেন একজন আদর্শ মানুষ।

২। বিয়ের ব্যাপারে জাতবিচার।

৩। একজনের অধিকারই অন্য আর একজনের কর্তব্য।

৪। একক পরিবারের ছেলেমেয়েরা বেশী আত্মকেন্দ্রিক।

৫। সৎ এবং নীতিপরায়ণ ব্যবহারের অভাবের জন্য দায়ী সামাজিক পরিবেশ।

৬। ব্যক্তির আন্তর্সত্তার অবিনশ্বরত্ব ও আনন্দময়তা বোধই হল ধর্মানুভূতি।

৭। আজ্ঞানুবর্তিতা স্বাধীনতার বিপরীত কথা।

৮। মানসিক স্বাস্থ্যের পক্ষে প্রার্থনা উপকারী।

৯। যান্ত্রিক অগ্রগতিই শান্তি ও সুখ আনবে।

১০। ভারতীয় সংস্কৃতি ঐহিক ও পারমার্থিকের সুষ্ঠু সমন্বয়।

১১। প্রাচুর্যই ক্রমবর্ধমান দুর্নীতির কারণ।

১২। জন্মনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা শারীরিক সম্পর্কের নিয়ন্ত্রণ ভেঙে দিচ্ছে।

১৩। উচ্চশিক্ষিতা মা ও স্ত্রীদেরও আদর্শ গৃহ গড়ে তোলার দিকেই মন দেওয়া উচিত।

১৪। একবিংশ শতাব্দীর শিক্ষা হওয়া উচিত দক্ষতা এবং প্রযুক্তি শিক্ষার বদলে মূল্যবোধের ধারা শিক্ষা।

১৫। দূরদৃষ্টিহীন পর্যটন শিল্প যেন আমাদের ঐতিহ্যমণ্ডিত তীর্থস্থান এবং নির্জন জায়গা গুলিকে দখল না করে।

প্রশ্নগুলি পর্যালোচনা করে দেখা গেছে বিয়ের ব্যাপারে জাতবিচার এবং আজ্ঞানুবর্তিতা স্বাধীনতার বিপরীত এই দুই প্রশ্নের সঙ্গে উত্তরদাতারা একমত নন। দ্বিতীয় প্রশ্নটির উত্তর একথাই ইঙ্গিত করে

যে সচেতন ভাবে শিক্ষাদানের মাধ্যমে শিশু এবং তরুণ তরুণীদের মনে আজ্ঞানুবর্তিতা, আত্মসম্মানজ্ঞান ও স্বাধীনতা এই তিনটি বিষয়ের সুষ্ঠু সমন্বয় প্রয়োজন এই চেতনা ও বিশ্বাসের উদ্ভব দরকার একথা উত্তর-দাতারা স্বীকার করেন। এই পর্যায়ে বিয়ের ক্ষেত্রে জাতবিচারের প্রশ্নে একমত না হওয়ার সঙ্গে এর আগের পর্যায়ের নিজের খুশী মতো বিয়ে করা কাম্য এই উত্তরের মিল আছে।

১৩ নম্বর প্রশ্নের উত্তর আজকের নারী স্বাধীনতার আন্দোলনের যুগে বিস্ময়কর। উত্তরদাতারা মনে করেন উচ্চশিক্ষিতা মা ও স্ত্রীদেরও সুষ্ঠু গৃহ পরিচালনার দিকেই নজর রাখা উচিত। উল্লেখযোগ্য উত্তর-দাতাদের শতকরা ষাটভাগই মহিলা।

শিক্ষক হবেন প্রথমে একজন আদর্শ মানুষ এই প্রশ্নের সঙ্গে সকলেই দৃঢ়ভাবে একমত। এর থেকে বোঝা যায় সবাই বিশ্বাস করেন মূল্যবোধ সঞ্চারিত করা কোন ধরাবাঁধা শিক্ষার মাধ্যমে সম্ভব নয় এর জন্য সামনে একজন আদর্শ থাকা প্রয়োজন।

যান্ত্রিক অগ্রগতি শান্তি ও সুখ আনবে এ বিষয়ে কোন মতামত পাওয়া যায়নি। অর্থাৎ বোঝা যায় এ বিষয়ে সকলের যথেষ্ট সন্দেহ আছে। আবার সামাজিক পরিবেশই ক্রমবর্ধমান দুর্নীতির কারণ এ প্রশ্নে উত্তরদাতারা একমত।

এই পর্যায়েও একটি প্রশ্ন উত্তরদাতাদের অনেকেরই বোধহয় বোধগম্য হয়নি তাই অমীমাংসিত থেকে গেছে। প্রশ্নটি হচ্ছে একজনের অধিকার অপরের কর্তব্য। এই প্রশ্নটি ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। একজন ব্যাঙ্ককর্মী যদি ঠিকভাবে তাঁর কর্তব্য পালন না করেন তাহলে যে কাজ আর একজনের ব্যাঙ্কের থেকে পাবার অধিকার তা-ঠিকভাবে পাবেননা। সুতরাং একজন ঠিকভাবে কর্তব্য করলেই অপরের অধিকার পূর্ণ হবে।

উত্তরদাতারা মনে করেন ছোট পরিবারের ছেলেমেয়েরা যৌথ পরিবারে বেড়ে ওঠা ছেলেমেয়েদের থেকে বেশী আত্মকেন্দ্রিক হয়। অবশ্য পরিবার ছোট হবার এই ঝোঁক আমরা বদলাতে পারবনা তাহলে যেভাবে আজকের শিশুদের বড় করা হচ্ছে তার পদ্ধতিটা বদলাবার

চেষ্টা করা যেতে পারে।

ভারতীয় সংস্কৃতি ঐহিক ও পারমার্থিকের সুষ্ঠু সমন্বয়, প্রাচুর্যই দুর্নীতির মূল কারণ এই দুই প্রশ্নেও বেশীরভাগই একমত।

১২ নম্বর প্রশ্নটি অমীমাংসিত থাকার কারণ যতদূর সম্ভব বোধগম্য না হওয়া।

আমাদের দেশের ঐতিহ্যমণ্ডিত তীর্থস্থানগুলি যেন পর্যটন শিল্পের দখলে না চলে আসে এ বিষয়ে কোন মত না থাকা ইঙ্গিত করে আজকের যুগের অধিবাসীরা নির্জনতা ইত্যাদির মূল্য বিস্মৃত হচ্ছেন। হিমালয়ের নির্জন স্থান বা শান্ত সমুদ্রসৈকতকে পর্যটকদের জন্য আকর্ষনীয় করে তোলার চেষ্টা এইসব জায়গার মানসিক স্বাস্থ্যোদ্ধারের যে ক্ষমতা ছিল তা নষ্ট করে দিচ্ছে।

প্রশ্নোত্তর ছাড়াও আমাদের প্রশ্নাবলীতে আর একটি অংশ ছিল 'কি হতে চান বা পছন্দ করেন'। কি কি হবার কথা দেওয়া ছিল এবং সেইসঙ্গে কজন কি হতে চেয়েছেন পাশে দেওয়া হল। নজন এই প্রশ্নের উত্তর দেননি।

অভিনেতা (×), পরিচালক (৪), মল্লবীর (×), ডাক্তার (৯), ইঞ্জিনীয়ার (৭), কার্য নির্বাহক (২), ভ্রমণকারী (১১), গুরু (৩), শিল্পপতি (২), আবিষ্কারক (১), আইনজীবি (×), সাহিত্যিক (৭), সঙ্গীতশিল্পী (৬), শিল্পী, (৪), রাজনৈতিক নেতা (২), সন্ন্যাসী (৮), বৈজ্ঞানিক (৭), সমাজসেবী (১০), খেলোয়াড় (৪), শিক্ষক/অধ্যাপক (২০), সাংবাদিক (১), দার্শনিক (১)। সবথেকে বেশী হতে চেয়েছেন শিক্ষক/অধ্যাপক এবং ভ্রমণকারী যা ইঙ্গিত করে উত্তরদাতারা এখনও শুধুমাত্র অর্থ উপার্জন এবং কেরিয়ারকেই জীবনে সর্বস্ব বলে মনে করেন না।

আমাদের উত্তরদাতাদের মধ্যে মূল্যবোধ সংক্রান্ত ধারণায় যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে একথা পরিষ্কার বোঝা যায়। তবে এই উত্তরের ভিত্তিতে সাধারণীকরণ সম্ভব নয় কেননা এঁরা ছিলেন শুধুমাত্র কলকাতার অধিবাসী এবং মূলতঃ বাঙালী। এর পরের পর্যায়ে ভারতের বিভিন্ন স্থানের ম্যানেজার ও অ্যাডমিনিস্ট্রেটরদের নিয়ে গবেষণার কাজে জাতীয় ধারা খুঁজে পাওয়া যেতে পারে।

পরিবর্তন

শ্রীস্বপন বসু

পরিবর্তন জীবনের অন্যতম লক্ষণ, জীবজগত নিয়তই পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে চলছে। বৈজ্ঞানিক ডারউইন অবশ্য পরিবর্তনের বদলে বিবর্তন কথাটি ব্যবহার করেছেন। কিন্তু আমার ধারণায় পরিবর্তন ও বিবর্তনের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই, এরা যমজ।

পরিবর্তনের মধ্য দিয়েই মানুষের অগ্রগতির রথ চলছে। প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে আজকের এই বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত কত পরিবর্তনই না এসেছে। কত ধ্যান ধারণা, ভালোমন্দ বদলে গেছে, নীরস জিনিস রসসিক্ত হয়ে উঠেছে।

মানুষের জীবন শৈশব, কৈশোরযৌবন বার্ধক্য পেরিয়ে নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়। এরই মধ্যে তার আর্থিক পরিবর্তনও ঘটে। আর্থিক সঙ্গতিহীন সঙ্গতি পায়। অসচ্ছল অবস্থা থেকে সে সচ্ছল কিংবা তদোপরি অবস্থায় আসে। উল্টোটাও ঘটে কারো কারো জীবনে। এই আর্থিক পরিবর্তন মানুষের ব্যবহারে প্রতিফলিত হয়। মানুষের ব্যবহারিক পরিবর্তনও ঘটে। কিন্তু মানসিক পরিবর্তন ঘটে কতখানি ?

শৈশবে যে স্নেহশীল, সংবেদনশীল প্রেমিক মনের অধিকারী হয় সে তার পরবর্তী জীবনে তা থেকে বিচ্যুত হয় কতখানি ? পারিপার্শ্বিক পরিবেশ মানুষকে অনেকাংশে চালনায় সাহায্য করে নিশ্চয়ই কিন্তু আমার মনে হয় শৈশব কৈশোর অবস্থার মধ্য দিয়ে যখন সে অতিক্রম বা অতিবাহিত করে তখন সে যদি কোন সদ্‌গুণকে সত্য বলে গ্রহণ করতে পারে তবে তা থেকে বিচ্যুত হওয়া কঠিন, বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তার বুদ্ধি বিবেচনা ও জ্ঞানের বিকাশ ঘটতে থাকে; সে তখন সত্যকে বিশ্লেষণ করতে থাকে, বিশ্লেষণ করে সে সত্য যখন এক উপলব্ধিতে পৌঁছায় তখন বাইরের কোন শক্তিই তাকে টলাতে পারে না। তখন বাহ্যিক পরিবর্তন সাধিত হলেও মূল সত্যের পরিবর্তন হয় না।

মূল্যবোধ ও আমরা

[Value Orientation এ প্রকাশিত 'Values & Ourselves' অনুসরণে]

—পূর্বপ্রকাশিতের পর—

ধর্ম (মত) নিরপেক্ষতা (Secularism) :

ব্যক্তিমানুষ ও সমাজের ব্যবহার এবং সামাজিক প্রক্রিয়ায় তাদের আচরণকে মূল্যবোধ হিসেবে গণতন্ত্র ও সমাজবাদ কিভাবে প্রভাবিত করে তা আমরা আলোচনা করেছি। এবার ধর্মমতনিরপেক্ষতার মূল্যবোধ সাধারণভাবে এবং বিশেষ করে ভারতীয় সংবিধানে যেভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে—তা বোঝার চেষ্টা করা যেতে পারে। ধর্মমতনিরপেক্ষতা কথাটির অন্তর্নিহিত মূল্যবোধ বুঝতে হলে বিশেষ মনোযোগের প্রয়োজন, কারণ ধর্মমতনিরপেক্ষতা কেবলমাত্র গুটিকয়েক লোককেই আচরণে প্রনোদিত করেনা পরন্তু মূল্যবোধ হিসেবে ধর্মমতনিরপেক্ষতা যে কোন সংস্কৃতিকে বা সমগ্র মানব সংস্কৃতিকেই মৌলিকভাবে নিয়ন্ত্রিত করতে পারে।

ধর্মমতনিরপেক্ষতা মানে পরিবর্তনে সাড়া দেবার ইচ্ছা বা ক্ষমতা। ধর্মমতনিরপেক্ষ শিক্ষা মানুষকে কুসংস্কার মুক্ত করতে পারে। নিজের পুরনো বিশ্বাস, আচরণ ও ব্যবহারকে পূত (Sacred) ভেবে মানুষ যদি তাকেই আঁকড়ে ধরে থাকে তাহলে বিকাশ অসম্ভব। 'পূত' কথাটি মূল্যবোধ হিসেবে 'ধর্মমতনিরপেক্ষতা'র ঠিক বিপরীত। ধর্মমতনিরপেক্ষতা মতাদর্শকে নমনীয় করে এবং বিভিন্নতাকে স্বীকৃতি দেয়। ধর্মমতনিরপেক্ষতার মূল্যবোধের ধারা সহজেই পরিব্যাপ্ত হয় তাই ধর্মমতনিরপেক্ষতা সমাজকে পরস্পর বিচ্ছিন্ন করে রাখেনা। ধর্মমতনিরপেক্ষতার অর্থ ধর্মবিরুদ্ধতা নয়। এর অর্থ যে শিক্ষা বা আদর্শ যুক্তিগ্রাহ্য নয় তা গ্রহণে বিরত থাকা।

ধর্মমতনিরপেক্ষতা ঐহিকতা এবং বস্তুবাদের ধারণার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। সামাজিক আন্দোলন হিসেবে ধর্মমতনিরপেক্ষতা মানুষকে পারত্রিক বা পারলৌকিক থেকে ঐহিক হতে নির্দেশ দেয় এবং জাগতিক গুণাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে মানুষকে সর্বোত্তম ও সর্বশেষ পরিণতি হিসেবে

[শেষাংশ ১০৭ পৃষ্ঠায়]

নিধির খবর

জুন মাসের ২ – ৪ তারিখ কয়েকজন অধ্যাপক, শিক্ষক ও তরুণ তরুণী বিবেকানন্দ নিধিতে তিনটি পর্যায়ে মনস্থিতি অভ্যাস করেন।

★

'কাউন্সিল অফ সায়েন্টিফিক অ্যাণ্ড ইণ্ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চ' (C S I R) ধানবাদের 'দি সেন্ট্রাল মাইনিং রিসার্চ স্টেশন'-এ একটি আলোচনাচক্র আয়োজন করেন। 'দূষণ মুক্তির ক্ষেত্রে মানবতার ভূমিকা' বিষয়ক এই আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হয় ৫ই জুন, বিশ্ব পরিবেশ দিবসে। স্বামী যুক্তানন্দ আলোচনাচক্রটি উদ্বোধন করেন।

★

বিশ্ব পরিবেশ দিবস উদযাপন উপলক্ষে আই টি সির আর্থিক সহায়তায় বিবেকানন্দ নিধি একটি আলোচনাচক্র আয়োজন করেন ৭ই জুন। আলোচনাচক্রের বিষয় ছিল 'গাছ আমাদের জীবন, সৌন্দর্যের জন্য গাছ।' বিড়লা শিল্প ও কারিগরী সংগ্রহশালায় অনুষ্ঠিত এই আলোচনাচক্রটি উদ্বোধন করেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পরিবেশ ও অরণ্য দফতরের মন্ত্রী ডঃ অম্বরীশ মুখার্জি। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের সভাপতি ছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহ উপাচার্য ডঃ ডি কে সিনহা।

সমগ্র অনুষ্ঠানটি তিনটি মূল অধিবেশনে ভাগ করা হয়েছিল যেগুলি পরিচালনা করেন ডঃ ডি কে সিনহা, বেনারস হিন্দু বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কলা বিভাগের ডীন এবং ইউ জি সি'র মাস্ কমিউনিকেশন সেন্টারের চেয়ারম্যান ডঃ অঞ্জন ব্যানার্জি এবং কানাডার সেণ্ট জনস মেমোরিয়াল ইউনিভার্সিটীর অধ্যাপিকা ও বিবেকানন্দ নিধির গবেষক কর্মী অধ্যাপিকা পূর্ণিমা সেন।

সর্বশেষ অধিবেশনে দীক্ষান্ত ভাষণ দেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ শঙ্করী প্রসাদ ব্যানার্জি। এই অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক অম্লান দত্ত। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রায় আশিজন এই আলোচনাচক্রে যোগ দেন।

★

শিক্ষকদের জন্য পরিবেশ শিক্ষা সম্পর্কে ইউনেসকো এবং বিবেকানন্দ নিধির উদ্যোগে ২০ এবং ২১ জুন, ১৯৮৭, আয়োজিত আলোচনাচক্রে ভাষণ দিচ্ছেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহ উপাচার্য ডঃ দিলীপ কুমার সিন্‌হা। স্বামী যুক্তানন্দ এবং ডঃ এ কে চ্যাটার্জী মঞ্চে উপবিষ্ট।

.....মানুষ গৃধ্নুভাবে প্রকৃতির দানকে গ্রহণ করেছে; প্রকৃতির সহজ দানে কুলোয়নি, তাই সে নির্মম ভাবে বনকে নির্মূল করেছে। তার ফলে আবার মরুভূমিকে ফিরিয়ে আনবার উদ্যোগ হয়েছে। ... লুব্ধ মানুষ অরণ্যকে ধ্বংস করে নিজেরই ক্ষতি ডেকে এনেছে; বায়ুকে নির্মল করবার ভার যে গাছপালার উপর, যার পত্র ঝরে গিয়ে ভূমিকে উর্বরতা দেয়, তাকেই সে নির্মূল করেছে। বিধাতার যা কিছু কল্যাণের দান, আপনার কল্যাণ বিস্মৃত হয়ে মানুষ তাকেই নষ্ট করেছে ... ...।

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ইউনেস্কোর আর্থিক অনুদানে এবং বিবেকানন্দ নিধির সহায়তায় ২০ ও ২১শে জুন বিবেকানন্দ নিধির ৯৯ কড়েয়া রোডের গবেষণা ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে অধ্যাপকদের জন্য পরিবেশ প্রশিক্ষণ বিষয়ক আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হয়।

*

২৬—২৮শে জুন বিবেকানন্দ নিধির গবেষণা ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে 'মূল্যবোধ প্রতিবিন্যাস ও মানবিক গুণাবলীর উন্নয়ন' বিষয়ক একটি শিক্ষাক্রম অনুষ্ঠিত হয়। এই শিক্ষাক্রমে যোগদানকারীরা ছিলেন মূলতঃ ট্রেন্ড্ নার্সেস অ্যাসোসিয়েশন অফ ইণ্ডিয়ার পশ্চিমবঙ্গ শাখার সদস্যা। শিক্ষাক্রম শেষে মোট ২৬ জন সার্টিফিকেট পান। ধানবাদের CMRS এর চারজন কর্মীও শিক্ষাক্রম গ্রহণ করেন।

*

২১শে জুন স্বামী মুক্তানন্দ T N A I আয়োজিত একটি অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেন। ঐ অনুষ্ঠান থেকে সংগৃহীত টাকা T N A I এর অবসর প্রাপ্ত সদস্যাদের জন্য বাড়ী তৈরীর কাজে ব্যবহৃত হবে।

['মূল্যবোধ ও আমরা' এর শেষাংশ]

স্বীকার করে 'মানবতাবাদ' বোধের বিবর্তনে সহায়তা করে। এই ধারণা মানুষের আত্মবিকাশের বিভিন্ন প্রচেষ্টা ও সাংস্কৃতিক অভীষ্ট সাধনের আগ্রহকে জোরদার করে। সুতরাং আভিধানিক অর্থে এবং সময়ের সঙ্গে মূল্যবোধের পরিবর্তনে ধর্মমতনিরপেক্ষতা অন্য একটি কর্মপ্রচেষ্টার দিকে সূক্ষ্মভাবে মূল্যবোধের সঞ্চার ঘটায়।

যদিও ধর্মমতনিরপেক্ষতা ধর্মমত বা বিশ্বাসকে স্বীকার করেনা তবুও তা নাস্তিকতার সঙ্গে সমার্থক নয়। ধর্মসম্পর্কীয় সামাজিক ধারণাগুলির পরিবর্তনের ফলে ধর্মমতনিরপেক্ষতা কথাটির অর্থও অনেক পরিবর্তিত হয়েছে। কালক্রমে ধর্মমতনিরপেক্ষতা সাধারণভাবে বিশ্বাসমুক্ত চিন্তাকে সূচিত করছে। ফলতঃ ধর্মমতনিরপেক্ষতা বলতে কোন বিশ্বাসের হানি বা লোপ বোঝায়। সুতরাং ধর্মমতনিরপেক্ষতা কোন প্রতিষ্ঠিত ধর্মবিশ্বাস মুক্ত সামাজিক ক্ষমতা বা নিয়ন্ত্রণ বোঝায়। শব্দটি খ্রীষ্টীয় সংস্কৃতির পরিপ্রেক্ষিতে আরো বেশী প্রাসঙ্গিক কেননা সমকালীন বিশ্বের শিক্ষাব্যবস্থা খ্রীষ্টীয় শিক্ষাব্যবস্থারই প্রসার। সামাজিক প্রেক্ষাপটে ধর্মমতনিরপেক্ষতার মূল্যবোধ এমনকি ভারতেও অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠেছে। [ক্রমশঃ]

বিজ্ঞান

স্বপ্নের প্রয়োজনীয়তা

স্বপ্ন বলতে আমরা বুঝি কিছু অলীক ঘটনা যার কোন বাস্তব মূল্য নেই। কিন্তু স্বপ্ন দেখার বাস্তব প্রয়োজনীয়তাকে বৈজ্ঞানিকরা অস্বীকার করতে পারছেন না। পরীক্ষায় দেখা গেছে যে মানুষকে যদি ক্রমাগত কয়েকদিন স্বপ্ন দেখতে দেওয়া না হয় তাহলে তার মেজাজে এবং আচরণে অনেক পরিবর্তন হয়। এঁরা একটুতেই ঘাবড়ে যান কেননা এঁদের স্নায়ু খুব দুর্বল হয়ে যায়। মেজাজ খিটখিটে হয়। আবার কয়েকদিন ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখলে এইসব অসুবিধে থাকেনা, দৈনন্দিন জীবন স্বাভাবিক হয়ে ওঠে।

আমরা সাধারণতঃ যতটা সময় ঘুমোই তার অনেকটাই স্বপ্ন দেখি। সব স্বপ্ন মনে থাকে না। বা কোন স্বপ্নই মনে থাকল না অথচ রাতে স্বপ্ন দেখা বাদ পড়ে নি। আমরা বেশীরভাগ স্বপ্নের দৃশ্য রঙ্গীনই দেখি। কিন্তু জেগে ওঠার পরে মনে হয় যেন সাদা কালোয় স্বপ্ন দেখেছি। স্বপ্ন দেখার স্মৃতি কমতে থাকার সঙ্গে সঙ্গে স্বপ্নের দৃশ্যের রঙ ও চলে যায়।

যে চোখে দেখতে পায় না সেও স্বপ্ন দেখে। জন্মান্ধরা স্বপ্নের ঘটনা শব্দ দিয়ে বুঝতে পারে। আর যাঁরা পরে অন্ধ হয়েছেন স্বপ্ন দেখার সময় তাঁদের চোখ নড়াচড়া করে যেমন দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন মানুষের চোখ স্বপ্ন দেখার সময় নড়ে।

আমাদের ঘুমের কয়েকটি পর্যায় আছে। অগভীর এবং গভীর ঘুম পর্যায়ক্রমে আসে। প্রত্যেক পর্যায়ের শেষে আমরা স্বপ্ন দেখি। রাত বেশী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে স্বপ্ন দেখার সময় বাড়তে থাকে। প্রথম রাতে আমরা খুব কম সময়ের জন্য স্বপ্ন দেখি কিন্তু ঘুম ভাঙার আগের স্বপ্ন প্রায় একঘণ্টা ধরেও দেখতে পারি।

তুমি কি করবে ?

স্বামী মুক্তানন্দ

—পূর্ব প্রকাশিতের পর—

[৪]

এবার পুজোয় আমাদের জামাকাপড় খুব সাধারণ হয়েছে। মার খুব অসুখ। তাই বাবা পুজোতে বেশী খরচ করতে পারেননি। তাতে দাদার খুব রাগ হয়েছে। ওর প্রেস্টিজে লেগেছে কেননা ওর বন্ধুরা খুব দামী পোষাক কিনেছে। দাদা রাগ করে একদিন তো বাড়ীতে খেলই না আর এত অশান্তি করতে শুরু করল যে বাবা ধার করে ওকে পাঁচশ টাকা দিলেন নতুন করে জামা প্যাণ্ট কেনবার জন্য। এতে আমার মনে হয়েছিল—

দাদা দামী জামা কাপড়ের জন্য চাপ সৃষ্টি করে ঠিক করেছিল।

দামী জামা কাপড়ে প্রেস্টিজ বাড়ে না।

বাড়ীতে অসুবিধের সময় দায়িত্ব সবারই নেওয়া উচিত।

চাপের কাছে বাবার নতিস্বীকার করে দাদাকে পাঁচশ টাকা দেওয়ায় চাপকেই প্রশ্রয় দেওয়া হয়েছে।

[৫]

সিদ্ধার্থকে দেখি বইয়ের পাতা উল্টোতে গেলে ও হাত জিভে লাগিয়ে ভিজিয়ে নেয়। ওকে জিজ্ঞেস করলে বলে পাতা খুব তাড়াতাড়ি উল্টনোর জন্য ও ঐ রকম করে। আর ও এটা শিখেছে বড়দের

[বিজ্ঞাসের শেষাংশ]

এই সব পরীক্ষা বৈজ্ঞানিকরা করেছেন যন্ত্রের সাহায্যে। একটা যন্ত্র আছে যেটা মাথার সঙ্গে লাগানো থাকে। মানুষ ঘুমোচ্ছে কিনা অথবা সেই ঘুম গভীর না পাতলা তা এই যন্ত্রের সাহায্যে বোঝা যায়। কেউ স্বপ্ন দেখছে কিনা আমরা এই যন্ত্র দিয়ে তা বুঝতে পারি। মানুষের ব্রেনের ইলেকট্রিক্যাল এ্যাকটিভিটি, এই যন্ত্র ধরতে পারে। ঘুম, স্বপ্ন দেখা, গভীর চিন্তা বা মন শান্ত বা অশান্ত থাকার সময় এই এ্যাকটিভিটির তফাৎ হয়।

কাছ থেকে। আমার মনে হয়—

তাড়াতাড়ি কাজ যে ভাবে করা যায় তাই করা ভাল।

পাতা উল্টানোর জন্য জল দরকার থাকলে জলই ব্যবহার করতে হবে, থুতু ব্যবহার করা নোংরামি।

বড়দের ব্যবহার পছন্দ না হলে তা অনুকরণ না করলেই চলে।

[৬]

সেদিন মাঝরাতে আওয়াজে ঘুম ভেঙ্গে গেল। দিদি কাঁদছে। আমি ওকে জিজ্ঞেস করলাম ও কেন কাঁদছে। দিদি বলল যে ওর হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে যায়। ও শুনতে পায় একটা গান হচ্ছে। গানের আওয়াজ আসছে টেলিভিশন যে ঘরে থাকে সেই ঘর থেকে। ও দেখতে যায় টি ভিতে কি হচ্ছে। যেই ও টি ভির ঘরে ঢুকেছে বাবা ওকে ঘর থেকে বের করে দেয়। আর মা ওকে এই ঘরে ঢুকিয়ে দরজা বন্ধ করতে করতে বলেন, বলেছি না বড়দের সিনেমা তোরা দেখবি না। আমার মনে হল—

দিদি বাবা মায়ের কথা না শুনে ও ঘরে গিয়ে ঠিক করেনি।

বাবা মা যেদিন পার্টিতে অনেক রাত পর্যন্ত থাকবেন আমি আর দিদি বড়দের সিনেমা দেখব।

বাবা মাকেও বড়দের সিনেমা দেখতে বারণ করব।

শৈবালদা তো কলেজে পড়ে, ওর কাছ থেকে জেনে নেব বড়দের সিনেমায় কি দেখায় যা ছোটদের দেখা বারণ।

জানবার কথা

তাল নিয়ে

শ্রীপ্রীতিভূষণ চাকী

গীত, বাদ্য আর নৃত্য যাই বল তাল ছাড়া এদের অস্তিত্বের কথা ভাবাই যায় না, যেমন ভাবা যায় না বৃন্তহীন পুষ্পের কথা। তৃণখণ্ড থেকে মহাকাশ পর্যন্ত সবই যেন সুরে বাঁধা, এক বিচিত্র তালে চলছে প্রকাণ্ড জগত।

'তাল' কথাটির উৎপত্তি কী করে হল এ নিয়ে পুরাণে একটি কাহিনী আছে।

একদিন শিব যোগী বেশে গভীর অরণ্যে ঋষিদের সঙ্গে এক তর্কযুদ্ধে যোগ দিলেন এবং ঋষিদের হারিয়ে দিলেন। ঋষিরা ক্ষেপে গিয়ে শিবকে আক্রমণ করলেন। যজ্ঞের আগুনে ভয়ঙ্কর মূর্তি এক বাঘ সৃষ্টি করে ছেড়ে দিলেন শিবের সামনে। এদিকে শিব তো অনায়াসেই তাঁর কড়ে আঙুলের নখ দিয়ে ছিন্ন ভিন্ন করলেন বাঘকে, আর সেই বাঘের চামড়া ছাড়িয়ে গায়ে জড়িয়ে নিলেন। ঋষিরা তাতেও ছাড়েন না, এবারে বিষধর এক সাপ সৃষ্টি করে ছুঁড়ে মারলেন শিবের গায়ে। শিব তো সেই সাপকে মালা করে গলায় পরলেন। তখন রেগে মেগে ঋষিরা যজ্ঞের আগুন থেকে বিকটাকার এক বামনরূপ অসুরকে শিবের সামনে হাজির করলেন। শিব প্রচণ্ড লাথিতে সেই অসুরের হাড়-গোড় চূর্ণ করে ফেললেন আর সেই সঙ্গে সঙ্গেই তাণ্ডব নৃত্য শুরু করে দিলেন। শিবের এই তাণ্ডব দেখে স্বর্গলোকের দেবতা ও ঋষিরা স্তম্ভিত হলেন। আর এই নৃত্যে পার্বতী হলেন মুগ্ধ।

সূর্যের পাশে শান্ত নদীর মতো গভীর করুণা ও মমতা নিয়ে তিনি শুরু করলেন 'লাস্য' নৃত্য।

এই তাণ্ডব এর 'তা' আর লাস্যের 'ল' নিয়েই সৃষ্টি হ'ল তাল।

নিয়মাবলী

লেখক–লেখিকাদের জন্য ঃ মূল্যবোধ ও পরিবেশ বা আজকের দিনের কোন সমস্যা নিয়ে আপনার গল্প বা প্রবন্ধ ছাপতে আমরা আগ্রহী।

লেখা কাগজের একদিকে বাঁদিকে অন্ততঃ এক ইঞ্চি ছেড়ে স্পষ্ট-ভাবে লিখবেন। লেখার নকল রেখে পাঠাবেন।

উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে যথাযথভাবে উদ্ধৃতি চিহ্ন থাকা প্রয়োজন। যে বই থেকে নেওয়া হয়েছে তার নাম, গ্রন্থকারের নাম, প্রকাশকের নাম ঠিকানা, প্রকাশন বর্ষ, সংস্করণ সংখ্যা ইত্যাদির নির্ভুল উল্লেখ আবশ্যক।

অমনোনীত লেখা ফেরত পেতে হ'লে রেজিষ্ট্রী ডাকের উপযুক্ত ডাকটিকিট পাঠাতে হবে।

চিঠির উত্তরের জন্য ষাট পয়সার স্ট্যাম্প বা ঠিকানা সম্বলিত খাম / ইনল্যাণ্ড / পোস্টকার্ড পাঠাতে হবে। লেখা বা চিঠি সংযুক্ত সম্পাদক বা সম্পাদকের নামে পাঠাবেন।

গ্রাহকদের জন্য ঃ জানুয়ারী মাস থেকে বছর আরম্ভ। বছরের প্রথম সংখ্যা থেকে এক বছরের জন্য গ্রাহক হওয়া যায়। বছরের যে কোন সময় বার্ষিক চাঁদা গৃহীত হলেও গ্রাহক করা হবে জানুয়ারী মাস থেকে। বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা সডাক ১৫·০০ টাকা। ভারতের বাইরে $ ১০।

পরের মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে পত্রিকা না পেলে অবিলম্বে কার্যালয়ে জানালে পুনরায় ঐ সংখ্যা দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু পরবর্তী মাসের মধ্যে না জানালে পত্রিকা প্রাপ্তির নিশ্চয়তা থাকবে না।

রোদসীর চাঁদা মনিঅর্ডারে পাঠালে কুপনে পুরো নাম, ঠিকানা পরিষ্কার ক'রে লেখা প্রয়োজন। মনিঅর্ডার বা পোস্টাল অর্ডারে টাকা পাঠানো যাবে। পোস্টাল অর্ডার বিবেকানন্দ নিধিকে দেয়। **মনিঅর্ডার পাঠানোর ঠিকানা ঃ** ১৪৯/১ই রাসবিহারী অ্যাভিনিউ, কলকাতা-৭০০০২৯। সরাসরি টাকা দিতে গেলে এই ঠিকানা ছাড়াও বিবেকানন্দ নিধি, ৯৯, কড়েয়া রোড, কলকাতা-১৯ ঠিকানায় যে কোন কাজের দিন বিকেল পাঁচটা থেকে সাড়ে সাতটার মধ্যে দেওয়া যাবে।

ঠিকানার পরিবর্তন হলে অন্ততঃ একমাস আগে জানাতে হবে।

Postal Regn No. WB/SC223
৫ম বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, জুলাই ১৯৮৭ Regn No. RN-41095/83

21 JUL 87

মানুষের একটা দিক আছে যেখানে বিষয়বুদ্ধি নিয়ে সে আপন সিদ্ধি খোঁজে। সেইখানে আপন ব্যক্তিগত জীবযাত্রা নির্বাহে তার জ্ঞান, তার কর্ম, তার রচনাশক্তি একান্ত ব্যাপৃত। সেখানে সে জীবরূপে বাঁচতে চায়।

কিন্তু, মানুষের আর একটা দিক আছে যা এই ব্যক্তিগত বৈষয়িকতার বাইরে। সেখানে জীবনযাত্রার আদর্শে যাকে বলি ক্ষতি তাই লাভ, যাকে বলি মৃত্যু, সেই অমরতা। সেখানে জ্ঞান উপস্থিত প্রয়োজনের সীমা পেরিয়ে যায়; কর্ম স্বার্থের প্রবর্তনাকে অস্বীকার করে। সেখানে আপন স্বতন্ত্র জীবনের চেয়ে যে বড়ো জীবন সেই জীবনে মানুষ বাঁচতে চায়।

– রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সম্পাদনা, প্রকাশনা ও মুদ্রণ : স্বামী মুক্তানন্দ। সংযুক্ত সম্পাদক—লিপিকা গাঙ্গুলী। সহকারী—ছন্দা বাগচী।
বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা ১৫ টাকা। প্রতি কপি ১ টাকা ৫০ পয়সা
বিবেকানন্দ নিধি, ৮৬এফ, মনোহরপুকুর রোড, কলিকাতা-২৯
এবং ৯৯, কড়েয়া রোড, কলিকাতা-১৯, টেলিফোন ৪৪-৪৮১৩,
পাপাই প্রিন্টার্স ২৩৭, এন এস সি বোস রোড, কলিকাতা-৪৭
হইতে মুদ্রিত।

S 348

রোজনী

৫ম বর্ষ ।। ৯ম সংখ্যা ।। সেপ্টেম্বর ১৯৮৭

জগতে সমুদয় ধনরাশির চেয়ে 'মানুষ' হচ্ছে বেশী মূল্যবান
– স্বামী বিবেকানন্দ

বিবেকানন্দ নিধি ও ইনষ্টিট্যুট অফ ভ্যালু ওরিয়েন্টেশন অ্যাণ্ড
এনভায়রনমেণ্টাল এডুকেশন এর মাসিক মুখপত্র

সূচীপত্র

বিজ্ঞান ও মূলাবোধ ১২৯

পাপীর পুণ্য

—শ্রীমতী জয়শ্রী ঘোষ ১৩০

মূলাবোধ ও আমরা ১৩২

নিধির খবর ১৩৪

সত্যের জয় [কবিতা]

—শ্রীমতী শীলা সেন ১৩৫

চিঠিপত্র ১৩৭

ছোটদের বিভাগ :

বিজ্ঞান

আগ্নেয়গিরির উপযোগিতা ১৩৯

জানবার কথা :

মান্ধাতার গল্প ১৪০

থিয়েটারের কাহিনী ১৪১

তুমি কি করবে ? ১৪২

রোদসী

৫ম বর্ষ ॥ ৯ম সংখ্যা ॥ সেপ্টেম্বর ১৯৮৭

বিজ্ঞান ও মূল্যবোধ

জীবজগতে জীবের বৃদ্ধি হয় অত্যন্ত ক্ষুদ্র জৈবিক অবস্থা থেকে। মানুষের বৃদ্ধিও এইভাবেই হয়। অণু সমান জৈবিক অবস্থা থেকে মানুষের শারীরিক বৃদ্ধি হতে থাকে। ভ্রূণ থেকে শিশু এবং ক্রমশঃ পরিপূর্ণ মানুষের সৃষ্টি হয়। শিশু অবস্থা থেকে মানুষের শিক্ষার শুরু। শিক্ষা নানারকমভাবে হয়। শৈশবে মানুষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক শিশুর মনে আবেগপ্রবণতার সৃষ্টি করে। ধর্ম, সংস্কৃতি এবং পুঁথিগত বিদ্যার সাহায্যে শিক্ষার সম্প্রসারণ হতে থাকে।

মানুষ সমাজে থাকে। সমাজের সঙ্গেই তার আদান প্রদান। সামাজিক পরিবেশেই মানুষ মানুষের মতো বাঁচতে পারে। সামাজিক পরিবেশকে রক্ষা করে আরও একটি পরিবেশ, যার নাম প্রাকৃতিক পরিবেশ। প্রাকৃতিক পরিবেশে রয়েছে প্রকৃতির অকুণ্ঠ দান। প্রকৃতির উপাদানগুলির প্রত্যেকটিরই প্রয়োজন আছে প্রাণের সৃষ্টি এবং রক্ষার জন্য। এই বিভিন্ন উপাদানগুলির মধ্যে একটা ভারসাম্য আছে। প্রাকৃতিক ভারসাম্য বিঘ্নিত হলে প্রাণী জগতের সমূহ বিপদ। বিজ্ঞান এই ভারসাম্য রক্ষা করতে বলে।

কিন্তু শুধু এই ভারসাম্য রক্ষাই নয়, বিজ্ঞান বলে সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে আমরা যদি মনুষ্য সমাজের প্রতি যত্ন না নিই, তাহলে মনুষ্য সমাজের কল্যাণ করা যাবে না। এই দৃষ্টিভঙ্গীকে বলা হয় Ecological view—চেরনোবিলে আণবিক দুর্ঘটনা ঘটলে তা শুধু ঐ জায়গাতেই সীমাবদ্ধ থাকে না, মহাকাশে খেয়ালখুশী মতো কোন পরীক্ষা চালালে তার প্রভাব সমগ্র পৃথিবীর ওপরেই পড়ে। বিজ্ঞান আরও বলে, যেসব বিভিন্ন স্তরের মধ্য দিয়ে মানুষের জৈবিক বৃদ্ধি, মানবিক বিকাশ, বুদ্ধি এবং চিন্তাশক্তির স্ফুরণ, যে পরিমণ্ডলে

পাপীর পুণ্য ?

শ্রীমতী জয়শ্রী ঘোষ

আমাদের সংস্থার নাম 'শুদ্ধচিত্ত সমবায়'। আমরা লোকের কাছে চাঁদা নিয়ে সমাজ সেবা করি। লোকে আমাদের চাঁদা দেয় একটাই কারণে। কারণটা এই যে, সবাই মনে করে আমরা নিজেরা সৎ এবং সৎ লোকের সাহায্যে আমাদের কাজ চলে। আর আপনি এখন বলছেন একজন রাজনৈতিক নেতা আর একজন শিল্পপতিকে আমাদের আগামী অনুষ্ঠানে মাননীয় অতিথি করে আনবেন। আমরা সবাই জানি এইসব নেতারা সৎ নন, এতে কি আমাদের আদর্শে ধাক্কা লাগবে না ?'

শুদ্ধচিত্ত সমবায়ের কর্মাধ্যক্ষ বললেন, 'আমাদের সামনে যে কাজ তাতে অনেক টাকার দরকার। সাধারণ লোকের স্বল্প দান নিয়ে ঐ কাজ করা সম্ভব নয়। টাকা যাঁরা যোগাড় করতে পারেন তাঁদের আমাদের সঙ্গে আনতেই হবে। একটা কথা তোমরা বুঝতে পারছ না, ঐসব লোকের সাহায্য এবং টাকা কিন্তু আমরা সৎ কাজেই লাগাব।'

আরতি বলল, 'টাকার অবশ্য জাত নেই। কিন্তু আমরা তো আর সবাই যা করে তাই করতে যাচ্ছি, ক্ষমতা আছে বলে ঐসব লোককে ডেকে এনে সামনের সারিতে বসাচ্ছি।'

উৎপল বলে উঠল, 'আমি মনে করি না একজন অসৎ লোকের টাকায় বা সাহায্যে কোন ভালো কাজ করা সম্ভব।'

আলোচনা বেশ জোরালো হয়ে উঠছে। সন্ধ্যাও লাগে লাগে।

[বিজ্ঞান ও মূল্যবোধের শেষাংশ

মানুষের বসবাস, সেইসব বিভিন্ন স্তরগুলির কোনটিকেই উপেক্ষা করা চলে না। প্রতিটি স্তরের সঙ্গেই মানুষের নিবিড় সম্পর্ক। প্রতিটি স্তরই আবার পারস্পরিক বন্ধনে আবদ্ধ। অর্থাৎ কোন একটি স্তরের পৃথক অস্তিত্ব মানুষের ভ্রান্ত ধারণা ব্যতীত কিছুই নয়। Ecological View অর্থাৎ সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী তাই বৈজ্ঞানিক সত্য।

সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী মূল্যবোধের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

ওদের সবাইকেই অনেকদূরে যেতে হবে। তাই কর্মাধ্যক্ষ সব্যসাচী বললেন, 'চলো বেরিয়ে পড়ি, হাঁটতে হাঁটতে কথা বলা যাবে।'

সবাই রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছে, শহরতলীর রাস্তা। দূরে একটা কারখানা দেখা যাচ্ছে। ঐ কারখানার পরে জনবসতি কমে এসেছে। ওখানে একটা বিরাট পুকুর আছে। ওদের ঐ পুকুর ছাড়িয়ে আরো একটা বড় মাঠ পেরিয়ে যেতে হবে।

শুভশ্রী বলল, 'আমরা হয়তো একটা ভুল করছি, একজন খারাপ লোকও নিশ্চয়ই কিছু ভালো কাজও করে থাকেন আর তিনি খারাপ বলেই তাঁর কাজটা খারাপ হয়ে যায় না।'

অদিতি বলল, 'আমি একথা মানতে পারছি না। যে মানুষ আসলে খারাপ এবং অসৎ, তার সবকিছুর মধ্যেই পাপ থাকে। সুতরাং তার ভালো কাজও তখন খারাপই হয়ে যায়।'

এমন সময়ে ওরা হঠাৎ দেখে একদল ছেলে হৈ হৈ করতে করতে ঐ বড় পুকুরটার দিকে এগিয়ে চলেছে। ছেলেদের জিজ্ঞাসা করায় ওরা জানাল যে, ঐ পাড়ার বখাটে ছেলে নিশীথ সুযোগ পেয়ে পাড়ার একটি মেয়ের সর্বনাশ করে পালাবার চেষ্টা করছিল, মেয়েটির চিৎকার শুনে লোকেরা বেরিয়ে এসে দেখে নিশীথ পালাচ্ছে। পাড়ার লোকেরা একটু পরে বুঝতে পারে নিশীথ কি করেছে। কিন্তু এর মধ্যে নিশীথ বহুদূর চলে গেছে। তাই ছেলেরা ওকে ধরার জন্য ছুটে চলেছে।

শুদ্ধচিত্ত সমবায়ের কর্মীরা এই রকম একটা ঘটনা শুনে উত্তেজিত হয়ে ওঠে। ওরাও পুকুরের দিকে ছুটতে থাকে। পুকুরের কাছে এসে দেখে, লোকে লোকারণ্য। একটা বাচ্চা ছেলে পুকুরে পড়ে গেছে। বাচ্চা ছেলেটা পুকুরের জলে অনেকক্ষণ হাবুডুবু খেয়েছে, সবাই ওকে দেখেছে, কিন্তু কেউ সাহস করে ওকে তোলবার জন্য জলে ঝাঁপ দেয়নি। ছেলেটি জলে তলিয়েই যাচ্ছিল। একটু আগে একজন লোক দৌড়তে দৌড়তে এখানে আসে, ঘটনাটা শুনে সে কিছুমাত্র দ্বিধা না করে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

শুদ্ধচিত্ত সমবায়ের কর্মীরা দেখে একজন যুবক কোনরকমে

মূল্যবোধ ও আমরা

[Value Orientation এ প্রকাশিত 'Values & Ourselves' অনুসরণে]

—পূর্ব প্রকাশিতের পর—

ধর্ম নিরপেক্ষতা আমাদের মূল্যবোধকে কিভাবে প্রভাবিত করে বুঝতে হ'লে মানুষের বিশ্বাস ও মনোভাবের সৃষ্টির দিকে আমাদের দৃষ্টি ফেরাতে হবে। বস্তুগত, যান্ত্রিক ও উপযোগী মূল্যবোধকে আমরা ধর্মনিরপেক্ষ মূল্যবোধ বলে মনে করি। বাস্তবের সঙ্গে সম্পর্কহীন কোন সত্তাকে ধর্মনিরপেক্ষতা গ্রহণ করে না অর্থাৎ ধর্মনিরপেক্ষতা এবং আধ্যাত্মিকতা পরস্পর সম্পর্কহীন। যান্ত্রিক বিশ্ববাদ গড়ে উঠেছে বস্তুতান্ত্রিক জ্ঞানের ওপর। এই জ্ঞানের সৃষ্টি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য তথ্য থেকে এবং বুদ্ধি এই জ্ঞানের পরিচালক। যেহেতু বুদ্ধি বস্তুর সৃষ্টি, সেইজন্য বুদ্ধিও বস্তুগত। ধর্মনিরপেক্ষতার সঙ্গে বস্তুতান্ত্রিক মনোভাবের সম্পর্ক আছে। তাই ধর্মনিরপেক্ষতা বিচ্ছিন্নতাবাদী মূল্যবোধকে প্রতিফলিত করে। ধর্মনিরপেক্ষতার বিপরীতে দাঁড়িয়ে আছে আধ্যাত্মিক ধ্যান ধারণা যা আত্মবাদী। সুতরাং, শিক্ষা ব্যবস্থায় ধর্মীয় বা আধ্যাত্মিক মূল্যবোধকে অন্তর্ভুক্ত করলে বিচ্ছিন্নতাহীন বিশ্বভাবনার দিকে আমাদের সচেতনতা বাড়বে। এই কারণে

('পাপীর পুণ্য' এর শেষাংশ)

একটি বাচ্চাকে জল থেকে তুলবার চেষ্টা করছে। যুবকটিকে দেখামাত্র কিছু ছেলে চিৎকার করে উঠল, 'ঐ ব্যাটা নিশীথ, মার ওকে।'

নিশীথের ওপর পাড় থেকে ইট, পাথর বর্ষণ হতে লাগল। সে-সব উপেক্ষা করে নিশীথ কোনরকমে ছেলেটিকে পাড়ের ওপরে তুলল। আর পাড়ের খুব কাছে আসামাত্র একটা বড় পাথর নিশীথের মাথায় পড়ল।

বাচ্চা ছেলেটা শেষ পর্যন্ত প্রাণে বাঁচল। সব্যসাচী শুদ্ধচিত্ত সমবায়ের সকলকে জিজ্ঞাসা করলেন—

'বাচ্চা ছেলেটিকে কি বাঁচতে দেওয়া উচিত না নিশীথের সংস্পর্শে ও অশুচি হয়ে গেছে বলে ওকে মেরে ফেলা উচিত ?

ভারতীয় সংস্কৃতি কোন অলৌকিক ঈশ্বরের ধারণাকে গ্রহণ করে না, যেহেতু ঈশ্বর সর্বত্র আছেন। ধর্মীয় শিক্ষা মানুষের চিন্তায় মূল্যবোধ বিরোধী মনোভাব কাটিয়ে দেয় এবং ভগবান পরিব্যপ্ত ও তুরীয় উভয়ই এ সম্পর্কে অবহিত করে। ভারতীয় সংস্কৃতি দ্বিতীয় মতবাদের ওপর বিশ্বাস করে দাঁড়িয়ে আছে। তাই আমাদের দেশের যেটা সাধারণ প্রবণতা, তা হচ্ছে ভারতের জনসংখ্যার শতকরা ৮১ ভাগ মানুষ সেমিটিক (Semitic) সংস্কৃতির মৌলিক ধ্যান ধারণা মেনে চলতে পারে না। কিন্তু ভারত তার আধ্যাত্মিক বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলীর জন্য সেমিটিক্ ধর্ম ও সংস্কৃতিকে বৈচিত্র্য হিসাবে গ্রহণ করতে কেবলমাত্র ঐ ধরণের সংস্কৃতিকে আশ্রয়ই দেয় না, তার মূল্যবোধ প্রণালী তাদের মূলনীতির বাহ্যিক বিভিন্নতার অন্যতম অংশীদার হতেও অনুপ্রাণিত করে। একমাত্র এই মূল্যবোধ সংক্রান্ত কর্মসূচী হচ্ছে ভারতীয় জীবনধারার সাংস্কৃতিক আচরণের মূলস্রোতকে সঠিক পথে চালিত করার চিরন্তন প্রচেষ্টা।

ধর্মনিরপেক্ষ ও ধর্মসংক্রান্ত বিরোধের ওপরে আছে মৌলিক সত্য ও তার আদিরূপ সম্পর্কে জানার এক চিরন্তন আগ্রহ, যা হল ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গী। আমাদের পারিপার্শ্বিক অবস্থা ইঙ্গিত দেয় যে আমরা ধর্মনিরপেক্ষ আদর্শের সঙ্গে যুক্ত প্রকৃত তথ্য ও ঘটনা বিচার বিশ্লেষণ করে ধর্মনিরপেক্ষ পথে চলতে পারি এবং ক্রমশঃ ধর্মীয় বিচারের রাজ্যে পৌঁছতে পারি। প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতি যদি ধর্মীয় শিক্ষার ভিত্তি হয়, তাহলে এই শিক্ষাব্যবস্থা সমর্থনযোগ্য। কারণ, যখন আস্তিকতা ও নাস্তিকতার ওপরে ওঠা যায়, তখন ধর্ম-নিরপেক্ষতা ও ধর্মবিশ্বাসের দ্বন্দ্ব আর থাকে না। তখন মনে হয়, ধর্মনিরপেক্ষতা আধ্যাত্মিকতার প্রতিফলন—আধ্যাত্মিকতাই ধর্ম-নিরপেক্ষতা।

[ক্রমশঃ]

নিধির খবর

'শান্তি ও আন্তর্জাতিক সহায়তার সংগ্রামে ভারত ও রাশিয়া' শীর্ষক একটি আলোচনাচক্র আয়োজিত হয় ৪ই আগষ্ট গোর্কী সদনে। স্বামী মুক্তানন্দ এই অনুষ্ঠানে যোগ দেন।

*

'মাদকাসক্তি কিভাবে বন্ধ করা যায়' এ বিষয়ে ডোভার লেন আঞ্চলিক সমিতি একটি আলোচনাচক্র আয়োজন করেন। উপস্থিত অনেকেই সমস্যাটি নিয়ে আলোচনা করেন এবং এ বিষয়ে গরচা থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকের ইতিবাচক ভূমিকার প্রশংসা করেন। এক তরুণ স্বেচ্ছাসেবক অনির্বাণ এই কাজ করার পথে যুবকেরা কি কি সমস্যার সম্মুখীন হন তা নিয়ে বিশদ আলোচনা করেন। স্বামী মুক্তানন্দ তাঁর ভাষণে বলেন মাদকাসক্তি আজকের যুব-সমাজের হতাশা ও ক্রোধের চরম পরিণতি। তিনি এই প্রসঙ্গে জীবনের অর্থ ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আলোচনা করেন এবং বলেন আজকের দিনে শুধু যুবকেরাই নয় বয়স্করাও এই উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সচেতন নন। এই অবস্থার জন্য তিনি বয়স্কদেরই দায়ী করেন ও বলেন কেবলমাত্র যুবকেরাই যে মাদকাসক্ত তা নয় বয়স্কদের মধ্যেও অনেক মাদকাসক্ত ব্যক্তি দেখা যায়। আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি জোর দেন যে বেঁচে থাকার কোন উদ্দেশ্য খুঁজে না পাওয়ার ফলেই মাদকাসক্তি বাড়ছে এবং এই অবস্থার সুযোগ নিচ্ছেন আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক নেতারা।

*

ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল ফর রুরাল ইউথ ১৫-১৬ আগষ্ট এই দুদিনে একটি আলোচনাচক্র আয়োজন করেন। এই আলোচনাচক্রে 'নীড ফর নেটওয়র্ক অফ এনভায়রনমেণ্টাল অর্গানাইজেশন' শীর্ষক অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন স্বামী মুক্তানন্দ। এই অধিবেশনের মূলবক্তা শ্রীঋতেন ভট্টাচার্য নেটওয়র্ক তৈরীর প্রয়োজনীয়তা ও সম্ভাব্য কার্যসূচী সম্বন্ধে আলোচনা করেন। শ্রীসিদ্ধার্থ দাসগুপ্ত, শ্রী ডি বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীতপন দাস, শ্রীসুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকল্যাণ আচার্য, শ্রীরবীন ভট্টাচার্য ও হরিপ্রসাদ প্রমুখ আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন।

[শেষাংশ ১৩৮ পৃষ্ঠায়]

সত্যের জয়

শ্রীমতী শীলা সেন

—তুমি কে ?

—আমি অন্যায় ।

—কি চাও ?

—প্রতিষ্ঠা ।

—পাবে না কিছুতেই ।

—পাব না ?

—না ।

—দেখতে পাচ্ছ না ?

—কি ?

—কোথায় আমি নেই ?

—পাচ্ছি ।

—তবে আর কি ?

—তবুও জানি তুমি হেরে যাবে ।

—হেরে যাব ?

—হ্যাঁ গো হ্যাঁ ।

—তোমার এ অহঙ্কার কিসের ?

—সত্যের আর সাহসের ।

—ওগুলো অকেজো হয়ে গেছে ।

—কখ্খনো না ।

—কেমন করে জানলে ?

— যুগের চাকা গোল হয়ে ঘোরে।
— তাতে কি ?
— সত্য, ত্রেতা, দাপর, কলি :
—তারপর ? তারপর কি ?
—আবার সত্য আসবেই।
—সেই আশায় বসে আছ ?
—নিশ্চয়ই।
—তবে মরে যাবে।
—না-আ-আ—।
— মনে নেই পাঁচটি পাণ্ডবে
হারিয়েছিল শত কৌরবে ?
—ও তো একটা গল্প।
— না, এ হ'ল কাহিনী।
—কাহিনী ? কিসের ?
—ত্যাগ আর সত্যের।
—পাগলামি ছাড়,
চলে এসো আমার দলে।
—নাঃ—আমি বাঁচবই,
আর তুমিই মরে যাবে তিলে তিলে ॥

চিঠিপত্র

বিষয় : শ্রীমতী পূর্ণিমা সেনের পত্র
শ্রীঋতেন ভট্টাচার্যের প্রবন্ধ 'গঙ্গাদূষণ ও
স্বামী বিবেকানন্দ' আগষ্ট ১৯৮৬

মহাশয়,

মূল্যবোধ ও পরিবেশের গুরুতর বহু আলোচনার মধ্যে 'গঙ্গাদূষণ ও স্বামী বিবেকানন্দ' প্রবন্ধের মধ্যে আমরা একটা সরস মূল্যবোধের স্নিগ্ধ জলবায়ু যেন উপভোগ করেছি। কিন্তু মাননীয়া শ্রীমতী পূর্ণিমা সেন সন্দেহের প্রশ্ন তুলেছেন। 'গঙ্গাজল স্পর্শ ও পান আমাদের আনন্দময় কোষ উপলব্ধি করতে অনুপ্রাণিত করে'। ঋতেনবাবুর এই উক্তিতে তাঁর সন্দেহ। গঙ্গানদী ও আনন্দময় কোষের সম্পর্ক নির্ধারণে বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে কি? অথবা বিশ্বাস মাত্র?

আমাদের কাছে কিন্তু এই সন্দেহ অমূলক। যতই কূট কথা উঠুক না কেন, আমরা বিজ্ঞানকে একপেশে জড়মুখী করে দেখিনা। মনোবিজ্ঞান, অধ্যাত্মবিজ্ঞান আমাদের কাছে জড়বিজ্ঞানের চেয়ে কম মূল্যবান নয়। জড় পদার্থ, মন, বিশ্বাস, চেতনা এইসব নিয়েই আমাদের বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা এবং অস্তিত্ব। জড় বিষয়ের মূল্য জড়ত্বেই শেষ নয়, সে মন বুদ্ধিকে কতটা প্রভাবিত করছে তাও লক্ষণীয়।

বস্তু, পরিবেশ, দেহ, মন—এই সবের পরিচ্ছন্নতা আমাদের বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ স্বাস্থ্যকে সুস্থ রাখে। গঙ্গাজলের পবিত্রতা আমাদের শুধু দেহঘটিত স্বাস্থ্যের জন্য মূল্যবান নয়, সে পবিত্রতা নিশ্চয়ই আধ্যাত্মিক উন্নতির সহায়ক। সেজন্যই কোটি কোটি লোক কত সহস্র বৎসর ধরে গঙ্গাজলের জন্য ছুটে আসে। শুধু ভালো জল খেতে, নাইতে আসেনা। এই সম্পর্কেই আনন্দময় কোষের কথা অত্যন্ত অর্থবহ এবং বাস্তব। কোটি কোটি লোকের ব্যবহার্য এই গঙ্গাকে তবে কতটা যত্নে পরিচ্ছন্ন রাখা দরকার?

অন্নময় কোষ এবং আনন্দময় কোষ সকল নরনারীর পক্ষেই অতি সূক্ষ্ম তথ্য। সকল দেশেই বহু বিখ্যাত দ্রব্য এবং মন্দির, মসজিদ গীর্জাদি এইরূপ নানাপ্রকার মানসিক প্রয়োজনেই পবিত্র রাখার চেষ্টা করা হয়। স্বামী বিবেকানন্দ সেই বিজ্ঞান প্রমাণিত করেছেন।

উক্ত প্রবন্ধে সেই গাঙ্গেয় তথ্যই আলোচনা করে লেখক আমাদের ধন্যবাদার্হ হয়েছেন। স্বামী বিবেকানন্দের জীবন ও বাণীতে অধিকতর প্রবেশ করলে একথা আরও স্পষ্ট হবে।

আমাদের আকাঙ্খা, চিন্তা ও কর্মে আমাদের 'গঙ্গাবিবেক' জাগ্রত হোক এবং গঙ্গাকে পবিত্র রেখে আমাদের দেহ মন এবং অর্থ-নীতি পবিত্রতর হোক।

নিবেদন ইতি—

নিরঞ্জন কুমার সাহা, অনাথবন্ধু দাশ,
রণেন্দ্র বিশ্বাস, ও সুবোধ চন্দ্র সাহা,
জিয়াগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

নিধির খবরের শেষাংশ

২৪শে আগষ্ট থেকে স্বামী যুক্তানন্দ 'ভ্যালু ওরিয়েন্টেশন ইন রিলেশন টু ম্যানেজারিয়াল এফেকটিভনেস' এই বিষয়ে মোদিনগরের সেণ্টার ফর ম্যানেজমেণ্ট ডেভেলপমেণ্ট, নিউ দিল্লীর অল ইণ্ডিয়া ম্যানেজমেণ্ট অ্যাসোসিয়েশন, দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যানেজমেণ্ট ফ্যাকাল্টী, ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটী কাউন্সিল এবং নিউ দিল্লীর ইন্সটিটিউট অফ ম্যানেজমেণ্ট স্টাডিজ প্রভৃতি জায়গায় আলোচনা করেন।

বিজ্ঞান

আগ্নেয়গিরির উপযোগিতা

১৯০২ সালের ৮ই মে সকাল সাতটায় Saint Pierre শহরে যে অগ্ন্যুৎপাত হয়েছিল তাতে শহরটির ৩০,০০০ মানুষ প্রাণ হারিয়েছিল। শহরটির কাছের বন্দরে যেসব জাহাজ নোঙর করা ছিল, তাদের অধিকাংশই ডুবে গিয়েছিল। আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের ভয়ঙ্কর বিপর্যয়ের কথাই আমরা বেশী জানি। কিন্তু এই অগ্ন্যুৎপাতের কিছু উপযোগিতাও আছে। অবশ্য ক্ষয়ক্ষতির সঙ্গে উপযোগিতার তুলনায় ক্ষয়ক্ষতির পাল্লাই অনেক অনেক বেশী ভারি।

অগ্ন্যুৎপাতের ফলে পৃথিবীর ভেতর থেকে বিশাল পরিমাণে শক্তি বাইরে বেরিয়ে আসে। এই শক্তির অধিকাংশই তাপশক্তি। এখনও পর্যন্ত এই তাপশক্তির মাত্র একটা অংশকেই কাজে লাগাতে পারা গেছে। অগ্ন্যুৎপাতের বাষ্প থেকে ইলেকট্রিক তৈরী করা যায়। এই বাষ্প দিয়ে ডায়নামো চালানো হয়। এছাড়াও এই বাষ্প থেকে বোরিক অ্যাসিডের মতো কিছু রাসায়নিক দ্রব্যও তৈরী করা যায়।

অগ্ন্যুৎপাতের ফলে জমি হয় উর্বরা। চাষের জন্য যেসব খনিজপদার্থ প্রয়োজন, অগ্ন্যুৎপাতের ফলে তা পৃথিবী থেকে বেরিয়ে আসে। ভিসুভিয়াস্ আগ্নেয়গিরির কাছ থেকে চাষীদের যতবার সরানো হয়েছে, অগ্ন্যুৎপাতের পরে দেখা গেছে তারা আবার চাষের জন্য সেই জায়গাতে ফিরে এসেছে।

শুধু পৃথিবীতে নয়, অন্য গ্রহতেও অগ্ন্যুৎপাত হয়ে থাকে ভয়জার I স্যাটেলাইট যেসব ছবি তুলেছে তাতে দেখা গেছে যে বৃহস্পতি গ্রহের একটি উপগ্রহ I-তে অগ্ন্যুৎপাত হচ্ছে, এই অগ্ন্যুৎপাতের ফলে যেসব পদার্থ বেরিয়ে আসছিল তাদের গতি ছিল ঘণ্টায় প্রায় ৩২০০ কিলোমিটার।

জানবার কথা

মান্ধাতার গল্প

খুব পুরানো কোন বস্তুকে দেখে আমরা অনেক সময়েই বলে থাকি 'মান্ধাতার আমলের জিনিস'। কিন্তু কেন এরকম বলি তা আমরা অনেকেই জানিনা। পুরনো জিনিস বোঝাতে গিয়ে 'মান্ধাতা' কথাটাকে ব্যবহার করি কেন?

আসলে বহুযুগ পূর্বে মান্ধাতা নামে সত্যিই কেউ একজন ছিলেন। ইক্ষাকুবংশে যুবনাশ্ব নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি মন্ত্রীদের উপর রাজ্যভার দিয়ে বনে গিয়ে সন্তানকামনায় যোগসাধন করতে লাগলেন। একদিন তিনি ক্লান্ত ও পিপাসার্ত হয়ে চ্যবন মুনির আশ্রমে প্রবেশ করে দেখলেন যজ্ঞবেদীর উপর এক কলসি জল রয়েছে। যুবনাশ্ব জল চাইলেন, কিন্তু তাঁর ক্ষীণ কণ্ঠস্বর কেউ শুনতে পেলেন না। তখন তিনি জলপান করে অবশিষ্ট জল কলসি থেকে ফেলে দিলেন। চ্যবন ও অন্যান্য মুনিরা নিদ্রা থেকে উঠে দেখলেন, কলসি জলশূন্য। যুবনাশ্বের স্বীকারোক্তি শুনে চ্যবন বললেন, রাজা, আপনি অনুচিত কার্য করেছেন। আপনার পুত্রোৎপত্তির জন্যই এই তপঃসিদ্ধ জল রেখেছিলাম। জলপান করার ফলে আপনিই পুত্র প্রসব করবেন কিন্তু গর্ভধারণের ক্লেশ পাবেন না। শতবর্ষ পূর্ণ হলে যুবনাশ্বের বাম পার্শ্ব ভেদ করে এক সূর্যতুল্য তেজস্বী পুত্র নির্গত হল। দেবতারা শিশুকে দেখতে এলেন। তাঁরা বললেন, এই শিশু কি পান করবে? ইন্দ্র তখন বললেন, আমাকেই পান করবে। এইকথা বলে ইন্দ্র তার মুখে নিজের তর্জনী পুরে দিলেন, সে চুষতে লাগল। যেহেতু ইন্দ্র বলেছিলেন, 'মাং ধাস্যতি' অর্থাৎ 'আমাকে পান করবে,' এইজন্যই সেই শিশুর নাম হয়েছিল 'মান্ধাতা'। মান্ধাতা বড় হয়ে ধনুর্বেদে পারদর্শী এবং বিবিধ দিব্যাস্ত্র ও অভেদ্য কবচের অধিকারী হলেন। মান্ধাতার ইচ্ছা ছিল ইন্দ্রের আসন এবং দেবরাজ্যের অর্ধাংশ অধিকার করার এবং সুরগণকর্তৃক বন্দিত হবার। কিন্তু তার পূর্বেই

মধুবনে মধুর পুত্র লবণাসুরের সঙ্গে যুদ্ধে তিনি প্রাণ হারান। এর অনেক পরে অবশ্য শত্রুঘ্নর হাতে লবণাসুর নিহত হয়েছিলেন।

সুতরাং মান্ধাতার অস্তিত্ব ছিল ত্রেতাযুগেরও পূর্বে এবং সেই-জন্যই খুব পুরানো বোঝাতে গেলে আমরা বলি মান্ধাতার আমলের জিনিস।

থিয়েটারের কাহিনী

থিয়েটার বা নাটক চিরকালই বেশ জনপ্রিয় ব্যাপার। এই থিয়েটারের উদ্ভাবন হয়েছিল গ্রীস দেশের এথেন্সে। আজ থেকে ২৩০০ বছরেরও বেশী আগে এথেন্সে প্রথম থিয়েটার তৈরী হয়েছিল এবং আজও সেই থিয়েটার ব্যবহার হয়ে থাকে। সাধারণ কথায় আমরা নাটককেই থিয়েটার বলে থাকি কিন্তু থিয়েটার বলতে নাট্য-মঞ্চকেই বোঝায়। গ্রীস দেশের লোকেরা নাটক খুব পছন্দ করতেন। ধর্মীয় অনুষ্ঠান থেকেই নাটকের জন্ম হয়েছিল। প্রাচীন মানুষেরা সূর্য, চাঁদ বা সমুদ্রকে পূজো করতেন এবং পূজোর সময়ে সঙ্গীত নৃত্য ইত্যাদি পরিবেশন করা হতো। মানুষের সংস্কৃতির অনেকটাই ধর্মের সঙ্গে যুক্ত। একসময়ে বৃটিশদেরও অধিকাংশ নাটকই ছিল যীশুখ্রীষ্টের জীবনের ওপর। প্রাচীন যুগে নাটক পরিবেশিত হত পাহাড় পরি-বেষ্টিত স্থানে। এখনকার দিনে যেমন নাট্যমঞ্চকে ঘিরে চারপাশে বৃত্তাকারে দর্শকাসন সাজানো থাকে, প্রাচীনকালেও কিন্তু সেইরকম ভাবেই দর্শকেরা বসতেন পাহাড়ের চারপাশের বিভিন্ন খাঁজে খাঁজে। সুতরাং আধুনিক কালের থিয়েটার সংক্রান্ত চিন্তা ভাবনার ভিত্তি কিন্তু প্রাচীনকালেই তৈরী হয়েছিল। এখন যেমন নাট্যমঞ্চের পিছনে বা পাশে অভিনেতা অভিনেত্রীদের সাজঘর থাকে, তখনও কিন্তু-দর্শকদের সম্মুখে একটা বাড়ী সাজঘর হিসাবে ব্যবহৃত হত।

প্রাচীন ভারতে নাটক পরিবেশিত হতো সংস্কৃত এবং প্রাকৃত ভাষায়। প্রাচীন ভারতের শ্রেষ্ঠ নাট্যকার ছিলেন মহাকবি কালিদাস। সেইযুগের ভারতীয় নাট্যকারেরা ৪৮ রকমের নায়ক, ৩৮৪ রকমের নায়িকা এবং বহু রকমের অন্যান্য নানাপ্রকার চরিত্র কল্পনা করে-

তুমি কি করবে ?

—পূর্ব প্রকাশিতের পর—

[১১]

দীপকের বাবার ওপর খুব রাগ। কারণ বাবা ওকে কাল খুব বকেছেন বন্ধুদের সঙ্গে পয়সা দিয়ে গুলি খেলার জন্য। ছুটি ছিল, বিকাল বেলায় বাবা বারান্দায় দাঁড়িয়েছিলেন আর ওরা দূরে খেলছিল। সন্ধ্যাবেলায় বাড়ী ফিরে আসতেই বাবা দীপককে খুব বকলেন। আমার মনে হল দীপক খুব বোকা। ও যাতে ভবিষ্যতে এরকম অসুবিধায় আর না পড়ে তার জন্য আমি ওকে বললাম—

বাবাকে বলবি তিনি যেন তোর কোন ব্যাপারে নাক না গলান। নাক গলালে ভয় দেখাবি যে, তুই অন্ধ রাস্তা নিবি। পয়সা দিয়ে খেললে খেলাটা খুব জমে, আর মজা পাবার জন্যইতো খেলা। সুতরাং খেললে পয়সা দিয়েই খেলতে হয়।

পয়সা দিয়ে যেকোন খেলা খেললেই সেটা জুয়া খেলা হয়। জুয়া খেলা অত্যন্ত খারাপ অভ্যাস।

বাবাকে বললেই হত যে, ও নিজে খেলছিল না। অতদূর থেকে বাবা নিশ্চয়ই বুঝতে পারেননি আসলে কে কে খেলছিল।

দীপকের ঐসব বন্ধুদের সংস্পর্শ চিরকালের মতো ত্যাগ করা উচিত।

(থিয়েটারের কাহিনীর শেষাংশ)

ছিলেন। চীনদেশেও নাটক খুব সমাদৃত হতো। নাটকের বিষয় প্রায়ই হতো পৌরাণিক অথবা ঐতিহাসিক। নাটকের জন্য বিশেষ জায়গাও নির্দিষ্ট থাকত।

সুতরাং আজকের দিনের নাটক বা থিয়েটারের উন্নতি সাধনের মূলে প্রাচীনকালের নাট্যকার এবং নট-নটীদের অবদান অনস্বীকার্য।

[১২]

সীমাদের বাড়ীর কাজের লোককে পুলিশে ধরে নিয়ে গেছে। ও পোস্ট্ অফিসে গিয়েছিল চিঠি রেজিষ্ট্রী করতে আর নতুন টিকিটের সঙ্গে পোস্ট্ অফিসের ছাপ্ না পড়া কয়েকটা ব্যবহার করা টিকিটও লাগিয়ে দিয়েছিল। পোস্ট্ অফিসের লোক সেটা ধরে ফেলেছিল। সীমার মনে হয়েছিল—

এটা খুব সামান্য ব্যাপার। এতো ছোট ব্যাপারের জন্য একজনকে জেলে পাঠানো উচিত হয়নি।

ব্যবহৃত টিকিটে পোষ্ট্ অফিসের ছাপ না পড়ার জন্য পোষ্ট্ অফিসই দায়ী। তারা তাদের কাজ করেনি। সেই টিকিট আবার ব্যবহার করলে দোষ কী!

ব্যবহৃত টিকিট ব্যবহার করাটা নিশ্চয়ই দোষের। তাছাড়া অন্য লোক কাজে ফাঁকি দিলেও আমি সেই ফাঁকির সুযোগ নিতে পারিনা।

দেশের বড় বড় মানুষরা কত অন্যায় করেছেন, তাদের দোষ কে দেখছেন? তাদের অন্যায়ের কাছে এতো কিছুই না।

অন্যায়ের ছোট বড় নেই। পাঁচ টাকা চুরি করলেও চুরি আর পঁচিশ টাকা চুরি করলেও চুরি।

[১৩]

সজল খুব উৎসাহের সাথে বলছিল যে, ও ওদের বাড়ীর কাজের লোককে কিরকম অপমান করেছে। ওদের বাড়ীর কাজের লোকের খুব ইচ্ছা ওর ছেলেকে একটু ভালোভাবে পড়ায়। তাই ও সজলকে বলেছিল ওকে একটু অঙ্ক দেখিয়ে দিতে। সজল বলেছিল যে ওর সময় নেই, তাতে কাজের লোক বলেছিল, 'আপনি তো বন্ধুদের সঙ্গে অনেক গল্প করেন, ঐ সময়ে যদি একটু আমার ছেলেকে পড়ান!' সজল রেগে গিয়ে বলেছিল, 'তুমি চাকর, চাকরের মতো থাকো। আমি কি করবো তা তোমায় বলতে হবে না, তোমার ছেলেতো চাকরই হবে, ওর আর লেখাপড়া করে কাজ নেই।'

এই ঘটনা শুনে সঞ্জয়ের মনে হল —

সকলের কাজের লোককে অপমান করা ঠিক হয়নি। কাজের লোকও মানুষ. উপায় নেই বলে সে আজ বাড়ীর কাজ করছে।

যারা গরীব, তাদের উচ্চাশা না থাকাই উচিত।

প্রত্যেক মানুষেরই উচিত পারলে অন্য লোকের উপকার করা। কোন কিছু না পেয়ে অন্য কারো জন্য কোন পরিশ্রম করা বোকামি।

[১৪]

আমি আর মাধুরী স্কুল থেকে ফিরছিলাম বাসে করে। মাঝ-পথে একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোক উঠলেন, চোখে ভালো দেখতে পান না, তাই কোন রকমে রড্ ধরে দাঁড়ালেন। এমন সময় ওঁর সামনের লেডিজ্ সিটটা ফাঁকা হয়ে গেলে মাধুরী তাতে ঝপাং করে বসে পড়ল। আমার মনে হয়েছিল—

বৃদ্ধ লোক দেখলে ওঁনাকে নিজের জায়গা ছেড়ে দিয়ে বসতে দেওয়া উচিত।

লেডিজ্ সিটে পুরুষদের বসার অধিকার নেই, তাই মাধুরী ঠিকই করেছিল—যতই বৃদ্ধ বা অসুস্থ হোন্ না কেন, উনি একজন পুরুষ মানুষ।

ভিড়ের মধ্যে কষ্ট করে পাওয়া সিট্ কখনোই কাউকে ছেড়ে দিতে নেই।

বৃদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও রাস্তায় চলাফেরা করলে কষ্টই পেতে হয়।

নিয়মাবলী

লেখক–লেখিকাদের জন্য ঃ মূল্যবোধ ও পরিবেশ বা আজকের দিনের কোন সমস্যা নিয়ে আপনার গল্প বা প্রবন্ধ ছাপতে আমরা আগ্রহী।

লেখা কাগজের একদিকে বাঁদিকে অন্ততঃ এক ইঞ্চি ছেড়ে স্পষ্ট-ভাবে লিখবেন। লেখার নকল রেখে পাঠাবেন।

উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে যথাযথভাবে উদ্ধৃতি চিহ্ন থাকা প্রয়োজন। যে বই থেকে নেওয়া হয়েছে তার নাম, গ্রন্থকারের নাম, প্রকাশকের নাম ঠিকানা, প্রকাশন বর্ষ, সংস্করণ সংখ্যা ইত্যাদির নির্ভুল উল্লেখ আবশ্যক।

অমনোনীত লেখা ফেরত পেতে হ'লে রেজিষ্ট্রী ডাকের উপযুক্ত ডাকটিকিট পাঠাতে হবে।

চিঠির উত্তরের জন্য ষাট পয়সার স্ট্যাম্প বা ঠিকানা সম্বলিত খাম / ইনল্যাণ্ড / পোস্টকার্ড পাঠাতে হবে। লেখা বা চিঠি সংযুক্ত সম্পাদক বা সম্পাদকের নামে পাঠাবেন।

গ্রাহকদের জন্য ঃ জানুয়ারী মাস থেকে বছর আরম্ভ। বছরের প্রথম সংখ্যা থেকে এক বছরের জন্য গ্রাহক হওয়া যায়। বছরের যে কোন সময় বার্ষিক চাঁদা গৃহীত হলেও গ্রাহক করা হবে জানুয়ারী মাস থেকে। বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা সডাক ১৫·০০ টাকা। ভারতের বাইরে $ ১০।

পরের মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে পত্রিকা না পেলে, অবিলম্বে কার্যালয়ে জানালে পুনরায় ঐ সংখ্যা দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু পরবর্তী মাসের মধ্যে না জানালে পত্রিকা প্রাপ্তির নিশ্চয়তা থাকবে না।

রোদসীর চাঁদা মনিঅর্ডারে পাঠালে কুপনে পুরো নাম, ঠিকানা পরিষ্কার ক'রে লেখা প্রয়োজন। মনিঅর্ডার বা পোস্টাল অর্ডারে টাকা পাঠানো যাবে। পোস্টাল অর্ডার বিবেকানন্দ নিধিকে দেয়। মনিঅর্ডার পাঠানোর ঠিকানা ঃ ১৪৯/১ই রাসবিহারী অ্যাভিনিউ, কলকাতা-৭০০০২৯। সরাসরি টাকা দিতে গেলে এই ঠিকানা ছাড়াও বিবেকানন্দ নিধি, ৯৯, কড়েয়া রোড, কলকাতা-১৯ ঠিকানায় যে কোন কাজের দিন বিকেল পাঁচটা থেকে সাড়ে সাতটার মধ্যে দেওয়া যাবে।

ঠিকানার পরিবর্তন হলে অন্ততঃ একমাস আগে জানাতে হবে।

Postal Regn No. WB/SC223
৫ম বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, সেপ্টেম্বর [illegible] Regn No. RN-41095/83

মানুষের একটা দিক আছে যেখানে বিষয়বুদ্ধি নিয়ে সে আপন সিদ্ধি খোঁজে। সেইখানে আপন ব্যক্তিগত জীবযাত্রা নির্বাহে তার জ্ঞান, তার ধর্ম, তার রচনাশক্তি একান্ত সার্থক। সেখানে সে জীবরূপে বাঁচতে চায়।

কিন্তু মানুষের আর একটা দিক আছে যা এই ব্যক্তিগত বৈষয়িকতার বাইরে। সেখানে জীবনযাত্রার আদর্শে যাকে বলি ক্ষতি তাই লাভ, যাকে বলি মৃত্যু, সেই অমরতা। সেখানে জ্ঞান উপস্থিত প্রয়োজনের সীমা পেরিয়ে যায়, কর্ম স্বার্থের প্রবর্তনাকে অস্বীকার করে। সেখানে আপন স্বতন্ত্র জীবনের চেয়ে যে বড়ো জীবন সেই জীবনে মানুষ বাঁচতে চায়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সম্পাদনা, প্রকাশনা ও মুদ্রণ : স্বামী মুক্তিকামানন্দ। যুক্ত সম্পাদক – লিপিকা গাঙ্গুলী।
বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা ১৫ টাকা। প্রতি কপি ১ টাকা ৫০ পয়সা
বিবেকানন্দ নিধি, ৮৬এফ, মনোহরপুকুর রোড, কলিকাতা ২৯
এবং ৯৯, কড়েয়া রোড, কলিকাতা-১৯, টেলিফোন ৪৪-৪৮১৩,
পাপাই প্রিন্টার্স ২৩৭, এন.এস.সি বোস রোড, কলিকাতা-৪৭
হইতে মুদ্রিত।

বোধসী

৩য় বর্ষ ।। ১০ম সংখ্যা ।। অক্টোবর ১৯৮৭

জগতে সমুদয় ধনরাশির চেয়ে 'মানুষ' হচ্ছে বেশী মূল্যবান

—স্বামী বিবেকানন্দ

বিবেকানন্দ নিধি ও ইনষ্টিট্যুট অফ ভ্যালু ওরিয়েন্টেশন এ্যাণ্ড
এনভায়রনমেন্টাল এডুকেশন-এর মাসিক মুখপত্র

সূচীপত্র

বিজ্ঞান ও মূল্যবোধ ১৪৫

মূল্যবোধ ও আমরা ১৪৬

বোধ ও ব্যাপ্তি

—শ্রীমতী শুক্লা সরকার ১৪৮

মূল্যবোধ এবং পরিচালনশৈলী (Management) ১৫০

নিধির খবর ১৫২

ছোটদের বিভাগ :

বিজ্ঞান

জানবার কথা ১৫৩

মৌমাছির নাচ ১৫৪

তুমি কি করবে ?

—স্বামী যুক্তানন্দ ১৫৫

শ্রদ্ধা

—দেবশ্রী ১৫৭

রোদসী

৫ম বর্ষ ॥ ১০ম সংখ্যা ॥ অক্টোবর ১৯৮৭

বিজ্ঞান ও মূল্যবোধ

[১০]

বিজ্ঞান বলে প্রকৃতির একটা ছন্দ আছে। বিশৃঙ্খলভাবে প্রকৃতির কিছুই চলেনা। নিয়ম মেনে সকাল হয়, সন্ধ্যা নামে, জোয়ার ভাঁটার টানাপোড়েন চলে। মহাবিশ্বে প্রকৃতির যে বিরাট নৃত্য চলেছে তারই তালে তালে মহাকাশে সূর্যের বিভিন্ন রশ্মির প্রকোপে কত নতুন শক্তিকণার সৃষ্টি, কত শক্তিকণার লয়, কত আণবিক পারমাণবিক পরিবর্তন, সৃষ্টি স্থিতি লয়ের আবর্তন।

প্রকৃতির নৃত্যের তালে জীবজগৎও স্পন্দিত হয়। জীবের শরীরে লাগে ঢেউ। মানুষের শারীরিক ক্রিয়াকলাপও নিয়ন্ত্রিত হয় একটা ছন্দে। আমাদের প্রশ্বাস গ্রহণের একটা ছন্দ আছে, ছন্দ আছে নিশ্বাস ত্যাগেরও। মানুষের মস্তিষ্কের কার্যক্রমও চলে পর্যায়-ক্রমে। খিদে পায় একটা নিয়ম মেনে। শারীরিক কার্যকলাপ খেয়ালখুশী মতো চলেনা।

শরীরের অবস্থার সঙ্গে মানুষের মূল্যবোধ জড়িত। অর্থাৎ শরীরের ছন্দের সঙ্গে মানুষের মূল্যবোধ সম্পর্কিত। এই ছন্দ পরিবর্তন হলে মানুষের মূল্যবোধ যে পাল্টে যায় তা আমরা অনুভব করি।

শরীরের ছন্দ আবার নির্ভর করে প্রকৃতির ছন্দের ওপর। বিশেষ করে পৃথিবীর দৈনন্দিন আবর্তনের ওপর, চাঁদের মাসিক পৃথিবী পরিক্রমার ওপর আর পৃথিবীর বার্ষিক সূর্য পরিক্রমার ওপর।

তাহলে আমরা দেখছি যে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে আমরা ইকলজি বা আমাদের সার্বিক পরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন নই। ইকলজির সঙ্গে আমাদের নাড়ীর সম্পর্ক। আমরা ইকলজির অংশ—ইকলজির অন্যান্য অংশের সঙ্গে আমরা ওতপ্রোত ভাবে যুক্ত। আমরা অবিচ্ছিন্ন।

অবিচ্ছিন্নতা মূল্যবোধের মূলকথা।

মূল্যবোধ ও আমরা

[Value Orientation এ প্রকাশিত 'values and ourselves' অনুসরণে]

—পূর্বপ্রকাশিতের পর—

ধর্ম (মত) নিরপেক্ষতা [Secularism]

ধর্মনিরপেক্ষতা প্রকৃতপক্ষে আধ্যাত্মিকতারই প্রতিফলন – এই দৃষ্টিভঙ্গীতে আমরা ধর্মনিরপেক্ষতার মূল্যবোধের সঙ্কীর্ণতাকে দূর করতে পারি। প্রচলিত ধর্মমত ও ধর্মনিরপেক্ষতাকে পরস্পর বিরোধী মনে করার বা বিচ্ছিন্নভাবে দেখার কোন কারণ নেই। সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী কাজ করলে তবেই আমরা সমাজবিজ্ঞান ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানকে সামাজিক গঠনের অঙ্গ হিসেবে বুঝতে পারব। ধর্মীয় মূল্যবোধ ও প্রেরণা যথাক্রমে সর্বজনীন সংস্কৃতি ও ব্যক্তিচরিত্রের উপাদান। কিন্তু ধর্মনিরপেক্ষতার মূল্যবোধ উপলব্ধির জন্য রাজনীতি, অর্থনীতি, স্তরবিন্যাস প্রভৃতি সমাজের বিভিন্ন দিকের প্রেক্ষাপটে ধর্মনিরপেক্ষতার আলোচনা প্রয়োজন।

ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা শিক্ষার্থীদের নিজের আত্মা সম্পর্কিত জিজ্ঞাসা থেকে দূরে রাখার চেষ্টা করে তাই এই শিক্ষা মানবীয় ধারণার আত্মীকরণ থেকে মূলতঃ আলাদা থাকে। সেইজন্য যা মানবসমাজের মূলকেন্দ্র এবং সামাজিক গঠনকে ধরে রাখতে সাহায্য করে সেই আবেগ সংক্রান্ত কোন ক্ষেত্রে ধর্মনিরপেক্ষতা কোন মূল্যবোধের সন্ধান দিতে পারেনা। অপরপক্ষে ধর্মের সঙ্গে পারিবারিক বন্ধনের সম্পর্ক নিবিড়। মানুষের নির্দিষ্ট যৌন আচরণ গড়ে ওঠা বা নবজাতকের আহ্বানেরই নামান্তর। যদি ধর্মীয় আচরণকে নিরুৎসাহিত করা, থামিয়ে দেওয়া বা বাধা দেওয়া হয় তবে তা সততা, ক্ষমাশীলতা, নাম বা সামাজিক প্রতিষ্ঠাও নির্দিষ্ট হয় ধর্মীয় সাংস্কৃতিক মাধ্যমে। মায়ের গর্ভসঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গেই প্রত্যেকে সমাজে গৃহীত হয় গোষ্ঠীর ধর্মীয় সংস্কৃতির মধ্য দিয়ে। মানবসমাজের এই দিকটি এতই গুরুত্ব ও তাৎপর্যপূর্ণ যে এর ভার পরিবর্তনশীল রাষ্ট্রযন্ত্র, ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা

বা কোন সামাজিক দলের ওপর ছেড়ে দেওয়া হয়নি। আমাদের সামাজিক চরিত্রের এই মৌল আদর্শ বা গুণকে কোন সম্ভাবনার ওপর ছেড়ে না দিয়ে একে ধর্মীয় ব্যবস্থার অঙ্গীভূত করে নেওয়া হয়েছে। এই ব্যবস্থা মানবিক সম্পর্ককে সমাজের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে গড়ে তুলতে সাহায্য করেছে। পরিবারের কুলদেবতা, পূর্বপুরুষদের পূজা করা এবং মূল্যবোধ ভিত্তিক পারস্পরিক সম্পর্ক ও ব্যবহারকে এই ব্যবস্থার সঙ্গে তুলনা করা যায়। ধর্মীয় বিধিগুলি এভাবেই চিরস্থায়ী হয়েছে। উপযুক্ত পরিবর্ত ব্যবস্থা খুঁজে না পাওয়া পর্য্যন্ত এই ব্যবস্থার বিলোপ ঘটিয়ে ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা প্রচার করলে তা যে মূল্যবোধের তাড়নায় পারস্পরিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে সেক্ষেত্রে নৈরাজ্য আনবে ফলে পারিবারিক জীবনও বিধ্বস্ত হয়ে পড়বে। আমাদের সমাজে বিবাহও সমাজজীবনের ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে যুক্ত কাজেই ধর্মনিরপেক্ষ মূল্যবোধের তাড়নায় পারিবারিক বন্ধন ছিন্ন হয়ে যেতে পারে।

এই প্রসঙ্গে একথা জোর দিয়ে বলা যায় যে ব্যবহারিক দিক থেকেও ধর্মের সামাজিক মূল্যবোধকে ধর্মনিরপেক্ষতার মূল্যবোধ দিয়ে প্রতিস্থাপন করা যায়না। মূল্যবোধ আলোচনা প্রসঙ্গে যখন আমরা ক্রিয়ামূলক শক্তি হিসেবে গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা নিয়ে আলোচনা করেছি তখন ঐসব মূল্যবোধের তাড়নার পরিণতি সম্বন্ধেও সচেতন হয়েছি। ক্রিয়ামূলক তত্ত্ব সবসময়ই কার্য কারণের অর্থ এবং পরিবর্তনকে একসঙ্গে দেখে। সুতরাং শিক্ষাক্ষেত্রে ধর্ম নিরপেক্ষতাকে চরম হিসেবে মনে করা গোঁড়ামি এবং অন্ধবিশ্বাসকে আহ্বানেরই নামান্তর। যদি ধর্মীয় আচরণকে নিরুৎসাহিত করা, থামিয়ে দেওয়া বা বাধা দেওয়া হয় তবে সততা, ক্ষমতাশীলতা, ধৈর্য, শ্রদ্ধা, ভালোবাসা ইত্যাদি মানবিক গুণাবলী বিকাশের পরিপন্থী হয়ে দাঁড়াবে।

অবশ্য ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা বিজ্ঞান (exact science) এবং প্রযুক্তিবিদ্যা শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় শক্তি জোগায়। অপরপক্ষে ধর্মীয় শিক্ষা মূল্যবোধ জাগিয়ে তুলতে সহায়তা করে যা মানবিক

[শেষাংশ ১৪৮ পৃষ্ঠায়]

বোধ ও ব্যাপ্তি

শ্রীমতী শুক্লা সরকার
[গবেষিকা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়]

বুঝলে আমি তোমাদের ঐ প্রেম, মূল্যবোধ, সংস্কৃতি এইসব থেকে সদা শতহস্ত দূরে। বুঝলে ? কেননা তোমাদের প্রেমের এত রূপ দেখেছি, এ—ত রূপ দেখেছি যে আমার রাধাভক্তি বাপ্ বাপ্ বলে পশ্চাদ্ প্রদর্শন করেছে বহুকাল। আর তোমাদের প্রেম ? সে তো শুধু ওষ্ঠে—হৃদয়ে পিং পং বলের লাফালাফি। তোমাদের প্রেম তড়িঘড়ি জামা বদলায়। কালিদাস, ভর্তৃহরি কিম্বা শেক্সপীয়রের সে ভাবের রাখঢাক কিছু কি আর রেখেছ ? অবশ্য জমানাং বদলেছে। আগে প্রেম মহিমা (বইতে পড়েছি) নরলোক থেকে দেবলোকে ধাইত, আর এখন ? নরলোক থেকে নরকলঙ্কে গড়িয়ে পড়ছে। শুধু একটা 'ক' এর যা তফাৎ। এই তো তোমার মূল্যবোধ ? মুখে আবার বড় বড় কথা। এখন প্রেম কথাটা ঠিকই আছে শুধু ভাবের ফ্রেমটা গেছে বদলে। বলবে হয়তো—আরে দেখুন না মশায় এসেছি দুদিনের তরে। কবিবরের সেই কথাটা পড়েছেন না—ঐ যে 'সকলের তরে সকলে আমরা প্রত্যেকে আমরা পরের তরে' ? হেঁঃ হেঁঃ বুইলেন না এই আর কি। একটু আনন্দ একটু অম্ল করা আর কি। ঐ দেকচেন না পণ্ডিতমশাই, ঐ যে

[মূল্যবোধ ও আমরা-র শেষাংশ]

গুণাবলীর উন্নয়নমূলক কাজে মানুষকে প্রেরণা দেয়। ধর্ম যে মূল্য বোধ জাগ্রত করে তার ফলে নিজস্ব ক্ষমতার বিকাশ ও সামাজিক পরিবর্তনের মনোবৈজ্ঞানিক ভিত্তি সম্বন্ধে ধারণা করা সহজ হয়। ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করতে উৎসাহিত করে এবং তার ন্যায্যতা প্রতিপাদন করে। ধর্মীয় শিক্ষা আধ্যাত্মিক এবং ব্যক্তিগত বিকাশকে সূচিত করে। ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা ধর্মীয় শিক্ষা দেখে জ্ঞান অভিমুখী হতে পারে এবং অর্থসম্পন্ন হয়ে উঠতে পারে।

[ক্রমশঃ]

গো ঝাঁড়ুযোর কতা বলচি—দিনেরবেলায় তো ঠিক পুজো আচ্চা নিয়ে থাকে, রেতের বেলায় সারা দিনমানের খাটুনির পর বড় তরফের নাত-বউ এর সেবা না হলি তো ওঁয়ার মেজাজ ঠিক থাকে না। হেঁঃ হেঁঃ।

—আরে ওসব ছোটলোকের কথায় কান দেবেন না। শুনুন আমার কাছে তবে বুঝবেন—কোথায় আছি আমরা। 'গীতগোবিন্দে' রাধার বিরহভরে কি করুণ বিলাপ বর্ণনা। রাধা বলছে 'হরিরিতি হরিরিতি জপতি সকাময়'- আর ওদিকে কৃষ্ণের রাধাবিহনে কাতরতা —'কিং ধনেন কিং জনেন কিং মম সুখেন গৃহেন' - এই প্রেমকে সকাম বলে ব্যাখ্যা করে ঐ প্রফেসর চক্কোত্তি কি ছাইপাঁশ যে ছাত্র-ছাত্রীদের বোঝাচ্ছে। আমার মেয়েটার মাথাটাই দিয়েছে বিগড়ে। আমি মেয়েকে যত বলি—'নারে, এ বোঝার হেরফের। যে যেমন দৃষ্টি নিয়ে জগৎ দেখে। সবার মূল্যবোধ কি একরকম হয়? কে আর কার বোঝে—কার শোনে? এই তো অবস্থা।

—মূল্যবোধের কথা যখন তুললেনই তখন আর চুপ করে থাকতে পারলাম না। শুনুন এ আমার বাড়ীর ব্যাপার, একেবারে ঘরের ভিতরকার। আমার ভাইঝি রুচিকে তো দেখেছেন। ভাবতাম অমন ভালো মেয়ে আর হয়না। তা একদিন সকালে আমি বেরোচ্ছি এমন সময় পাড়ার ছেলে সুনন এসে যা বলল তাতে তো রক্ত গরম হয়ে উঠল। রুচি নাকি আউট্রাম ঘাটে এক দঙ্গল ছোঁড়ার সঙ্গে কি কাণ্ড সব করেছে। জিজ্ঞাসা করতেই অতীব ভালোমানুষের মতো—না কাকা ওরা ভুল দেখেছে। আমি কখনো ওসব জায়গায় গেছি বলো? নাকি আমি ওদের চিনি? রুচির মা অর্থাৎ বৌদির কানে একথা যেতেই উনি বন্ধ ঘরে নানা ভাবে জিজ্ঞাসা করে মেয়ের কাছ থেকে কথা বার করার চেষ্টা করলেন। অবশেষে দুচার ঘা দেবার পর রুচি যা বলল—আমি নিজে কানে শুনেছি মশাই নাহলে বিশ্বাসই করতাম না—বলল যে, আমিই নাকি ওকে বহুবার আউট্রাম ঘাটে যেতে বলেছি কিন্তু সে যায়নি। আবার মাকেও বলতে পারেনি লজ্জায়, কারণ শত হলেও কাকা তো। আমি তো শুনে দুঃসহ যন্ত্রণায়

(শেষাংশ ১৫০ পৃষ্ঠায়)

মূল্যবোধ এবং পরিচালনশৈলী (Management)

ম্যানেজাররাও মূল্যবোধ সন্ধানী। ম্যানেজারিয়াল এফেকটিভনেস বিদ্বৎজনের আলোচনার বিষয়বস্তুর মধ্যে স্থান পেতে শুরু করেছে। এমনকি সন্ন্যাসীরাও এখন এবিষয়ে আলোচনা শুরু করেছেন। তাঁদের মতে আধ্যাত্মিক সচেতনতা এবং ঐতিহ্যগত উত্তরাধিকার গুণগত উন্নতি ঘটাতে সক্ষম যদি ম্যানেজমেণ্ট স্তরের সমস্ত লোকেদের দৃষ্টিভঙ্গীতে পরিবর্তন আনা যায়।

মোদিনগরের সেণ্টার ফর ম্যানেজমেণ্ট ডেভেলপমেণ্ট-এ (CMD) ২৪শে আগষ্ট, 'সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য মূল্যবোধ', 'উন্নততর পরিবর্তনের জন্য মূল্যবোধ,' এবং বিচ্ছিন্নতার বিরুদ্ধে লড়াইএর জন্য মূল্যবোধ' এই কয়টি বিষয় বিশদভাবে আলোচনা করেন স্বামী

[বোধ ও ব্যাপ্তির শেষাংশ]

হতবাক। সেদিন থেকে তো ও বাড়ী ছেড়েইছি, আর ভাবছি মশাই সমাজটা যাচ্ছে কোথায়? শ্রদ্ধা বিশ্বাস যে ক্রমশঃ দৈব শব্দ হয়ে যাচ্ছে। পরস্পর নির্ভরতা একেবারে লোপ পেয়ে যাচ্ছে। আমাদের আত্মলালসা এতই বাড়ল যে জীবনের শেষ মূল্যবোধটুকুও খুইয়ে দিতে বসেছি!! আজকাল মনে হয় এ লজ্জার দায়িত্ব রুচির নয়— আমার, রুচির এবং ওর বাবা মার। কারণ ভালো স্কুলে পড়ানো আর কেতাদুরস্ত হতে হবে এ শেখানো ছাড়া 'এ হিন্দুস্তাঁ' এর দীদ কে ওরা জানলো না। চরিত্র তো শুধু দেহে নয় চরিত্রের বাস মনেও। সে মন যদি স্বচ্ছ আরে রাখতে তবে তাকে সেই অতি শিশুকাল থেকেই শেখাতে হত। এরা হেরোইন, ম্যানড্রেকসে আসক্ত হয়ে তুলা মূলা উদ্দেশ্য ভুলেছে, আর এদিকে প্রায় উন্মত্ত আমি খালি ভাবছি প্রাগৈতিহাসিক সেই ভীষণ মারাত্মক প্রাণী তিরানোসেরাসের দীর্ঘশ্বাস কি এ কোটি বছর পরেও ওদের মধ্যে ক্ষয় রোগের বাসা বেঁধেছে? এদের মুক্তির বীজ শুভ্রতা নিয়ে কবে দ্বন্দ্বহীন আকাশে পেঁজাতুলোর মতো পায়রার শুভ্রতায় ডানা মেলবে!!!

যুক্তানন্দ। আলোচনা প্রসঙ্গে একটি অধিবেশনে তিনি চাপমুক্ত অবস্থা সৃষ্টির জন্য একটি অনুশীলন দেখিয়ে দেন এবং নির্দেশ দেন। তিনি বলেন তখনই একজন মানুষের কর্মক্ষমতা বাড়তে যখন সে সবরকম চাপ থেকে মুক্ত হবে। এই চাপমুক্ত হবার জন্য বিভিন্ন ধরণের মাদকের আশ্রয় না নিয়ে অনুশীলনের মাধ্যমেও হওয়া যায়। এবং এর ফলে শুধু যে স্বাস্থ্যের উন্নতি হবে তাই নয় মানসিক অবস্থারও গুণগত উন্নয়ন হবে।

দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের এমেরিটাস অধ্যাপক এবং বিবেকানন্দ নিধির অ্যাকাডেমিক অ্যাডভাইসরি কাউন্সিলের সদস্য ডঃ এ দাশগুপ্ত সব কটি অধিবেশনেই উপস্থিত ছিলেন এবং বিষয়টিকে তিনিই উপস্থাপিত করেন। তিনি CMD-র প্রতিষ্ঠাতাদের একজন। CMD-র ডিরেক্টর অধ্যাপক গুরুনানী, ম্যানেজমেন্ট ও কনসালটেন্সীর ডিরেক্টর ড টি এন রাস্তোগী এবং ফ্যাকাল্টীর সদস্য ও অন্যান্য কার্যনির্বাহকেরা বিভিন্ন অধিবেশনে ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে যোগ দেন। তাঁদের সকলের প্রশ্ন আলোচনাকে সমৃদ্ধতর করে তোলে।

মোদি গ্রুপ অফ ইণ্ডাস্ট্রীজ এর কার্যনির্বাহকদের জন্য মোদি অ্যালক্যালিজ অ্যাণ্ড কেমিক্যালস লিমিটেড এ মূল্যবোধ এবং পরিচালনশৈলী নিয়েও স্বামী যুক্তানন্দ আলোচনা করেন ২৫শে আগষ্ট। ডঃ এ দাশগুপ্ত এবং বিবেকানন্দ নিধির ভাইস প্রেসিডেন্ট ডঃ ডি কে মোদি অন্যান্যদের সঙ্গে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন।

ফাউণ্ডেশন অর অর্গানাইজেশনাল রিসার্চ (FORE), মোদিনগরের সেন্টার ফর ম্যানেজমেন্ট ডেভেলপমেন্টের সহায়তায় মূল্যবোধ বিষয়ক একটি আলোচনাসভা আয়োজন করেন ২৫শে আগষ্ট নতুন দিল্লীর যশবন্ত প্লেসে। স্বামীযুক্তানন্দ, ডঃ এ দাশগুপ্ত এবং IAAI এর চেয়ারম্যান ও বিবেকানন্দ নিধির ভাইসপ্রেসিডেন্ট, FORE এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ডঃ এন কে সিং FORE এর সদস্যদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন।

[শেষাংশ ১৬০ পৃষ্ঠায়]

নিধির খবর

হলদিয়ার সেণ্ট জেভিয়ার্স স্কুলের আমন্ত্রণে ১২ই সেপ্টেম্বর স্কুলের উচ্চশ্রেণীর ছাত্রদের জন্য একটি মূল্যবোধের ধাঁধার আসর পরিচালনা করেন স্বামী মুক্তানন্দ এবং বিবেকানন্দ নিধির গবেষিকা কর্মী শ্রীমতী পূর্ণিমা সেন। মূল্যবোধের ধাঁধা মূল্যবোধ সংক্রান্ত আলোচনার ক্ষেত্রে বিবেকানন্দ নিধির নতুন সংযোজন, যা বয়স নিরপেক্ষভাবে সকলকে বিচার করতে সাহায্য করে। এ পর্যন্ত যে কয়টি মূল্যবোধের ধাঁধার আসর অনুষ্ঠিত হয়েছে প্রত্যেকটির ফলই উৎসাহব্যাঞ্জক। এই আসরে আলোচনার উপযুক্ত সমস্যাবলীর উদ্ভাবন যোগদানকারীরা নিজেরাই করতে পারেন। এই ধরণের আলোচনা মুক্ত চিন্তা করতে সহায়তা করে।

*

ঝাড়গ্রামের শ্রীরামকৃষ্ণ সারদাপীঠ (কন্যা গুরু কুল) স্কুলে বিবেকানন্দ নিধির পরিচালনায় একটি তিনদিন ব্যাপী মূল্যবোধ বিষয়ক শিক্ষাক্রম অনুষ্ঠিত হয় ১৯-২১শে সেপ্টেম্বর। এই শিক্ষাক্রমে মূল্যবোধ সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে যাঁরা আলোচনা করেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন স্বামী মুক্তানন্দ, ডঃ অমিয় কুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীমতী লিপিকা গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীঅনির্বাণ বসু প্রমুখ। শিক্ষাক্রমে অংশগ্রহণ করেন স্কুলের নবম ও দশম শ্রেণীর ৮৩ জন ছাত্রী।

মূল্যবোধ সচেতনতাকে কিভাবে পাঠক্রমের অঙ্গীভূত করা যায় তা কয়েকটি ক্লাস নিয়ে ব্যাখ্যা করেন স্বামী মুক্তানন্দ। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য এই ধরণের ক্লাস এবার নিয়ে ঝাড়গ্রামে মোট ছবার আয়োজিত হল। তিনি গভর্ণমেণ্ট গার্লস হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুলেও মূল্যবোধ নিয়ে আলোচনা করেন ও সেখানে মূল্যবোধের ধাঁধার আসর পরিচালনা করেন।

*

ডন বস্কো অর্গানাইজেশনের মিশনারীরা 'রিলিজিয়সিটি

[শেষাংশ ১৫৯ পৃষ্ঠায়]

বিজ্ঞান

কম্প্যুটারে কারসাজি

কম্প্যুটার এখন সব কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে আমাদের সুবিধের জন্য। কম্প্যুটারে কাজ খুব তাড়াতাড়ি হয়, কম্প্যুটার অচল না হলে ভুল করে না। কম্প্যুটারের মেমারিতে অনেক তথ্য ধরে রাখা যায় এবং প্রয়োজন হলে আবার মুহূর্তের মধ্যে সেই তথ্য কম্প্যুটারের কাছ থেকে জেনে নেওয়া যায়। আধুনিক অফিসে এখন আর কাগজের ফাইল রাখা হয়না কেননা ফাইল খোঁজা একটা খুব অসুবিধের ব্যাপার এবং এতে সময়ও অনেক বেশী লাগে। এখন একটা অফিসের সব ফাইলের যাবতীয় তথ্য কম্প্যুটারে রেখে দেওয়া হয়। যে কোন অফিস এক্সিকিউটিভ কম্প্যুটারে চাবি টিপে প্রয়োজনীয় তথ্য জেনে নিতে পারেন। ব্যাঙ্কিং সার্ভিসে কম্প্যুটার খুব গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে। ক্রেডিট কার্ড দেখিয়ে এখন ব্যাঙ্কের কম্প্যুটার থেকে দিনে রাতে যে কোন সময়ে টাকা তোলা যায়। কিন্তু এই কম্প্যুটার যদি কোন অসৎ মানুষের হাতে পড়ে তাহলে কি হয়?

আমেরিকার একটি ব্যাঙ্কের একজন কর্মচারী কম্প্যুটারে এমন একটা প্রোগ্রাম করে দিয়েছিলেন যাতে সেই ব্যাঙ্কের প্রতিটি অ্যাকাউন্ট থেকে দশ সেন্ট করে কাটা হয়ে তা ঐ ব্যাঙ্কের শেষ-অ্যাকাউন্টটিতে জমা পড়বে। এই শেষ অ্যাকাউন্টটি ছিল ঐ কর্মচারীটির। ঐ ভদ্রলোক নিজের নাম পাল্টে অন্য নামে ঐ অ্যাকাউন্ট খুলেছিলেন। নামটির প্রথম অক্ষর ছিল z। কেননা z দিয়ে এমন কারো ঐ ব্যাঙ্কে অ্যাকাউন্ট ছিলনা। ভদ্রলোকের অ্যাকাউন্টে এইরকম জমা বহুদিন ধরে পড়েছে এবং ব্যাঙ্কের সমস্ত অ্যাকাউন্ট থেকে প্রতি মাসে দশ সেন্ট করে কেটে নেওয়াতে এই জমার পরিমাণ হয়ে গিয়েছিল বিশাল। কিন্তু দিন তো আর একই থাকেনা। হঠাৎ মিস্টার Zydel বলে একজন ঐ ব্যাঙ্কে অ্যাকউন্ট খুললেন।

জানবার কথা

মৌমাছির নাচ

সাধারণতঃ নাচ জিনিসটা আনন্দের। মৌমাছিও আনন্দে নাচে, তবে তাদের নাচের পেছনে একটা উদ্দেশ্য থাকে।

মৌমাছিরা যখন খাবার সন্ধানে বার হয় তখন প্রথমেই সব মৌমাছি বেরোয় না। কয়েকজন বেরোয়, বেশীর ভাগ থাকে তাদের বাসায়। যারা খাবারের সন্ধানে বেরোয় তারা সন্ধান নিয়ে ফিরে এসে নাচতে থাকে ওপর নীচ করে। তখন অন্যান্যরা ওদের অনুসরণ করে নাচতে আরম্ভ করে। তারপর তারা একসঙ্গে মৌচাক ছেড়ে বেরোয় ও আগের মৌমাছিদের পেছনে পেছনে যেতে থাকে। যে মৌমাছিগুলো আগে নাচতে নাচতে যায় তারা তাদের সঙ্গীদের দিক ও খাবারের জায়গা নির্দেশ করে। মৌমাছিদের নাচও বিভিন্ন রকমের হয়। যদি তারা গোল হয়ে নাচে তাহলে বোঝা যায় খাবার তাদের মৌচাকের খুব কাছাকাছি আছে। যে মৌমাছিরা আগে যায় তারা শুধু খাবারের সন্ধানই নিয়ে আসেনা, কিছু মধু খেয়েও আসে। ফলে তাদের শুঁড় থেকে মধুর গন্ধ বেরোয়। আর ঐ গন্ধ শুঁকে অন্যান্য মৌমাছিরা বুঝতে পারে কোন ফুল থেকে মধু খাওয়া হয়েছে। মৌমাছিদের আর এক রকমের নাচ আছে যাকে ইংরেজীতে বলে Wagging Dance। এই নাচ বোঝায় যে খাবার ১০০ গজেরও বেশী দূরে আছে।

তবে সকাল থেকে বিকেল অবধি সূর্যের স্থান পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মৌমাছিদের নাচের ভঙ্গিমারও পরিবর্তন হয়। যদি

(বিজ্ঞানের শেষাংশ)

কিছুদিন পরে তিনি হঠাৎ দেখলেন তাঁর অ্যাকাউন্টে টাকা কি করে যেন বেড়ে গেছে। অথচ তিনি এর মধ্যে কোন টাকা জমা দেননি। ভদ্রলোক খুব সৎ ছিলেন। তিনি ব্যাঙ্কে গিয়ে এই টাকা বেড়ে যাবার কারণ খুঁজতে লাগলেন আর তাতেই ধরা পড়ল কম্প্যুটারে কারসাজি।

তুমি কি করবে ?

স্বামী মুক্তানন্দ

(১৫)

রঞ্জনের দাদা পড়াশুনো শেষ করে খুব ভালো একটা চাকরী পেয়েছে। ওর নতুন বন্ধু বান্ধবরা প্রায়ই বাড়ীতে আসে। ওরা বাইরের ঘরে বসে অনেকক্ষণ গল্প করে চলে যায়। ওরা চলে যাবার পর দাদাকে রঞ্জনের খুব স্বাভাবিক লাগেনা। দাদার মেজাজ আজকাল খুব খিটখিটে হয়েছে। খুব ভুলে যায় আর বন্ধুদের আসবার জন্যে সন্ধোবেলায় খুব উদগ্রীব হয়ে বসে থাকে, বাড়ীর কোন কাজ থাকলে ওকে সেই কাজে পাঠানো যায় না। দাদার বন্ধুরা চলে যাবার পর রঞ্জন একদিন একটা ছেঁড়া কোন ট্যাবলেটের প্যাকেট ঘরে পেয়েছিল আর বাবাকে দেখিয়েছিল। বাবা বুঝতে পেরেছিলেন ঐ ট্যাবলেট দাদা বন্ধুদের সঙ্গে খায় আর সেই জন্য দাদাকে খুব বকেছিলেন। আর ব্যাপারটা রঞ্জন বাবাকে জানাবার জন্য দাদা রঞ্জনকে খুব মেরেছিল, তাতে রঞ্জনের মনে হয়েছিল—

(জানবার কথার শেষাংশ)

মৌমাছিরা নাচতে নাচতে সোজা ওপরের দিকে ওঠে তাহলে বুঝতে হবে খাবার সূর্যের দিকে। আর নাচ যদি নীচের দিক নির্দেশ করে তাহলে খাবার সূর্যের উল্টোদিকে বোঝায়। সূর্যের দিকে সরাসরি না উঠে সূর্যের বাঁদিকে ৬০ ডিগ্রী কোণে ঠেলে ওঠে তবে বোঝা যায় খাবার সূর্যের বাঁদিকে ৬০ ডিগ্রী দূরে আছে।

আবার নাচের গতি দেখেও খাবারের জায়গার দূরত্বটা বোঝা যায়। যদি পনেরো সেকেণ্ডে দশবার নাচে তাহলে বোঝায় মৌচাক ও খাদ্যস্থলের দূরত্ব ১০০ গজ। আর পনেরো সেকেণ্ডে একবার নাচা মানে খাদ্যস্থল ১০,০০০ গজ দূরে। অর্থাৎ খাবারের জায়গা কাছে হলে মৌমাছিরা খুব তাড়াতাড়ি নেচে যায়, আর দূরে হলে নাচের গতি কমিয়ে ফেলে।

দাদা নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছে তাই যা খুশী করতে পারে।

দাদা যতই বড় হোকনা কেন বাবার দাদাকে শাসন করা উচিত।

রঞ্জন বাবাকে ট্যাবলেটের কাগজটা দেখিয়ে কোন অন্যায় করেনি কেননা দাদারা নিশ্চয়ই ভালো কোন কাজ করছিল না।

দাদাদের ব্যাপারে নাক না গলিয়ে রঞ্জনের ভালো থাকা উচিত ছিল।

(১৬)

বাড়ীতে বহুদিন রান্নার গ্যাস নেই। বিরক্ত হয়ে ছোটকাকা সেদিন রাস্তা থেকে বেশী পয়সা দিয়ে অন্য বাড়ীর গ্যাস নিয়ে আসে। তাতে টুম্পা ভেবেছিল—

অনেকদিন পরে মার রান্নার ঝামেলা মিটল।

বেশী পয়সা দিয়ে জিনিস কিনলে কালোবাজারিকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়।

পাড়ার সবাই এখন এইভাবেই গ্যাস জোগাড় করছে। সুতরাং ছোটকাকা ঠিকই করেছে।

সবাই অন্যায় করে যে কাজ করে আমাদেরও সেটাকেই অনুসরণ করতে হবে তার কোন মানে নেই।

(১৭)

মা সেদিন পিন্টুর স্কুলের ব্যাগে নতুন একটা পেনসিল কাটা কল দেখলেন যেটা পিন্টুর নয়। পিন্টু ওটা কোথা থেকে পেয়েছে জিজ্ঞেস করাতে বোঝা গেল যে ওটা অন্য কোন ছেলের। পিন্টু ওটা চুরি করে এনেছে। পিন্টু কিন্তু তা মোটেই স্বীকার করতে চায়নি আর সেইজন্যে মার কাছে খুব বকুনি খেয়েছে। রাগ করে পিন্টু মাকে বলল—

তোমরা তো আমাকে এত ভালো জিনিস দিতে পার না তাই আমি নিয়ে নিয়েছি।

সঞ্জীবের অনেকগুলো পেনসিল কাটা কল আছে, আমার নেই তাই আমি ওটা না বলে নিয়ে কোন অন্যায় করিনি।

[এর শেষাংশ ১৫৯ পৃষ্ঠায়]

শ্রদ্ধা

দেবশ্রী

মেয়েটা স্কুল থেকে ফিরল একরাশ অন্ধকারে মুখ ঢেকে। স্নেহাতুরা মা উৎকণ্ঠিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—হ্যাঁরে অনু কি হল তোর? মেয়ে উত্তর দেয় ও কিছু নয় মাথাটা একটু ধরেছে। মা আর কিছু বলতে সাহস পাননা। মনে ভাবেন মেয়ে বড় হচ্ছে, ওর মনের তলও আর খুঁজে পাচ্ছেন না যেন।

নিজেকে আজ খুব অপমানিত মনে করেছে অনামিকা। তার বাবা নেই আর্থিক, স্বচ্ছলতাও না। সে যদি রুমিদের মতো সঙ্গতি সম্পন্ন হত, কোন নাম করা শিল্পীর কাছে তালিম নিতে পারত তাহলে মীরাদি তাকেও আলাদা মূল্য দিতেন। তবে কি তার আগ্রহ, নিষ্ঠা সবই মূল্যহীন? নিঃশব্দ কান্নায় বালিশ ভিজে উঠল। কিন্তু এসব কথা মাকে বলে তাঁর দুঃখ বাড়াতে চাইলনা সে।

শহরের শেষ প্রান্তে আদর্শ উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়। অনেকটা পথ অনামিকাকে হেঁটে আসতে হয়। তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে স্কুলে পৌঁছাতেই প্রার্থনার ঘণ্টা পড়ে গেল। লাইন করে সবাই দাঁড়াবার পর, সমস্ত ছাত্রীদের মধ্যে অনামিকাকেই সেদিন প্রধানা শিক্ষিকা লতিকাদি বললেন গান শুরু করতে। কিন্তু অনামিকা হঠাৎই বেশ জোরের সঙ্গে বলে উঠল 'আমি পারব না'। লতিকাদি খুব অবাক হলেন কিন্তু তখন আর কথা না বাড়িয়ে অনামিকাকে আর কিছু না বলে নিজেই গান শুরু করলেন। প্রার্থনা শেষ হলে অনামিকাকে বললেন ছুটীর পরে দেখা করতে।

যথাসময়ে অনামিকা বড়দির কাছে গেলে তিনি সস্নেহে জিজ্ঞাসা করলেন—'অনামিকা, কেন তুমি গান গাইতে চাইলেনা? আর গাইবেনা কথাটা ভালোভাবে না বলে মুখের ওপর পারবনা বললে কেন?'

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে অবশেষে অনামিকা বলল—'রুমি প্রতিদিন গান শুরু করে। আমিও ওর সঙ্গে গাই। আমি প্রার্থনার

প্রতিটি গানই রুমির কাছ থেকে হারমোনিয়াম বাজিয়ে গাইতে শিখেছি। তাই গতকাল আমি নিজেই গান শুরু করতে গিয়েছিলাম। অথচ মীরাদি আমাকে সবার সামনে বললেন অনামিকা তুমি পারবে না, রুমিকে দাও। আমার খুব খারাপ লেগেছে। সকলের সামনে উনি আমাকে ওভাবে বললেন কেন? সেদিনই আমি ঠিক করে ফেলেছি আর কোন দিনও স্কুলে প্রার্থনার সময় গান গাইব না।'

লতিকাদি বললেন, 'তুমি যে এতবড় একটা প্রতিজ্ঞা করে ফেললে কিন্তু সেটা করার আগে একবারও জানার চেষ্টা করেছিলে কি কেন তোমাকে বারণ করা হয়েছিল?'

অনামিকা বলে উঠল 'না। এতে আবার ভাবার কি আছে? আমার কারও কাছে গান শেখার ক্ষমতা নেই তাই আমাকে গাইতে দেওয়া হয়নি। আমার বাবা নেই তাই আমাকে সবাই অবহেলা করে।'

লতিকাদি খানিকক্ষণ কিছু বললেন না। অনামিকার জমে ওঠা অভিমানকে সংযত হতে কিছুটা সময় দিলেন। তারপর বললেন, 'তুমি একটা ভুল ধারণা করে নিয়ে মিছিমিছি এত কষ্ট পেয়েছো। মীরাদি তোমাকে অপমান করার জন্য গান গাইতে বারণ করেন নি। উনি জানেন না যে তুমি যত্ন করে রুমির কাছ থেকে সব গান ভালোভাবে শিখেছ। তাই গান পরিচালনা করতে গিয়ে যদি না পারো তাহলে লজ্জায় পড়তে হবে। তোমাকে লজ্জায় না পড়তে দেবার জন্যই উনি তোমাকে বারণ করেছিলেন, তোমাকে অবহেলা করে নয়। তবে তোমার দুঃখ হওয়াটা খুবই স্বাভাবিক কিন্তু তাই জন্য তুমি শিক্ষিকাদের মুখের ওপর কথা বললে, বলতো এটা কি তোমার নিজের ওপর বিশ্বাস হারানো হল না? তুমি নিজে কি তোমার কাজকে সর্বান্তঃ করণে সমর্থন করতে পেরেছ? আর সব চেয়ে বড় কথা হল তুমি নিজেকে কত হীন ভাবলে? নিজের প্রতি শ্রদ্ধা, বিশ্বাস হারালে এটা কি ঠিক হল?'

অনামিকা তবুও তার অভিমান ভুলতে পারে না। বলে 'কিন্তু মীরাদি আমার সামর্থকে অগ্রাহ্য করেছেন। আর স্কুলে যাদের আর্থিক স্বচ্ছলতা আছে তাদেরই মূল্য বেশী দেওয়া হয়। আমার মতো সহায় সম্বলহীনের কোন স্থান নেই।'

লতিকাদি অনামিকাকে কাছে ডেকে ধৈর্য নিয়ে বলেন 'এটাও তোমার ভুল ধারণা। পড়াশুনো, আঁকা, সেলাই সবকিছুর জন্যই তুমি আমাদের গর্ব। তুমি ভুল বুঝে দুঃখ পেয়েছো। তোমাদের আমরা স্নেহ করি ভালোবাসি তা কিন্তু তোমাদের বাবা মার অবস্থার জন্যে নয়। এই স্নেহ আদায় করে নেয় তোমাদের কাজ আর ব্যবহার। আর শুধু ভালোবাসাই নয় তোমাদের মতকে আমরা শ্রদ্ধাও করি। শ্রদ্ধা ছাড়া শেখা, শেখানো কিছুই সম্ভব নয়, শ্রদ্ধাই জানার উপায়, তাই আগে নিজেকে শ্রদ্ধা করতে হবে, না হলে অপরকেও শ্রদ্ধা করতে পারবে না। তুমি যে ব্যবহার করলে তা শ্রদ্ধা করার মূল্য সম্বন্ধে অজ্ঞতার জন্যে করলে। এরপর থেকে পালা করে সবাই গান পরিচালনা করবে।'

অনামিকা বড়দির ঘর থেকে বেরলো যখন তখন মনটা ওর হালকা হয়ে গেল। খুশী মনে আজ সে পা বাড়ালো বাড়ীর দিকে।

[নিধির খবর এর শেষাংশ]

অফ দ্য ইয়ুথ অফ ডিফারেন্ট পার্টস অফ দ্য কান্ট্রি' এ বিষয়ে একটি কর্মশালা আয়োজন করেন ডিমাপুরে ১-৪ অক্টোবর। স্বামী যুক্তানন্দ এই কর্মশালায় যোগদান করেন।

তুমি কি করবে-এর শেষাংশ)

এভাবে আর কোনদিন কারো জিনিস নেবনা।

কাল ওটা সঞ্জীবকে ফেরত দিয়ে আসব।

ভবিষ্যতে এরকম জিনিস নিয়ে এমন জায়গায় রাখব যে তুমি দেখতেই পাবে না।

[ক্রমশঃ]

[মূল্যবোধ এবং পরিচালন শৈলীর শেষাংশ]

২৭শে আগষ্ট মোদিনগরের CMDর সহায়তায় দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের ফ্যাকাল্টি অফ ম্যানেজমেণ্ট স্টাডিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য একটি সভা আয়োজন করেন। ডঃ এ দাশগুপ্ত বিষয়টি-কে তুলে ধরেন এবং স্বামী যুক্তানন্দ মূল্যবোধ ও পরিচালনশৈলী নিয়ে আলোচনা করেন। বেশ কিছু সংখ্যক ছাত্রছাত্রী এই সভায় যোগ দেন এবং প্রশ্নের মাধ্যমে আলোচনাকে সার্থক করে তোলেন। অধ্যাপক এম এম আনন্দও কিছু বলেন এবং উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানান।

ডঃ এ দাশগুপ্ত এবং ডি কে মোদি স্বামী যুক্তানন্দের সঙ্গে আলোচনা করেন কিভাবে বিবেকানন্দ নিধি দিল্লীতেও কিছু কাজ করতে পারে। তাঁরা বলেন মূল্যবোধ প্রতিবিন্যাসকে একটি আন্দোলনে পরিণত করতে হবে এবং এর জন্য বিবেকানন্দ নিধির দিল্লীতেও একটি কেন্দ্র থাকা প্রয়োজন যাতে এই কাজকে দেশব্যাপী ছড়িয়ে দেওয়া যায়।

নিয়মাবলী

লেখক–লেখিকাদের জন্য ঃ মূল্যবোধ ও পরিবেশ বা আজকের দিনের কোন সমস্যা নিয়ে আপনার গল্প বা প্রবন্ধ ছাপতে আমরা আগ্রহী।

লেখা কাগজের একদিকে বাঁদিকে অন্ততঃ এক ইঞ্চি ছেড়ে স্পষ্ট-ভাবে লিখবেন। লেখার নকল রেখে পাঠাবেন।

উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে যথাযথভাবে উদ্ধৃতি চিহ্ন থাকা প্রয়োজন। যে বই থেকে নেওয়া হয়েছে তার নাম, গ্রন্থকারের নাম, প্রকাশকের নাম ঠিকানা, প্রকাশন বর্ষ, সংস্করণ সংখ্যা ইত্যাদির নির্ভুল উল্লেখ আবশ্যক।

অমনোনীত লেখা ফেরত পেতে হ'লে রেজিষ্ট্রী ডাকের উপযুক্ত ডাকটিকিট পাঠাতে হবে।

চিঠির উত্তরের জন্য ষাট পয়সার স্ট্যাম্প বা ঠিকানা সম্বলিত খাম / ইনল্যাণ্ড / পোস্টকার্ড পাঠাতে হবে। লেখা বা চিঠি সংযুক্ত সম্পাদক বা সম্পাদকের নামে পাঠাবেন।

গ্রাহকদের জন্য ঃ জানুয়ারী মাস থেকে বছর আরম্ভ। বছরের প্রথম সংখ্যা থেকে এক বছরের জন্য গ্রাহক হওয়া যায়। বছরের যে কোন সময় বার্ষিক চাঁদা গৃহীত হলেও গ্রাহক করা হবে জানুয়ারী মাস থেকে। বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা সডাক ১৫·০০ টাকা। ভারতের বাইরে $ ১০।

পরের মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে পত্রিকা না পেলে, অবিলম্বে কার্যালয়ে জানালে পুনরায় ঐ সংখ্যা দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু পরবর্তী মাসের মধ্যে না জানালে পত্রিকা প্রাপ্তির নিশ্চয়তা থাকবে না।

চাঁদা মনিঅর্ডারে পাঠালে কুপনে পুরো নাম, ঠিকানা পরিষ্কার ক'রে লেখা প্রয়োজন। মনিঅর্ডার বা পোস্টাল অর্ডারে টাকা পাঠানো যাবে। পোস্টাল অর্ডার বিবেকানন্দ নিধিকে দেয়। **মনিঅর্ডার পাঠানোর ঠিকানা ঃ** ১৪৯/১ই রাসবিহারী অ্যাভিনিউ, কলকাতা-৭০০০২৯। সরাসরি টাকা দিতে গেলে এই ঠিকানা ছাড়াও বিবেকানন্দ নিধি, ৯৯, কড়েয়া রোড, কলকাতা-১৯ ঠিকানায় যে কোন কাজের দিন বিকেল পাঁচটা থেকে সাড়ে সাতটার মধ্যে দেওয়া যাবে।

ঠিকানার পরিবর্তন হলে অন্ততঃ একমাস আগে জানাতে হবে।

Postal Regn No. WB/SC223
৫ম বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, অক্টোবর ১৯৮৭ Regn No. RN-41095/83

মানুষের একটা দিক আছে যেখানে বিষয়বুদ্ধি নিয়ে সে আপন সিদ্ধি খোঁজে। সেইখানে আপন ব্যক্তিগত জীবযাত্রা নির্বাহে তার জ্ঞান, তার ধর্ম, তার রচনাশক্তি একান্ত ব্যাপৃত। সেখানে সে জীবরূপে বাঁচতে চায়।

কিন্তু, মানুষের আর একটা দিক আছে যা এই ব্যক্তিগত বৈষয়িকতার বাইরে। সেখানে জীবনযাত্রার আদর্শে যাকে বলি ক্ষতি তাই লাভ, যাকে বলি মৃত্যু, সেই অমরতা। সেখানে জ্ঞান উপস্থিত প্রয়োজনের সীমা পেরিয়ে যায়; কর্ম স্বার্থের প্রবর্তনাকে অস্বীকার করে। সেখানে আপন স্বতন্ত্র জীবনের চেয়ে যে বড়ো জীবন সেই জীবনে মানুষ বাঁচতে চায়।

— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সম্পাদনা, প্রকাশনা ও মুদ্রণ : স্বামী মুক্তানন্দ। সংযুক্ত সম্পাদক—
লিপিকা গাঙ্গুলী।
বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা ১৫ টাকা। প্রতি কপি টাকা ১৫০ পয়সা
বিবেকানন্দ নিধি, ৮৬এফ, মনোহরপুকুর রোড, কলিকাতা ২৯
এবং ৯৯, কড়েয়া রোড, কলিকাতা-১৯, টেলিফোন ৪৪-৪৮১৩,
পাপাই প্রিন্টার্স ২৩৭, এন. এস সি. বোস রোড, কলিকাতা-৪৭
হইতে মুদ্রিত।

বোধসী

৩য় বর্ষ ।। ১১'শ সংখ্যা ।। নভেম্বর ১৯৮৭

জগতে সমুদয় ধনরাশির চেয়ে 'মানুষ' হচ্ছে বেশী মূল্যবান
—স্বামী বিবেকানন্দ

বিবেকানন্দ নিধি ও ইনষ্টিট্যুট অফ ভ্যালু ওরিয়েন্টেশন অ্যাণ্ড
এনভায়রনমেণ্টাল এডুকেশন-এর মাসিক মুখপত্র

সূচীপত্র

বিজ্ঞান ও মূল্যবোধ ১৬১

যা বোঝাতে চান তা কতটা বোঝেন

—আশ্রমিকা ১৬২

সেলসিয়ান ক্যাটাচেটিকাল সেমিনার

—বিশেষ প্রতিবেদন ১৬৪

মূল্যবোধ ও আমরা ১৬৬

নিধির খবর ১৬৮

গতি ও যতি (একটি কথোপকথন)

—নিজস্ব প্রতিনিধি ১৭৯

ছোটদের বিভাগ ঃ

বিজ্ঞান

জীবজন্তুদের অতি-অনুভূতি ১৭২

জানবার কথা

কিণ্ডারগার্টেন ১৭৩

ইলেকট্রনিক টাইপরাইটার ১৭৪

তুমি কি করবে ?

—স্বামী যুক্তানন্দ ১৭৫

বিজ্ঞান ও মূল্যবোধ

[১০]

মানুষের বিশ্বজনীন মূল্যবোধ কি—এই প্রশ্নের স্বতঃস্ফূর্ত উত্তরে আসে প্রেম, সততা, কল্যাণমুখী চিন্তা এবং সেইমত কাজ। এই উত্তরের মধ্যে প্রচ্ছন্ন রয়েছে আরও একটি প্রশ্ন—মানুষ কাকে ভালবাসে? কার প্রতি সৎ হয় অথবা কার কল্যাণে তার চিন্তা, ভাবনা, কর্ম, প্রচেষ্টা? মানুষ যাকে ভালবাসে না, তার প্রতি তার অসৎ হওয়া কি অস্বাভাবিক? অথবা মানুষ ভালবাসার পাত্রের প্রতি কি অসৎ হতে পারে অথবা তার অকল্যাণ করতে পারে?

চিন্তা করলে বোঝা যাবে যে আমরা যাকে ভালবাসি তার প্রতি অসৎ হতে পারি না, তার অকল্যাণও করতে পারি না। আমরা কাকে ভালবাসি?

পিতা বা মাতা সন্তানকে ভালবাসেন। কারণ সন্তানের মধ্যে তাঁরা নিজেদের খুঁজে পান। মানুষ নিজেকেই ভালবাসে। যার মধ্যে নিজের প্রতিচ্ছবি পাওয়া যায় সেই হয়ে ওঠে ভালবাসার ধন। তার প্রতি মূল্যবোধ হয় কল্যাণমুখী।

রক্তের সম্পর্কের সঙ্গে সাধারণতঃ ভালবাসা সম্পর্কিত। রক্তের সম্পর্কেই আপন পর ভাবনা। কিন্তু যাঁর সঙ্গে রক্তের সম্পর্ক নেই মানুষ কি তার থেকে বিচ্ছিন্ন? তাহলে মানুষ পশুতে কি তফাৎ?

আমরা শরীরের সীমার বাইরে যেতে পারি। যার সঙ্গে পারিবারিক সম্পর্ক নেই তার দুঃখেও আমাদের দুঃখ হয়, সুখে সুখ। অর্থাৎ তার সঙ্গে আমরা একাত্ম বোধ করি। যিনি মানবজীবনের অনেক উচ্চস্তরে উঠেছেন তিনি আত্মীয়তা অনুভব করেন জগতের সমস্ত কিছুর সঙ্গে ঘাস পায়ে দললে ব্যথা পান—বিশ্বজনের কষ্ট লাঘবের জন্য রাজসিংহাসন ত্যাগ করে তপস্যায় নিজেকে আহুতি দেন। এই মহামানবেরা ক্ষুদ্র আমিকে খুঁজে পান বৃহৎ আমির মধ্যে। অনুভব করেন তিনি একা নন, আকাশ ভরা সূর্য তারা আর বিশ্বভরা প্রাণের মধ্যেই তাঁর স্থান।

যা বোঝাতে চান তা কতটা বোঝেন

আত্মমিক্ষা

কিছুদিন আগে একটি স্কুলে তিনদিনের সার্টিফিকেট কোর্স হয়ে গেল, স্কুল পরিচালকমণ্ডলীর ব্যবস্থাপনায় শিক্ষাক্রমটি দেবার ব্যবস্থা করেছিলেন বিবেকানন্দ নিধি। বিষয় মূল্যবোধ সচেতনতা। শিক্ষাক্রম চলাকালীন দেখা গেল এর জন্য যারা সব থেকে বেশী আগ্রহ প্রকাশ করছে তারা অষ্টম নবম শ্রেণীর ছাত্রী।

শিক্ষাক্রমের শেষে দীক্ষান্ত ভাষণে বিবেকানন্দ নিধির তরফে একটা ক্ষোভের প্রকাশ শোনা গেল। স্কুলের ছাত্রীদের মধ্যে যতটা উৎসাহ দেখা গেছে ঠিক ততটাই নিরুৎসাহী ছিলেন শিক্ষিকাদের প্রধান অংশ। অনেক শিক্ষিকাই এমনকি শুধুমাত্র কৌতূহলের বশবর্তী হয়েও শিক্ষাক্রমে কি হচ্ছে তা দেখতে আসেননি। অর্থাৎ ভাষণে এটা পরিষ্কার হয়ে গেল যে তাঁদের কোন না কোনভাবে এই শিক্ষাক্রমের সঙ্গে যুক্ত হওয়া উচিত ছিল অথচ মজার ব্যাপার তিন-দিনের শিক্ষাক্রম চলাকালীন এই বক্তাই বারে বারে বলেছেন 'Value Orientation' মানে 'উচিত অনুচিত' নির্ণয় করা নয়।

মূল্যবোধের তাড়না ছাড়া কেউ কোন কাজ করে না একথা শিক্ষাক্রমে বার বার বলা হয়েছে। শিক্ষিকাদের কাছে যখন ক্লাসে Syllabus অনুযায়ী পড়িয়ে দেবার মূল্যবোধের তাড়না নেই তখন তাঁদের সেই সময়টা যেরকম ভাবে কাটাতে ইচ্ছে করেছে তার ওপরেই মূল্যবোধ গড়ে উঠেছে আর তাঁরা সেই মতোই কাজও করেছেন। যদি তাঁদের এরকম মনে হত যে ছাত্রীদের পাঠ দিতে না হলেও শুধু-মাত্র শিক্ষাক্রমে যোগ দেওয়াটাই তাঁদের কাছে মূল্যবান তাহলে নিশ্চয়ই তাঁদের সেইমতো মূল্যবোধ গড়ে উঠত ও তাঁরা যোগ দিতেন। আবার মূল্যবোধ সম্বন্ধে বলা হয় যে তা 'প্রয়োজন, ঔৎসুক্য, দৃষ্টিভঙ্গী .....' ইত্যাদি নির্ভর। ছাত্রীরা যখন মূল্যবোধ সচেতনতা বিষয় শিক্ষাক্রমে যোগ দিচ্ছে তখন যে সব শিক্ষিকাকে এই কাজের সঙ্গে নির্দেশ দিয়ে যুক্ত করা হয়নি তাঁদের মনে এই শিক্ষাক্রমের বিষয়ে প্রয়োজন বোধ, ঔৎসুক্য বা যোগ দেবার আবশ্যিকতা সম্বন্ধে দৃষ্টিভঙ্গী

জন্মায়নি। শিক্ষিকারা নিজ নিজ মূল্যবোধ অনুযায়ী কাজ করেছেন এবং বিভিন্ন জনের ক্ষেত্রে এই মূল্যবোধ বিভিন্ন রকমের। বিবেকানন্দ নিধি থেকে মূল্যবোধ সম্বন্ধে বলতে গিয়ে যা বোঝাবার চেষ্টা করা হয় বক্তা নিজে তা ভালোভাবে উপলব্ধি না করাতেই এই ক্ষোভের প্রকাশ দেখা যায়। নিধির পক্ষ থেকে ছাত্রীদের মনে আগ্রহের সঞ্চার করতে পারলেও সব শিক্ষিকার মনে সেরকম কোন মূল্যবোধ গড়ে তুলতে পারেননি। সবার সামনে বিশেষতঃ ছাত্রীদের সামনে শিক্ষিকাদের যোগ না দেবার কথা বলাতে ক্ষুব্ধ হয়ে তাঁরা প্রতিবাদ জানান। এই প্রতিবাদ জানানোতে ব্যক্তিগতভাবে তাঁদের নিজ মূল্যবোধের বিচার হয়ে গেছে সাতটি ধাপে :

১) স্কুল খোলা আছে, শিক্ষাক্রম চলছে বলে অন্যান্য ক্লাস বন্ধ। সেক্ষেত্রে অন্ততঃ দর্শক হিসেবে উপস্থিত না হয়ে স্কুল থেকে বাড়ী চলে যাওয়াতে তাঁরা নিজেকে সম্ভ্রান্ত মনে করেননি, এমন কাজ তাঁদের কাছে প্রশংসনীয় নয়।

২) স্কুল খোলা, শিক্ষাক্রম চলছে। এ অবস্থায় তাঁদের বাড়ী চলে যাবার কথা সর্বসমক্ষে জানানো তাঁরা অপছন্দ করেন।

৩) দর্শক হিসেবে শিক্ষাক্রমে যোগ দেওয়া অথবা বাড়ী চলে যাওয়া—এই দুটি বিকল্পের মধ্য থেকেই তাঁরা তাঁদের কাজ বেছে নিয়েছেন।

৪) তাঁরা স্বাধীনভাবেই কাজ করেছেন, কোন চাপের বশবর্তী হয়ে নয়।

৫) তাঁরা যে স্কুল থেকে চলে গেছেন তার ফলাফল সম্বন্ধে তাঁরা অজ্ঞ ছিলেন না। তাঁরা মোটামুটি ভেবেচিন্তেই স্কুল থেকে চলে গেছেন। কারণ তাঁরা জানেন স্কুলের নিয়ম অনুযায়ী এই চলে যাওয়ায় কোন ক্ষতিবৃদ্ধি হবে না।

৬) শিক্ষাক্রমে স্বেচ্ছায় দর্শক হিসেবে যোগ দেওয়া অথবা যেহেতু কোন ক্লাস নিতে হচ্ছে না কাজেই স্কুল চালু থাকা সত্ত্বেও বাড়ী চলে যাওয়া—এই দুটির কোনটিই বিশেষ কোন বিশ্বাসের ওপর নির্ভর করে করার প্রশ্ন ওঠেনি।

৭) প্রতিবাদ জানানোর সময় কথোপকথনে এটা বোঝা

সেলসিয়ান ক্যাটাচেটিক্যাল সেমিনার

বিশেষ প্রতিবেদন

চারদিকে দুর্গাপুজোর আনন্দ ; সকালে রোদ ঝলমল পরিষ্কার আকাশ আর রাত্রে নক্ষত্রখচিত শামিয়ানা, নীচে প্রার্থনা, খ্রীষ্টের নৈশ ভোজোৎসব ও নৈশ ভোজোৎসব পর্ব উদযাপন। ডিমাপুরে এইরকম পরিবেশে সমবেত হয়েছিলেন ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ধর্মযাজক ও ধর্মযাজিকা প্রতিনিধিরা এবং নিমন্ত্রিত অতিথি স্বামী যুক্তানন্দ। উপলক্ষ অল ইণ্ডিয়া অ্যানুয়াল সেলসিয়ান ক্যাটাচেটিক্যাল মীটিং, ১৯৮৭। এই মীটিং যাঁরা আয়োজন করেছিলেন তাঁরা হলেন ফাদার লুসিয়ানো কলুসি (ডিরেক্টর NITIKA / ডন বসকো, ক্যাটাচেটিক্যাল ও মাল্টি মিডিয়া সেন্টার, কলকাতা)। আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল 'যুব সমাজের ধর্মভাব'।

বক্তাদের বক্তব্য ছিল গভীর চিন্তা ভাবনা প্রসূত। সমসাময়িক যুব সমাজের ধর্মবোধ সম্পর্কে উপলব্ধির ওপর তাঁদের বক্তব্য ছিল স্বচ্ছ, প্রাসঙ্গিক এবং পরিসংখ্যান সমৃদ্ধ। প্রত্যেক বক্তাই কোন বিশেষ অঞ্চলের পরিপ্রেক্ষিতে আলোচনা করেছিলেন।

['যা বোঝাতে চান তা কতটা বোঝেন' এর শেষাংশ]

গেছে যে যেহেতু এরকম ব্যবহার ছাত্রীদের সামনে ভালো নয় অথবা সকলের মধ্যে জানাজানি হওয়া ঠিক নয়—কাজেই অনুরূপ পরিস্থিতিতে তাঁরা ঠিক এইরকম আবার নাও করতে পারেন।

মূল্যবোধ সচেতনতা সম্বন্ধে চিন্তার সময় আগে বলা ঘটনাটির মতো পরিস্থিতির বিশ্লেষণ খুবই প্রয়োজন, সাধারণতঃ মূল্যবোধ সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বক্তা অনেক সময়ই ব্যক্তিগতভাবে 'উচিত অনুচিত' এর সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়েন। তখন মূল্যবোধ আলোচনা নীতি শিক্ষায় পর্যবসিত হয়ে যায়। আবার যখন আমরা কোন বিষয় প্রতিবাদ করি তখন ব্যক্তিগত মূল্যবোধ বিচারের (Value Judgement) সাতটি ধাপ বিশ্লেষণ করলে যে মূল্যবোধ বক্তারা গড়ে তুলতে পারেননি সেই মূল্যবোধ গড়ে ওঠে।

আলোচনা সভা শুরু হয় প্রার্থনার মাধ্যমে। এরপর স্বাগত ভাষণ এবং আগের বছরের সভার কার্যবিবরণী পাঠ হয়। ফাদার পি ভি যোসেফ ধর্মভাব (Religiosity) শব্দটির অর্থ ব্যাখ্যা করেন এবং এই বিষয়ে কিছু বলেন। এরপর সভার আলোচনার বিষয় ছিল 'যুব সমাজের ধর্মভাব'। প্রথম দিনের আলোচনা শেষ হয় এই দিনের আলোচনা ভিত্তিক একটি কর্মশালার মাধ্যমে।

স্বামী যুক্তানন্দ তাঁর ভাষণে বলেন খ্রীষ্টধর্মকে ইংরেজ বা ব্রিটিশদের সঙ্গে একসঙ্গে দেখা ঠিক নয়। এবং তাঁর মতে ভারতীয় যুবকদের ধর্মবোধের যথাযথ মূল্যায়ন ইংরেজি Religion শব্দটি অনুসরণ করলে করা যাবে না, কেননা ধর্মবোধ সংস্কৃতি এবং ভাষার সঙ্গেও জড়িত। উপস্থিত প্রতিনিধিরা এ বিষয়ে একমত হন যে ধর্ম সম্বন্ধে উপলব্ধির জন্য যাঁরা ধর্ম শিক্ষা দেন তাঁদের ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের সংস্কৃতি ও জীবনযাত্রার সঙ্গেও পরিচিত হতে হবে।

পরবর্তী দুদিনের অধিবেশনে কেরালা, তামিলনাড়ু, উত্তর-পূর্ব ভারতের বিশেষতঃ পূর্ব ভারত ও খাসি যুবকদের ধর্মভাব নিয়ে আলোচনা হয়। বক্তাদের মধ্যে ছিলেন ফাদার টমাস, ডিরেক্টর ডন বসকো, ডিমাপুর; তেজপুরের ফাদার যোসেফ, ফাদার স্তানিসলানস স্বামীনাথন, ফাদার দোমিনিক জালা, বিশপ টমাস এম, স্বামী যুক্তানন্দ ও ফাদার লুসিয়ানো।

বিশপ টমাস বলেন ভারতীয় সংস্কৃতির প্রধান গুণ হল তার বৈচিত্র্য ও বিভিন্নতা যা একসঙ্গে মিলিত হয়ে জাতীয় ঐক্য গঠনে সাহায্য করে। তাঁর মতে ধর্মীয় বিধান পালনের আকাঙ্খা একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার সেটার অভাব জাতীয় জীবনের অনেক ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে।

ফাদার লুসিয়ানো পশ্চিমবঙ্গে, বিশেষতঃ নদীয়ায় থাকাকালীন তাঁর জীবনের বিভিন্ন অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে গ্রামা যুব সমাজের ধর্ম-ভাবের ওপর আলোচনা করেন। তিনি তাঁর সুপ্রযুক্ত ভাষণে সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করেন কিভাবে ধর্মভাব ও সামাজিক আদর্শ একে অপরের সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত।

মূল্যবোধ ও আমরা

[Value Orientation এ প্রকাশিত 'Values and ourselves' অনুসরণে]

—পূর্ব প্রকাশিতের পর—

আমরা আগে দেখেছি মূল্যবোধ মানুষের কার্যাবলীকে প্রণোদিত ও নিয়ন্ত্রিত করে। প্রবৃত্তি আর নিবৃত্তি মানবমনের এই অংশই যে কোন কাজের পেছনে কারণ হিসেবে থাকে। আমরা অন্যরকম ভাবে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তিকে ভালোবাসা ও ঘৃণাও বলতে পারি। এগুলি মানুষের মানসিক শক্তি ও সঞ্চালক স্নায়ুসমূহের বহিঃপ্রকাশ। শক্তি হচ্ছে প্রকৃতি যা বিভিন্ন শক্তি, অস্তিত্ব ও মানুষের কার্যাবলীর মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। এই শক্তি প্রকাশ লাভ করে সত্ত্ব, রজ ও তম এই তিন গুণের মাধ্যমে। প্রকৃতি বা শক্তির এই তিনটি গুণগত দিক অবিচ্ছিন্ন।

এই তিনটি গুণ কখনই এককভাবে থাকে না। তবে একটি গুণ প্রভাবশালী হলে অন্য দুটি অপেক্ষাকৃত কম শক্তিশালী হয় বা সুপ্ত থাকে। এটা কোন ব্যক্তি বা বস্তুর ক্ষেত্রে স্থায়ী ব্যাপার নয়।

বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা, সুখানুভূতি এবং সন্তোষ. উজ্জ্বলতা, শান্ত সঙ্গীতের মূর্চ্ছনা ও প্রকৃতির সৌন্দর্যের মধ্যে সত্ত্ব গুণের প্রকাশ।

প্রকৃতি বা শক্তির রাজসিক দিক হচ্ছে প্রবল কামনা, অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌছানোর জন্য অস্থিরতা, কাজ করার প্রবল তাড়না, ক্ষমতার আনন্দ, অর্থ উপার্জন, যুদ্ধে জয় ইত্যাদি এবং দুঃখভোগই এর সাধারণ পরিণতি।

তামসিক শক্তির প্রকাশ হচ্ছে আনন্দ বা দুঃখের অনুভূতিহীনতা, হতাশা, অলসতা ও নিষ্ক্রিয়তা। আপাতদৃষ্টিতে সাত্ত্বিকবৃত্তি ও তামসিকতাকে এক মনে হতে পারে কিন্তু গুণগতভাবে এই দুই শক্তি বিপরীতধর্মী।

শক্তিকে বলা হয় ত্রিগুণাত্মিকা অর্থাৎ শক্তির যে অবিচ্ছিন্ন গুণগত দিক তাই তার সারবস্তু। মানুষের ব্যবহার থেকে তার নিজ প্রকৃতিতে কোনগুণ প্রভাবশালী এবং তার পছন্দ অপছন্দ অর্থাৎ প্রবৃত্তি নিবৃত্তি বোঝা যায়।

মানুষের প্রকৃতিকে উন্নত করার উপায় হচ্ছে সভ্যতা। তামসিক গুণাবলীর রাজসিক গুণাবলীতে এবং রাজসিক গুণাবলীর সাত্বিক গুণাবলীতে রূপান্তর চলতেই থাকে যতক্ষণ না সাত্বিকগুণ প্রবল হয়। মানবমনের সহজাত আকাঙ্খা হচ্ছে প্রকৃতি বা তিনটি গুণকে অতিক্রম করা এবং এটাই হচ্ছে পরম মূল্যবোধ। জীবনযাপন একধরনের সহায়ক মূল্যবোধ যা তম থেকে রজ ও রজ থেকে সত্ব ও সবশেষে এই তিন গুণ থেকে উত্তরিত হতে সাহায্য করে।

একজনের চরিত্র তার প্রকৃতির প্রভাবশালী গুণের প্রকাশ। এই গুণের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে একই ব্যক্তিকে বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন আচরণ করতে দেখা যায়।

সত্বগুণকে সবথেকে ভালোভাবে প্রকাশ করে বুদ্ধি এবং অনুভূতি ও কাজ রজগুণের ও দুর্বীনিত ভাব আর অলসতা তমগুণের প্রকাশক। গুণের পরিবর্তনের ওপর মূল্যবোধ নির্ভরশীল। এই পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে ব্যবহার বিজ্ঞান এবং মনোবিদ্যা গুণশক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। শুধুমাত্র মানুষের ব্যবহারই নয় যে কোন বস্তু, জীব ও ঘটনাই ত্রিগুণাত্মিকা শক্তির ওপর নির্ভরশীল।

আমরা এর আগে আলোচনা করেছি যে মানুষের মনে মূল্য-বোধের গঠন তার ওপর মাইক্রোবায়োলজিক্যাল প্রভাব থেকে আরম্ভ করে ইকলজিক্যাল প্রভাবের ওপরও নির্ভর করে। এই পরিপ্রেক্ষিতে মূল্যবোধ প্রতিনিশ্বাস গুণশক্তি, মানুষের পরিবেশ ও ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে যা গৃহীত হয় এবং আর কিছু শক্তি যা কোন না কোন গুণের প্রকাশ তাকে অস্বীকার করতে পারে না। সুতরাং মানুষের দৃষ্টিভঙ্গীর পরি-বর্তন আনার জন্য মূল্যবোধের আলোচনার অর্থ হচ্ছে মানুষের ওপর গুণশক্তি কিভাবে কাজ করছে এবং মূল্যবোধ গঠনে তার কি প্রভাব সে সম্বন্ধে অবহিত হওয়া। এইভাবে কোন ব্যক্তি বুদ্ধি বা সাত্বিক গুণ ব্যবহার করে যে কাজ করবে সেই মূল্যবোধ হবে সূক্ষ্ম গুণাবলী ভিত্তিক এবং এর ফলে যদিও কাজটি রাজসিক কিন্তু তাতে সাত্বিক প্রভাবও থাকবে এবং তমগুণ থাকবে সুপ্ত। এই পদ্ধতিতে কোন ব্যক্তি ত্রিগুণাত্মিকা শক্তিকেই শেষ পর্যন্ত এর থেকে উত্তরিত হবার জন্য

নিধির খবর

১—৩ অক্টোবর ডিমাপুরের ডন বসকো কেন্দ্রে 'যুব সমাজের ধর্মভাব' এই বিষয়ে একটি সর্বভারতীয় আলোচনা সভা হয়। অল ইণ্ডিয়া অ্যাসুয়াল সেলসিয়ান ক্যাটাচেটিক্যাল মীটিং ১৯৮৭ উপলক্ষে এই আলোচনা সভা আয়োজন করেন NITIKA ডন বসকো, ক্যাটাচেটিক্যাল ও মালটি মীডিয়া সেণ্টার, কলকাতা। ক্যাথলিক ধর্ম-যাজক ও ধর্মযাজিকাদের নিয়ে ২২-২৩ জন প্রতিনিধি ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এই অনুষ্ঠানে যোগ দেন। স্বামী মুক্তানন্দ নিমন্ত্রিত প্রতি-নিধি হিসেবে এই আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন এবং 'পূর্বভারতের যুব সমাজের ধর্মভাব' বিষয়টির ওপর বক্তব্য রাখেন। (বিস্তারিত বিবরণ ১৬৯ পৃষ্ঠায়)

*

২৯—৩১ অক্টোবর বানবাদে সেণ্ট্রাল মাইনিং রিসার্চ স্টেশনের সদস্যদের জন্য একটি তিনদিনব্যাপী সার্টিফিকেট কোর্স অনুষ্ঠিত হয়। বিষয় ছিল মূল্যবোধ ও মানব সম্পদ উন্নয়ন। (বিশদ বিবরণ পরবর্তী সংখ্যায়)

*

বিজ্ঞপ্তি

বিবেকানন্দ নিধির পৃষ্ঠপোষকতায় ডঃ এস কে চক্রবর্তীর গবেষণার প্রথম পর্বের বিবরণ 'Values in our lives : A Pilot Study' সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। প্রাপ্তিস্থান : ৯৯ কড়েয়া রোড, কলকাতা ৭০০ ০১৯ এবং ১৪৯/১ই রাসবিহারী অ্যাভিনিউ, কলকাতা ৭০০ ০২৯। দাম ৩০ টাকা।

['মূল্যবোধ ও আমরা'র শেষাংশ]

সহায়ক মূল্যবোধ হিসেবে ব্যবহার করতে পারে। পরম মূল্যবোধে পৌঁছলে মানুষ তার স্বতন্ত্রতা হারায়। এই পরম মূল্যবোধে উত্তরিত হতে পারলে তার ফল হচ্ছে মানসিক শক্তি, ইচ্ছাশক্তি, সংযম এবং সন্তোষ বৃদ্ধি, যা অবশ্যম্ভাবী তাকে গ্রহণ করার ক্ষমতা বৃদ্ধি, মানসিক অস্থিরতা বিহীনতা, অন্তর্জাত শান্তি এবং সীমিততার বন্ধন থেকে মুক্তি।

[ক্রমশঃ]

গতি ও যতি

—একটি কথোপকথন—

নিজস্ব প্রতিনিধি

তরুণ শিক্ষকটি সেদিন বেড়াতে এলেন। তিনি একজন সমাজসেবীও। অধুনা তিনি বি. এড. পরীক্ষা দিয়েছেন। বিবেকানন্দ নিধির প্রতিনিধির সঙ্গে তাঁর এইরকম কিছু কথাবার্তা হয়ঃ

—আমি একটা বস্তিতে সমাজ উন্নয়নের কাজ করি তা তো জানেন। আমরা সেখানে একটা স্কুলও চালাই। সেখানে মূল্যবোধ সম্বন্ধে আপনারা কিছু আলোচনা করতে পারেন না?

—তা কেন করা যাবে না। বিবেকানন্দ নিধি থেকে শিক্ষক, ম্যানেজমেণ্ট এর লোক নানা স্তরে কাজ করেছেন। স্কুলের ছাত্রদের তিনদিনের সার্টিফিকেট কোর্স তো দেওয়া হয়।

—আমাদের কাজ কিন্তু বস্তি অঞ্চলের ছেলেদের নিয়ে। আমি যখন আপনাদের এখানে কোর্স নিয়েছি তখন যে পর্যায়ের আলোচনা হয়েছে তা কিন্তু ওদের কাছে বড় কঠিন বলে মনে হবে।

—তা কেন। স্কুলের ছেলেদের জন্য যখন আমরা কিছু বলি তখন কিন্তু ওদের বোঝার মতো সোজা করেই বলি। কাজেই আপনাদের ঐ অঞ্চলের ছেলেদের উপযোগী ভাষায় সহজ সরল করে এই কোর্স দেবার ব্যবস্থা করা যেতেই পারে।

—আমার সঙ্গে আমার বন্ধু কয়েকজন শিক্ষিত মুসলমান ছেলেও বিবেকানন্দ নিধিতে কোর্স নিয়েছিল। কোর্স নিতে যাবার আগে অবশ্য তাদের মনে একটা আশঙ্কা ছিল নিধিতে সাধু বা অন্য পণ্ডিত ব্যক্তিরা দুর্বোধ্য সব সংস্কৃত বলবেন আর হিন্দুধর্ম প্রচার করবেন। কিন্তু পরে তারাও মত বদলেছে, মূল্যবোধ নিয়ে সকলের জন্য আকর্ষণীয় আলোচনা যে হতে পারে তা তারা ধারণাই করতে পারেনি। তারা এখন এ বিষয়ে খুব উৎসাহী। বস্তির সমাজ উন্নয়নের কাজে তারা আমার প্রধান সহযোগী।

—হ্যাঁ বিবেকানন্দ নিধি থেকে চেষ্টা করা হচ্ছে সবরকম বিভেদসূচক ব্যবধান যে অমূলক তা বৈজ্ঞানিকভাবে বোঝাবার। মূল্যবোধ

গঠনে এই বোঝা আর দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন সবচেয়ে প্রয়োজনীয় ব্যাপার। আর যত ছোট বয়সে তা শুরু করা যায় ততই জীবনে তা বেশী কার্যকরী হয়।

—একটা মজার কথা বলি শুনুন। কিছুদিন আগে আমি বি এডের জন্য প্রশিক্ষণ নিচ্ছিলাম। এতে কিছুদিন আমাদের কোন স্কুলে কয়েকটি ক্লাস নিতে হয়। আমাকে একটা স্কুলে পাঠানো হল। আমার সব ক্লাসই ছিল ক্লাস সেভেনে। আমি ক্লাসে পড়ানোর ফাঁকে যখনই পরীক্ষক থাকতেন না তখনই সুযোগ মতো আপনাদের কোর্সে মূল্যবোধের কথা যা শুনেছিলাম তাই বলার চেষ্টা করতাম।

—তা আপনি কি বললেন আর ছেলেদেরই বা কেমন লাগল।

—আমি প্রথমেই একটু বাজিয়ে দেখার জন্য accelerator ও brake এর কথা খানিক বললাম। দেখলাম ছেলেরা বেশ মন দিয়ে শুনছে। তাই দেখে আমি বেশ দাপটে 'গতি' আর 'যতি' এর পেছনের মূল্যবোধ আর তারা যে পরস্পরের সম্পূরক একটি অবিচ্ছিন্ন কর্ম সংগঠন তা বুঝিয়ে ফেললাম।

ক্রমে মূল্যবোধের কিছু কিছু কথা আলোচনা করলাম। ছেলেরা সবাই খুব মন দিয়ে শুনছিল। ঘণ্টা পড়তেই সবাই বলল 'স্যার আপনি আবার আমাদের ক্লাস নেবেন'। আমি বললাম সেতো তোমাদের হেড মাস্টার মশাই-এর ওপর নির্ভর করছে।

—তারপর কি হল ?

—আমাকে আবার পাঠানো হল। প্র্যাকটিশ টীচিং এর জন্যে সেই ক্লাসে। ছাত্ররা কিছুতেই ছাড়তে চায় না। কদিন বাদে হেড মাস্টারমশাই ডেকে পাঠালেন। আমি যাবার পর জিজ্ঞেস করলেন আমি এত কি পড়াই যার জন্য ছেলেরা আমাকে বারবার চাইছে। তিনি বললেন 'আপনি কি ভূতের গল্প না ডিটেকটিভ গল্প বলেন, নাকি উদ্ভট কিছু ? যে ছেলেরা একটা কথাও মন দিয়ে শুনতে চায়না তারা আপনাকে এইরকম বারে বারে ডাকে কেন' ? প্রশ্নের চোটে নিজেকে অপরাধী মনে হচ্ছিল। কিন্তু তবুও আমি মূল্যবোধের যা যা দিক নিয়ে আমি ক্লাসে আলোচনা করেছি তা বললাম। আমি ভেবেছিলাম উনি

হয়তো সিলেবাসের বাইরের জিনিস পড়ানোর জন্য রেগে যাবেন কিন্তু দেখলাম উনি খুব খুশী হলেন। বললেনও এসব কথা ছেলেদের সঙ্গে আলোচনা খুবই কাজের।

—নিধি থেকে নানা স্তরের মানুষের জন্য শিক্ষাক্রম আয়োজিত হচ্ছে। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের এক্সিকিউটিভস, বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ ও স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকা, স্কুল কলেজের ছাত্রছাত্রী এবং অন্য অনেকের জন্য। এ পর্যন্ত এই কোর্সে সব থেকে বেশী আগ্রহ প্রকাশ করেছেন Trained Nurses' Association of India, West Bengal Branch. তবে এটাও দেখা গেছে প্রশিক্ষণ সবথেকে বেশী কার্যকরী হয় স্কুলের ছাত্রছাত্রীর মধ্যে। আপনারা যদি নিজে এই ধরনের আলোচনা স্কুলে স্কুলে আয়োজন করতে পারেন তাহলে দেখবেন কতটা ফলপ্রদ এই ধরনের শিক্ষাক্রম।

রোদসীর নতুন বর্ষ শুরু হচ্ছে আগামী জানুয়ারী মাস থেকে। গ্রাহকদের তাঁদের বার্ষিক চাঁদা ১৫ টাকা পাঠিয়ে দিতে অনুরোধ করছি।

টাকা পাঠাবার ঠিকানা

মনি অর্ডার : ১৪৯/১ই রাসবিহারী এভিনিউ

কলকাতা ৭০০ ০২৯

সরাসরি টাকা দিতে গেলে ৯৯ কড়েয়া রোডের বিবেকানন্দ নিধির রিসার্চ অ্যাণ্ড ট্রেনিং সেন্টারে যে কোন কাজের দিন বিকেল ৪-৩০—৭-৩০ এর মধ্যে দিতে হবে।

ব্যাঙ্ক ড্রাফট্, চেক বা পোস্টাল অর্ডার 'বিবেকানন্দ নিধি' ১৪৯/১ই, রাসবিহারী এভিনিউ, কলকাতা ৭০০ ০২৯ এই ঠিকানায় দেয়।

বিজ্ঞান

জীবজন্তুদের অতি-অনুভূতি

জীবজন্তুদের মধ্যে এমন কিছু প্রাণী আছে যাদের অনুভূতি শক্তি খুবই জোরালো এবং তীক্ষ্ণ। আধুনিক বিজ্ঞানের আশীর্বাদে আমরা এখন যেভাবে দূরের লোকের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করি, কিছু জানোয়ার ঠিক ঐ উপায়েই তাদের শিকার কোথায় বুঝতে পারে অথবা বুঝতে পারে তাদের চলার পথে বাধা কোথায়। বাদুড় অন্ধকারে দেখতে পায় না কিন্তু বিনা বাধায় উড়ে যায়, মুখ থেকে একরকম তীক্ষ্ণ আওয়াজ ছেড়ে। এই আওয়াজ আমরা শুনতে পাই না। বাদুড়ের মুখের শব্দ কোন কিছুতে ধাক্কা খেয়ে ফিরে আসে। বাদুড় সেই ধাক্কা খাওয়া শব্দ শুনে বুঝতে পারে কোন রাস্তা দিয়ে উড়বে বা তার খাদ্য ঠিক কোথায় আছে। আমরা এখন যে রাডার ব্যবহার করি তার কাজও একই রকম।

একজন বিজ্ঞানী র‍্যাট্‌ল্‌ সাপের দুচোখ বেঁধে দিলেন। কিন্তু দেখলেন যে র‍্যাট্‌ল্‌ সাপ খুব দক্ষতার সঙ্গে তার ইঁদুর ধরল। বিজ্ঞানী পরে দেখলেন যে র‍্যাট্‌ল্‌ সাপের চোখ আর নাকের মধ্যে দুটো টোল আছে, যা অনুভব করতে সাহায্য করে। এই টোল তাপ অনুভব করে। সামনে কোন জীবন্ত শিকার থাকলে তার শরীরের তাপ র‍্যাট্‌ল্‌ সাপ অনুভব করে এবং এই তাপমাত্রা থেকে শিকারটা কত বড় তাও আন্দাজ করতে পারে।

বে অফ্‌ নেপলস্‌ এ কপিলিয়া কোয়াড্রাটা নামে এক জানোয়ার আছে। এদের চোখ অন্য রকমের। চোখে রেটিনা নেই। একটা লেনস্‌ আছে আর এই লেনস্‌ এর পিছনে একটা বিন্দু আছে যা আলো ধরতে পারে। এই বিন্দু সামনে যা আছে তার একটা প্রতিবিম্ব তৈরী করে কালো আর সাদা বিন্দু দিয়ে যেমন হয় এখনকার টেলিভিশন্‌ এ।

জানবার কথা

কিণ্ডারগার্টেন

আমরা দৈনন্দিন জীবনে যত কথা ব্যবহার করি খোঁজ করলে দেখব তার মধ্যে অনেক কথাই ব্যবহার করি ঠিক মানে না জেনে। কিণ্ডারগার্টেন এরকমই একটা কথা।

কিণ্ডারগার্টেন শব্দটি জার্মান ভাষা থেকে এসেছে, এর অর্থ হল ছোটদের বাগান। অষ্টাদশ শতাব্দীতে অনেক শিক্ষাবিদ তখনকার দিনে বাচ্চাদের জন্যে যে শিক্ষাপদ্ধতি চালু ছিল তা পছন্দ করছিলেন না। যাঁরা এর মধ্যে সব থেকে বেশী চিন্তা ভাবনা করছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন কোমেনসিক, পেস্তালাৎসী ও ফ্রয়েবেল। পেস্টালাৎসী অনাথ ছেলেমেয়েদের নিয়ে অনেক স্কুল খুলেছিলেন। তিনি নিজে তাদের পড়াতেন। তাঁর চিন্তাধারায় অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন তাঁরই শিষ্য ফ্রয়েবেল। ফ্রয়েবেল ছিলেন জার্মান। তিনি এক সময় তিনটি ছেলের গৃহশিক্ষক নিযুক্ত হয়েছিলেন। তাদের নিয়ে একদিন তিনি সুইজারল্যাণ্ড যান পেস্টালাৎসীর স্কুলে। সেখানকার শিক্ষাপদ্ধতি তাঁকে মুগ্ধ করে। তবে তিনি পোস্টালাৎসীর শিক্ষাপদ্ধতিকে আরও সহজ সরল করে নিলেন এবং ঐ সহজ সরল শিক্ষাদান পদ্ধতির নাম দিলেন কিণ্ডারগার্টেন অর্থাৎ ছোটদের বাগান। তিনি মনে করতেন

['বিজ্ঞান' এর শেষাংশ)

মানুষের ঘ্রাণ গ্রহণ করবার মত সেল বা কোষ আছে পাঁচ মিলিয়ন আর অ্যালসেসিয়ান কুকুরের আছে দু'শো কুড়ি মিলিয়ন। এই কারণে অ্যালসেসিয়ানের ঘ্রাণ শক্তি এত তীব্র।

বাজপাখীর দৃষ্টিশক্তি মানুষের থেকে আটগুণ তীব্র।

স্ত্রী প্রজাপতির শরীর থেকে একরকম গন্ধ বের হয়। সাত মাইল দূরের কোন পুং প্রজাপতি এই গন্ধ অনুভব করতে পারে।

মৌমাছিরা মধুসংগ্রহ করবার জন্য ফুলের প্রতি আকৃষ্ট হয়।

মৌমাছিরা পাতা আর ফুলের পার্থক্য বুঝে ফুলের ওপর বসে। কিন্তু মধু সংগ্রহ শেষ হয়ে গেলেই আর ফুলের প্রতি এদের কোন আকর্ষণ থাকে না। তখন ছোটে মৌচাকের দিকে।

বাগানের চারাগাছ যেমন প্রকৃতির জল, আলো ও হাওয়ায় স্বাভাবিক ভাবে বেড়ে ওঠে তেমনি শিশুদেরও স্বাভাবিক ভাবে বেড়ে ওঠা প্রয়োজন। ছোটদের কোনদিকে স্বাভাবিক ঝোঁক সেটা লক্ষ্য করে খেলার ছলে তাদের শিক্ষা দেওয়া তিনিই শুরু করেছিলেন। যুগের পরিবর্তনে সেই শিক্ষাপদ্ধতির কিছু পরিবর্তন হয়েছে ঠিকই কিন্তু আজও কিণ্ডারগার্টেন স্কুলগুলোতে তাঁর মূল নীতিই অনুসৃত হচ্ছে।

ইলেক্‌ট্রনিক টাইপরাইটার

আমরা আজকাল ইলেক্‌ট্রনিক টাইপরাইটারের কথা খুব শুনি। ইলেক্‌ট্রনিক টাইপরাইটারে টাইপ করা চিঠি দেখতে খুব সুন্দর লাগে। এই রকম মেশিনে যে শুধু খুব ভাল টাইপই করা যায় তা নয়। ইলেক-ট্রনিক টাইপরাইটার আরও অনেক কাজ করে। এই মেশিনে টাইপ খুব তাড়াতাড়ি হয়, মেমারীতে অনেক কিছু ধরে রাখা যায়। সাধারণ মেশিনে টাইপ যে ভাবে থাকে এ মেশিনে টাইপ ঐ ভাবে থাকে না। টাইপ থাকে একটা টেনিস বলের মত গোলকে। এই গোলকটা ঘুরতে থাকে আর নানান অক্ষর কাগজে ছাপা হয়।

টাইপরাইটারের কাজ এখন আর শুধু কাগজে টাইপ করা নয়। অনেক কম্প্যুটার আছে যা কাজ করে টাইপরাইটারের সাহায্যে। কম্প্যুটারে যা ঢোকাতে হবে তা টাইপ মেশিনে টাইপ করা হয়। কম্প্যুটারের হিসেব করা শেষ হয়ে গেলে সেই তথ্য টেলিভিশনের মতো একরকম স্ক্রীনে দেখা যায় অথবা ঐ তথ্য আর একটা যন্ত্রের সাহায্যে ছাপা হয়ে বেরিয়ে আসে।

ওয়ার্ড প্রসেসর বলে একরকম মেশিনের কথাও আমরা আজকাল শুনি। এই যন্ত্রে একটা টাইপরাইটার থাকে, টেলিভিশনের মতো একটা স্ক্রীন থাকে আর একটা ছোট্ট কম্প্যুটার থাকে। আমরা যা লিখতে চাই টাইপরাইটারের সাহায্যে স্ক্রীনের ওপরে তা লিখতে পারি। ভুল সংশোধন খুব সহজে করতে পারি, দরকার মতো যে কোন লাইন বদলে নিতে পারি। এর জন্য কোন কাটাকাটি বা কাগজ নষ্ট হয় না। স্ক্রীনে লেখাটা ঠিকমতো হলে দরকার মতো কপি ঐ মেশিন থেকেই

তুমি কি করবে

স্বামী মুক্তানন্দ

[১৮]

আমাদের বাড়ীতে সরস্বতী পূজো খুব যত্ন করে হয়। দাদা এখন ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজে পড়ে। ও এবারে পূজোর সময় খুব অদ্ভুত কাণ্ড করল। মাকে বলল ও পূজো করে কিছু হবে না, যার বুদ্ধি আছে সে ভালো রেজাল্ট করবে. ঠাকুর ফেলে দাও। দাদা সত্যি ঠাকুরের মূর্তি তুলে ফেলে দিল। তাতে বাবা, মা, বাড়ীর সবাই খুব দুঃখ পেলেন। আমি ভাবলাম,

দাদা ঠাকুর দেবতা না মেনেই তো পরীক্ষায় ভালো রেজাল্ট করে। ওর কথাই ঠিক।

দাদা যা মানে না অন্য লোকেও তা মানবে না এটা মনে করা ভুল।

অন্য লোকের সেন্টিমেন্টে আঘাত করতে নেই।

দাদার খুব অহঙ্কার হয়েছে, তাই ও বাড়ীর সবার মতের বিরুদ্ধে গিয়েছে।

এখনকার ছেলেরা আগেকার দিনের মতবাদ মানবে কেন ?

[১৯]

স্নিগ্ধাকে সেদিন জয়শ্রী রঞ্জিতা সম্বন্ধে খুব একটা গোপনীয় কথা

['ইলেকট্রনিক টাইপরাইটার' এর শেষাংশ]

ছেপে নেওয়া যায়। আর যা লেখা হল ভবিষ্যতে ব্যবহারের জন্যে কম্প্যুটারের মেমারিতে রেখে দেওয়া যায়।

প্রযুক্তিবিদরা এখন চেষ্টা করছেন একরকম টাইপরাইটার তৈরী করতে যা মানুষের কথা শুনে টাইপ করতে শুরু করবে। তাহলে আর টাইপ রাইটারের চাবি টিপতে হবে না অফিসে খটখট আওয়াজ হবে না, টাইপ করা শিখতেও হবে না।

বলে। স্নিগ্ধা তা রঞ্জিতাকে বলে দেওয়াতে জয়শ্রী আর রঞ্জিতার মধ্যে খুব রাগারাগি হয় এবং কথা বলা বন্ধ হয়ে যায়।

জয়শ্রী স্নিগ্ধাকে বলে ও গোপনীয় কথা কেন বলে দিয়েছে ?

স্নিগ্ধা বলে বন্ধুদের মধ্যে বন্ধুদের সম্বন্ধে কোন গোপনীয় কথা থাকতেই পারে না।

রঞ্জিতা বলে জয়শ্রীর আসল রূপ চিনে ফেলেছে।

মাধুরী বলে বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে এরকম মন কষাকষি হয়ই কিন্তু তা মনে রাখতে নেই।

রত্না বলে গোপনীর কথা ফাঁস করা খুব অন্যায়।

[২০]

শ্যামল আর অনিরুদ্ধের মধ্যে সেদিন খুব ঝগড়া হয়েছে। অনিরুদ্ধ রাগ করে শ্যামলের খুব পছন্দের পেনটার নিব ভেঙ্গে দিয়েছে টিফিনের সময়, শ্যামল তা জানতেও পারেনি। সঞ্জয় দেখেছিল। সঞ্জয় ভাবল,

অনিরুদ্ধ শ্যামলের ক্ষতি করে ঠিক করেনি।

শ্যামলের সামনে নিব ভাঙলে এক রকম হত। ওর অজান্তে ঐ কাজ করা আরও খারাপ।

ঝগড়া হতেই পারে, তাই বলে কারো ক্ষতি করা ঠিক নয়।

যার সঙ্গে ঝগড়া হয় তার ক্ষতি করলে কিছু অন্যায় হয় না।

অনিরুদ্ধ বুদ্ধিমানের মতো কাজ করেছে। কে করেছে শ্যামল তা বুঝতেই পারবে না।

নিয়মাবলী

লেখক–লেখিকাদের জন্য ঃ মূল্যবোধ ও পরিবেশ বা আজকের দিনের কোন সমস্যা নিয়ে আপনার গল্প বা প্রবন্ধ ছাপতে আমরা আগ্রহী।

লেখা কাগজের একদিকে বাঁদিকে অন্ততঃ এক ইঞ্চি ছেড়ে স্পষ্ট-ভাবে লিখবেন। লেখার নকল রেখে পাঠাবেন।

উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে যথাযথভাবে উদ্ধৃতি চিহ্ন থাকা প্রয়োজন। যে বই থেকে নেওয়া হয়েছে তার নাম, গ্রন্থকারের নাম, প্রকাশকের নাম ঠিকানা, প্রকাশন বর্ষ, সংস্করণ সংখ্যা ইত্যাদির নির্ভুল উল্লেখ আবশ্যক।

অমনোনীত লেখা ফেরত পেতে হ'লে রেজিষ্ট্রী ডাকের উপযুক্ত ডাকটিকিট পাঠাতে হবে।

চিঠির উত্তরের জন্য ষাট পয়সার স্ট্যাম্প বা ঠিকানা সম্বলিত খাম / ইনল্যাণ্ড / পোস্টকার্ড পাঠাতে হবে। লেখা বা চিঠি সংযুক্ত সম্পাদক বা সম্পাদকের নামে পাঠাবেন।

গ্রাহকদের জন্য ঃ জানুয়ারী মাস থেকে বছর আরম্ভ। বছরের প্রথম সংখ্যা থেকে এক বছরের জন্য গ্রাহক হওয়া যায়। বছরের যে কোন সময় বার্ষিক চাঁদা গৃহীত হলেও গ্রাহক করা হবে জানুয়ারী মাস থেকে। বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা সডাক ১৫·০০ টাকা। ভারতের বাইরে $ ১০।

পরের মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে পত্রিকা না পেলে, অবিলম্বে কার্যালয়ে জানালে পুনরায় ঐ সংখ্যা দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু পরবর্তী মাসের মধ্যে না জানালে পত্রিকা প্রাপ্তির নিশ্চয়তা থাকবে না।

রোদসীর চাঁদা মনিঅর্ডারে পাঠালে কুপনে পুরো নাম, ঠিকানা পরিষ্কার করে লেখা প্রয়োজন। মনিঅর্ডার বা পোস্টাল অর্ডারে টাকা পাঠানো যাবে। পোস্টাল অর্ডার বিবেকানন্দ নিধিকে দেয়। মনিঅর্ডার পাঠানোর ঠিকানা ঃ ১৪৯/১ই রাসবিহারী অ্যাভিনিউ, কলকাতা-৭০০০২৯। সরাসরি টাকা দিতে গেলে এই ঠিকানা ছাড়াও বিবেকানন্দ নিধি, ৯৯, কড়েয়া রোড, কলকাতা-১৯ ঠিকানায় যে কোন কাজের দিন বিকেল পাঁচটা থেকে সাড়ে সাতটার মধ্যে দেওয়া যাবে।

ঠিকানার পরিবর্তন হলে অন্ততঃ একমাস আগে জানাতে হবে।

Postal Regn No. WB/SC223
৫ম বর্ষ, ১১'শ সংখ্যা, নভেম্বর ১৯৮৭ Regn No. RN-41095/83

মানুষের একটা দিক আছে যেখানে বিষয়বুদ্ধি নিয়ে সে অন্নবস্ত্রের সিদ্ধি খোঁজে। সেইখানে আপন ব্যক্তিগত জীবযাত্রা নির্বাহে তার জ্ঞান, তার ধর্ম, তার রচনাশক্তি একান্ত ব্যাপৃত। সেখানে সে জীবরূপে বাঁচতে চায়।

কিন্তু, মানুষের আর একটা দিক আছে যা এই ব্যক্তিগত বৈষয়িকতার বাইরে। সেখানে জীবনযাত্রার আদর্শে যাকে বলি ক্ষতি তাই লাভ, যাকে বলি মৃত্যু, সেই অমরতা। সেখানে জ্ঞান উপস্থিত প্রয়োজনের সীমা পেরিয়ে যায়; কর্ম স্বার্থের প্রবর্তনাকে অস্বীকার করে। সেখানে আপন স্বতন্ত্র জীবনের চেয়ে যে বড়ো জীবন সেই জীবনে মানুষ বাঁচতে চায়।

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

14.12.87

সম্পাদনা, প্রকাশনা ও মুদ্রণ : স্বামী মুক্তানন্দ। সংযুক্ত সম্পাদক—লিপিকা গাঙ্গুলী।
বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা ১৫ টাকা। প্রতি কপি ১৮টাকা ৫০ পয়সা
বিবেকানন্দ নিধি, ৮৬এফ, মনোহরপুকুর রোড, কলিকাতা-২৯
এবং ৯৯, কড়েয়া রোড, কলিকাতা-১৯, টেলিফোন ৪৪-৪৮১৩,
পাপাই প্রিণ্টার্স ২৩৭, এন এস সি বোস রোড, কলিকাতা-৪৭
হইতে মুদ্রিত।

বেতসী

৫ম বর্ষ ।। ১২'শ সংখ্যা ।। ডিসেম্বর ১৯৮৭

জগতে সমুদয় ধনরাশির চেয়ে 'মানুষ' হচ্ছে বেশী মূল্যবান
—স্বামী বিবেকানন্দ

বিবেকানন্দ নিধি ও ইনষ্টিট্যুট অফ ভ্যালু ওরিয়েন্টেশন অ্যাণ্ড
এনভায়রনমেণ্টাল এডুকেশন-এর মাসিক মুখপত্র

সূচীপত্র

বিজ্ঞান ও মূল্যবোধ ১৭৭

তারক ডাক্তার—উপগুপ্ত ১৭৮

মূল্যবোধ ও আমরা ১৮০

মূল্যবোধ ও মানব সম্পদ উন্নয়ন
—বিশেষ প্রতিবেদন ১৮১

কালো ধোঁয়া (কবিতা)
—শ্রীমতী শীলা সেন ১৮৩

নিধির খবর ১৮৪

ছোটদের বিভাগ :

বিজ্ঞান ১৮৫

জানবার কথা ১৮৭

তুমি কি করবে ?
—স্বামী যুক্তানন্দ ১৮৯

বিজ্ঞান ও মূল্যবোধ

[১২]

বিজ্ঞান বলে একা কোন পদার্থকণাও নয়। বরেণ্য পদার্থবিদ্ নীল বোর এর কথায় বিচ্ছিন্ন কোন পদার্থকণার অস্তিত্ব কল্পনামাত্র। কেননা যে কোন পদার্থকণার পরিচিতি বুঝবার একমাত্র উপায় অন্য কোন পদার্থকণার সঙ্গে তার ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া অনুধাবন করা। এই ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া ঘটানোর জন্য চাই অনুকূল ব্যবস্থা। তাহলে যে কোন পদার্থকণা অন্য একটি পদার্থকণা এবং একটি বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার ব্যবস্থার সঙ্গে সম্পর্কিত। একটি উদাহরণের সাহায্য নিলে নীল বোর এর বক্তব্য আমরা বুঝতে পারব।

পারমাণবিক পরীক্ষায় প্রথমে প্রয়োজনীয় পদার্থকণাটিকে আলাদা করে নিতে হয়। ধরা যাক এই কণাটি একটি ইলেক্ট্রন যা আমরা বিশেষ ভাবে পরীক্ষা করতে চাই। ইলেকট্রনটিকে আলাদা করবার জন্য একটি বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা চাই, আবার এটিকে পরীক্ষা করবার জন্য চাই আরও একটি ব্যবস্থা—বিজ্ঞানের ভাষায় যার নাম বাবল্ চেম্বার। এ' দুটি ব্যবস্থার যোগসূত্র ইলেকট্রনটি।

দ্বিতীয় ব্যবস্থাটির মধ্যে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার যন্ত্রপাতি রয়েছে, রয়েছেন বৈজ্ঞানিক। এই ব্যবস্থাটিকে বলা যায় এমন একটি ব্যবস্থা যা দেখে। কি দেখে? দেখে অপর ব্যবস্থাটিকে এবং অপর ব্যবস্থার সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অংশ ইলেকট্রনটিকে। এই দুই ব্যবস্থা কি তাহলে সম্পর্কহীন?

এই বিশ্বসংসারকেও আমরা দুটি ব্যবস্থা বলে ধরে নিতে পারি। একটি দেখে, অপরটি দেখা হয়। আমরা প্রত্যেকে দেখছি অন্য কিছুকে। ঐ অন্য কিছুর মধ্যে প্রকৃতি আছে, জগতের সবকিছু আছে, এমনকি মানুষও আছে। ঐ মানুষ আমাকে দেখছে আর আমি যা কিছু দেখছি তাও দেখছে। তাহলে আমি যা দেখি আর আমি নিজে কি পরস্পর বিচ্ছিন্ন?

তারক ডাক্তার

উপগুপ্ত

চল্লিশের দশকের শেষের দিকের কথা। একটি অখ্যাত ছোট শহরে ডাক্তারি করেন আমাদের তারক ডাক্তার। যেমন সজ্জন তেমনই নির্লোভ একজন মানুষ। জীবন কাটাতেন নিতান্তই সাধাসিধে ধরণে।

এক শীতের সকালে এই তারক ডাক্তার বসেছিলেন বাড়ীর সামনে একটি গাছের তলায়, হাতে কিছু খুচরো পয়সা। হঠাৎ কি খেয়ালে ছেলেমেয়েদের ডাকলেন। ওরা সবাই আসতে হাতের খুচরো সিকি দুআনি আধুলিগুলো দেখিয়ে বললেন 'এগুলো কিসের বলতে পার' ? অবাক হয়ে ছেলেমেয়েরা এ ওর মুখের দিকে তাকায় কিছুই বুঝে উঠতে পারে না। তাদের নিরুত্তর দেখে তারক ডাক্তার নিজেই বললেন 'এগুলো আজ আমি রুগী দেখার পারিশ্রমিক হিসেবে পেয়েছি। এই একটা টাকাও না নিলেই চলত কিন্তু না নিলে ওরা আবার দুঃখ পায়, ভাবে ওরা গরীব বলে দয়া দেখিয়ে ওদের অপমান করছি তাই নিয়ে নিলাম। না হলে এ পয়সায় ওষুধ পথ্য কিনলে ওদের কাজে লাগত। এবার ছেলেমেয়েদের মুখ হাসিতে ভরে ওঠে। বহুদিন আগে বাবা তাঁর রুগী দেখার পারিশ্রমিক বেশী ধার্য করছেন না বলে তারাই একবার অনুযোগ করেছিল, সেদিন তাদের চিকিৎসক বাবা কোন জবাব দেননি। আজ দরিদ্রদুঃস্থ জনের কাছ থেকে এসে আনন্দে পরিপূর্ণ হৃদয়ে ঘটনাচ্ছলে ছেলেমেয়েদের জানিয়ে দিলেন টাকা না বাড়াবার প্রকৃত রহস্য। অর্থলিপ্সা বিমুখ তারক ডাক্তার তাঁর

['বিজ্ঞান ও মূল্যবোধ' এর শেষাংশ]

আমি যা দেখি তা আমার পরিবেশ। আমিও অপরের পরিবেশ। আমি আর আমার পরিবেশের মধ্যে একটা সঠিক সম্পর্ক আছে। এই সম্পর্কটি নিরূপণ করা আর সেইমত আচরণ করাই মূল্যবোধ সচেতনতা।

[সমাপ্ত]

ব্যক্তিত্বের মাধুর্যে আর চিকিৎসার গুণে সারা অঞ্চলটাকেই আপনার করে নিয়েছিলেন। তাঁর ফীজ ছিল মাত্র দু'টাকা। যে সময়ের কথা বলছি তখন অবশ্য দু টাকার দামও কিছু কম ছিলনা, ওতেই দিন ভালভাবেই কেটে যেত। তাছাড়া তাঁর রুগীর সংখ্যাও তো কিছু কম ছিলনা। তবে যাদের দু'টাকাও দেবার ক্ষমতা ছিলনা তাদের জন্যও তাঁর দ্বার ছিল অবারিত। টাকা দেবার ক্ষমতা নেই বলে তাঁর দরজা থেকে কারোকে কখনও ফিরে যেতে হয়নি। আরও মজার কথা হচ্ছে যে উনি ফীজ বাড়াননি বলে তখনকার আরও কয়েকজন বড় ডাক্তারও ফীজ বাড়াতে পারেননি। তারক ডাক্তারের চিকিৎসার গুণেই হোক বা ব্যবহারের গুণেই হোক তাঁর পসার বেশ ভাল রকম জমে উঠেছিল।

মধ্যবয়সে আচমকা তাঁর জীবনে নেমে এল এক আঘাত। তাঁর সমস্ত চিকিৎসালব্ধ অর্থ যে ব্যাঙ্কে রাখতেন সেই ব্যাঙ্ক ফেল করল। তারক ডাক্তার হারালেন তাঁর সারা জীবনের সঞ্চিত অর্থ, ভবিষ্যতের আশা ভরসা। এর ফলে তিনি তাঁর মানসিক স্থৈর্য হারালেন। লোকে বলত দুঃখে মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছে। কিন্তু লোকে যাই বলুক বা অন্য সময়ে তাঁর চালচলনে যতই অসঙ্গতি প্রকাশ পাক না কেন, কোন রুগী এলে সঙ্গে সঙ্গে তাঁর আচরণ পাল্টে যেত। আগের মতোই স্নেহ ও যত্নের সঙ্গে তাদের চিকিৎসা করতেন। যাঁরা তাঁর কাছে আসতেন সকলেই সুফল পেতেন। কিন্তু কি আশ্চর্য এইরকম টাকাপয়সার টানাটানির সময়েও পারিশ্রমিক বাড়ানোর কথা চিন্তাতেই আনেননি। শুধু সেবার আনন্দে মানুষকে জীবন দান করে গেছেন। যাকে জীবনের আদর্শ বলে ধরে রেখেছিলেন তার থেকে অভাব তাঁকে সরিয়ে দিতে পারেনি। ব্যক্তিগত দুঃখ সুখের থেকে আদর্শকে চিরদিনই উঁচুতে রাখতে পেরেছিলেন।

এই তারক ডাক্তারের এক ছেলে বিখ্যাত ইঞ্জিনীয়ার। রেনু-কূটের অ্যালুমিনিয়াম কারখানা এঁরই হাতেই তৈরী, তাই লোকমুখে আসল নাম লোপ পেয়ে হয়ে দাঁড়িয়েছে অ্যালুমিনিয়াম চক্রবর্তী। এই প্রবীণ ইঞ্জিনীয়ার বাবার মূল্যবোধে গর্বিত। এখনও তারক ডাক্তারের মতো বাবার সন্তান হবার জন্য গর্ব তাঁর কথায় প্রায়ই প্রকাশ পায়।

মূল্যবোধ ও আমরা

[Value Orientation এ প্রকাশিত 'Values and ourselves' অনুসরণে]

—পূর্ব প্রকাশিতের পর—

ত্রিগুণাত্মিকা শক্তির মূলনীতি নিয়ে আমরা আগেই আলোচনা করেছি। এই পর্যায় তিনটি একই শক্তির অবিচ্ছিন্ন প্রকাশভেদ মাত্র। প্রকৃতপক্ষে দুই বা একের পার সেই সত্তাই এভাবে আমাদের সামনে প্রকৃতি ও বিশ্বপ্রপঞ্চ হয়ে রয়েছে। এই শক্তির জোরালো প্রকাশ প্রাণশক্তিতে। এই সর্বব্যাপী শক্তিই নিজস্ব ধারায় সবকিছুকে কার্যে পরিণত করে।

প্রাণশক্তি হিসাবেও শক্তি ত্রিগুণাত্মিকা। এই প্রাণশক্তির সর্বশক্তিমান প্রকাশ হচ্ছে যৌনশক্তির মাধ্যমে। যা আবার প্রাণ-শক্তির উদ্ভব ঘটায়। এই একই শক্তির মহত্তম প্রকাশ হল পূর্ণজ্ঞান।

এই কর্মশক্তি নিজেকে তার তিনটি দিক—কাম, প্রেম ও জ্ঞানের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করে। আসলে এগুলি পরস্পর অবিচ্ছেদ্য সত্তা যা সত্ত্ব, রজ এবং তমের প্রকারভেদ অনুযায়ী কাম, প্রেম ও জ্ঞান হিসেবে প্রতিভাত হয়।

এই শক্তি বিভিন্ন প্রতীকের মাধ্যমে কাজ করে আমাদের মানুষ হিসেবে গঠন করে। এই বিভিন্ন গঠনগুলিকে বলে বিভিন্ন স্তর, সংস্কৃত পরিভাষায় একেই বলে পঞ্চকোষ।

প্রথম স্তর হল স্থূল শরীরের স্তর বা অন্নময় কোষ। দ্বিতীয় স্তর হল প্রাণময় কোষ যা মানুষের ব্যক্তিগত জীবনকে টিঁকিয়ে রাখে। তৃতীয় স্তর মনোময় কোষ যা মানসিক সত্তাকে চিহ্নিত করে। চতুর্থ স্তর বা জ্ঞানময়কোষ প্রেয় ও শ্রেয়র মধ্যে বিচার করায় বৌদ্ধিক সচেতনতার মাধ্যমে। পঞ্চম ও শেষ স্তর হল আনন্দময় কোষ বা পরম আনন্দ, যা সর্বব্যাপী হয়ে রয়েছে।

ত্রিগুণাত্মিকা শক্তি সত্ত্ব, রজ ও তমের প্রকাশভেদ অনুযায়ী একে অন্যকে আকর্ষণ করে বা দূরে সরিয়ে দেয়। জীবন নিজেকে বিস্তার করতে চায়, ভালোবাসতে চায়, এই ভালোবাসা মানসিক স্তরে কাজ করে। জ্ঞানময় স্তরে প্রভেদমূলক শক্তি কৃত্রিম বা অনিত্যকে

মূল্যবোধ ও মানবসম্পদ উন্নয়ন

ধানবাদে অনুষ্ঠিত শিক্ষাক্রমের আমাদের নিজস্ব প্রতিনিধির প্রতিবেদন—

ধানবাদ সেন্ট্রাল মাইনিং রিসার্চ স্টেশন (C M R S) ভারত সরকারের খনি সংক্রান্ত বিভিন্ন গবেষণার সব থেকে বড় প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠানে ২৯—৩১ অক্টোবর 'মূল্যবোধ ও মানব সম্পদ উন্নয়ন' বিষয়ে একটি শিক্ষাক্রম দেওয়া হয়।

আমরা একটু মন দিয়ে চিন্তা করলে দেখব বিজ্ঞান ও কারিগরী বিদ্যার জগতে অগ্রগতি মানুষের উদ্দীপনা, বিবেক ও উপলব্ধিকে প্রতিফলিত করে না—এই কটি কথা দিয়ে শিক্ষাক্রমের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানান সি এম আর এস এর ডিরেক্টর বি সিং। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহ অধ্যাপক উপাচার্য এবং বিবেকানন্দ নিধির আকাডেমিক অ্যাডভাইসরি কাউন্সিলের সদস্য ডঃ দিলীপ কুমার

[মূল্যবোধ ও আমরার শেষাংশ]

উত্তীর্ণ করে নিত্য বা শাশ্বতের অনুসন্ধান করে, যা মানুষকে তার ক্ষুদ্র সঙ্কীর্ণতা কাটিয়ে বস্তু, সত্তা ও সচেতনতার আড়ালে ঐক্যসত্যকে খুঁজে বার করতে সহায়তা করে। সচেতনতার পঞ্চমস্তর অর্থাৎ আনন্দময় কোষে এই ঐক্য এক পরম আনন্দময় সত্তায় পর্যবসিত হয়। এই সচেতনতা তার নিজস্ব শক্তিতে ব্যক্তিকে যা কিছু আপাত তার সীমা অতিক্রম করে সত্য উপলব্ধিতে সহায়তা করে।

এই ত্রিগুণাত্মিকাশক্তি সত্ত্ব, রজ ও তমর প্রভাবে মানুষের ব্যবহারে কাম, প্রেম ও জ্ঞান রূপে প্রকাশিত হয়। যদি জ্ঞানের প্রভাব বেশী হয় তাহলে অন্য দুটিকে উপলব্ধি নাও করা যেতে পারে। কামের অনুপস্থিতিতেও ভালোবাসা বা প্রেমের আনন্দে হানি ঘটে না। কিন্তু কেবলমাত্র কামের স্তরে আবদ্ধ হয়ে থাকলে ব্যক্তিস্বার্থের গণ্ডী ভেঙে জীবনের চরিতার্থতা উপলব্ধি করা যায় না।

এইভাবে গুণশক্তি প্রাণশক্তিরূপে জীবনের পরম লক্ষ্যে পৌঁছতে সাহায্য করে। মানুষ ক্রমশঃ তামসিক ও রাজসিক ভাব কাটিয়ে সত্ত্বে উপনীত হয়। পরে এই সত্ত্বকেও অতিক্রম করে জীবনের প্রকৃত অর্থ খুঁজে পায়। [ক্রমশঃ]

আগামীকাল কি জবাব দেব
আসন্ন উত্তরসূরীদের ?
কণ্ঠনালীর নীচ থেকে
ভেসে আসে ক্ষীণস্বর,—
কেন ? নির্মমতা, বর্বরতা
আর স্বার্থপরতা ?
আর কিছু নয় ?
হ্যাঁ আরও কিছু !
কি ?
স্বাদহীন একটুখানি রুটি
আর সারহীন একফোঁটা চোখের জল ।

নিধির খবর

২১শে নভেম্বর শনিবার ১৯৮৭ বিকেল চারটেয় সোসিও-লিগ্যাল এইড্ অ্যাণ্ড ট্রেনিং সেণ্টার একটি সেমিনারের আয়োজন করেছিলেন। সেমিনারের বিষয় ছিল 'মাইনরিটি রাইট্স অ্যাণ্ড লিগ্যাল প্রোটেকশন'। মিস্টার হোমি তালেয়ারখান, সদস্য, মাইনরিটিস কমিশন, গভর্ণমেণ্ট অব্ ইণ্ডিয়া সেমিনারের উদ্বোধন করেন। স্বামী যুক্তানন্দ উক্ত সেমিনারে অংশগ্রহণ করেন।

*

২৭—২৯শে নভেম্বর ৯৯ কড়েয়া রোডের বিবেকানন্দ নিধির গবেষণা ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে 'মূল্যবোধ ও মানবিক গুণাবলীর উন্নয়ন' বিষয়ক একটি শিক্ষাক্রম অনুষ্ঠিত হয়। অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে অধিকাংশই ছিলেন TNAI পশ্চিমবঙ্গ শাখার সদস্যা।

বিজ্ঞান

অ্যাসিড বৃষ্টি

বৃষ্টি না হলে ফসল উৎপাদন করা খুব শক্ত। কিন্তু ভবিষ্যতে হয়তো একদিন আসবে যখন আমরা দেখব কয়েকবার বৃষ্টি হবার পর মাঠের ফসল নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, গাছপালা মরে যাচ্ছে, এমনকি জলের মাছও সব মরে গেছে। এই বৃষ্টি উপকারের চেয়ে অপকারই বেশী করে। এর নাম অ্যাসিড বৃষ্টি।

অ্যাসিড বৃষ্টি মানে এই নয় যে সমুদ্রের বা নদীর জল বাষ্প হয়ে ওপরে উঠে অ্যাসিডে পরিণত হচ্ছে। বায়ুমণ্ডলে বৃষ্টি তৈরী হবার পর সেই বৃষ্টি পৃথিবীতে নেমে আসার পথে অ্যাসিডে পরিণত হয়। অপরিষ্কার বায়ুমণ্ডলে নাইট্রোজেন, সালফার এবং আরও অনেক রকমের রাসায়নিক পদার্থ থাকে। সালফার এবং নাইট্রোজেনের অক্সাইড এইসব দূষক পদার্থ জলকে দূষিত করে অ্যাসিডে পরিণত করে।

শিল্পনগরীর আকাশে অনেক চিমনী দেখা যায়। এসব চিমনী থেকে ধোঁয়া বেরিয়ে বাতাসকে দূষিত করে। যে শহরে যত বেশী গাড়ী চলে সেই শহরের বাতাস তত বেশী দূষিত। এরোপ্লেনের ধোঁয়াও বাতাসকে যথেষ্ট পরিমাণে দূষিত করে। পেট্রল পোড়ালে কার্বন মনোক্সাইড তৈরী হয়। এই কার্বন মনোক্সাইড অত্যন্ত দূষিত পদার্থ। নাইট্রোজেন অক্সাইডও খুব দূষিত। মটর গাড়ী এই দুটো গ্যাস সবচেয়ে বেশী তৈরী করে।

নাইট্রোজেন এবং অক্সিজেন মিলে নাইট্রোজেন অক্সাইড তৈরী হয়। বিশুদ্ধ বাতাসে প্রায় ৭৮ শতাংশ নাইট্রোজেন আর প্রায় ২০ শতাংশ অক্সিজেন থাকে। বাতাসে এই দুটো গ্যাস নিজে নিজেই নাইট্রোজেন অক্সাইড তৈরী করেনা তাই আমরা বেঁচে থাকতে পারি। কিন্তু কোন ইঞ্জিন যখন খুব গরম থাকে তখন বাতাসে নাইট্রোজেন অক্সাইড তৈরী হয়।

শিল্পের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে নানান রকমের দূষণ সম্পর্কিত।

দেখা গেল পৃথিবী সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে ৩৬৫ র কিছু বেশী দিনে। তখন রোমানরা কিছু বছর অন্তর একটা অতিরিক্ত মাস যোগ করে এটার পার্থক্য ঠিক করেছিল।

জুলিয়াস সীজার যখন রোমের সম্রাট তখন তিনি দেখলেন ক্যালেণ্ডারে ৮০ দিনের হিসেব ভুল আছে। ক্যালেণ্ডারে যখন বসন্ত-কাল, প্রকৃতিতে তখন শীতের মাঝামাঝি। সীজার তখন সোসিজেনেস নামে এক গণিতবিদকে পরামর্শের জন্য ডাকেন। সোসিজেনেস বলেন প্রকৃত বছর ৩৬৫ দিন ও ৬ ঘণ্টার হবে। তখন সীজার নির্দেশ দেন প্রত্যেক বছর ৩৬৫ দিনে শেষ হবে এবং চার বছর পর (Leap Yea।) প্রত্যেক ফেব্রুয়ারীতে একটা দিন যোগ হবে সঠিক ক্যালেণ্ডারের জন্য। সেজন্য Leap Year কে সব সময় চার দিয়ে ভাগ করা যায়। সীজার মাসের সময়ও ঠিক করেছিলেন ৩০ অথবা ৩১ দিন। কেবল ফেব্রুয়ারী মাস ৩০ দিনের কম।

সীজারের ৩৬৫ দিনের ক্যালেণ্ডার এত সঠিকভাবে সময় দিয়েছিল যে পরবর্তীকালেও প্রকৃতির সঙ্গে সময় মিলিয়ে তা সঠিকভাবে চলেছিল।

রোদসীর নতুন বর্ষ শুরু হচ্ছে আগামী জানুয়ারী মাস থেকে। গ্রাহকদের বার্ষিক চাঁদা ১৫ টাকা ১০ই জানুয়ারীর মধ্যে পাঠিয়ে দিতে অনুরোধ করছি।

টাকা পাঠাবার ঠিকানা

মনি অর্ডার : ১৪৯/১ই, রাসবিহারী এভিনিউ
কলকাতা ৭০০ ০২৯

সরাসরি টাকা দিতে গেলে ৯৯ কড়েয়া রোডের বিবেকানন্দ নিধির গবেষণা ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে যে কোন কাজের দিন বিকেল ৪-৩০—৭-৩০ এর মধ্যে দিতে হবে।

ব্যাঙ্ক ড্রাফট, চেক বা পোস্টাল অর্ডার 'বিবেকানন্দ নিধি' ১৪৯/১ই রাসবিহারী এভিনিউ, কলকাতা ৭০০ ০২৯ এই ঠিকানায় দেয়।

তুমি কি করবে?

স্বামী মুক্তানন্দ

[২১]

যে কদিন রিলায়েন্স কাপের ভাল খেলা হয়েছে, দাদা অফিসে গিয়েই বাড়ী ফিরে এসে টি ভি খুলে বসেছে। কোন দিন সম্পূর্ণ খেলা দেখেছে, কোনদিন বিকেলে আবার অফিস গিয়েছে। দাদার বাইরে বাইরে কাজ করতে হয়। ও অফিসে গিয়ে বলত যে যার সঙ্গে দেখা করতে যেত তিনি খেলা নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন। খেলার মরশুমে ওর কথা ওদের অফিসে অনেকে সত্যি বলে মনে করেছেন। আমার কিন্তু মনে হল

দাদা অফিসকে ঠকাচ্ছে।

খেলার সময় খেলা তো দেখতেই হবে।

অফিস কাজের জন্য মাইনে দেয়, খেলা দেখবার জন্য নয়। দাদার ঐ কদিনের মাইনে নেবার কোন অধিকার নেই।

দাদা নিজেকেও ঠকিয়েছে।

অফিস যখন দাদার চালাকি ধরতে পারেনি, তখন দাদা খেলা দেখবে না কেন?

[২২]

সেদিন বড়দি রমলার লেখা কবিতাটার খুব প্রশংসা করলেন। আমরা জানতাম যে কবিতাটি রমলার লেখা নয়, ওর কাকার লেখা। সুমনা নিজে একটা কবিতা লিখেছিল। কিন্তু প্রাইজ পেলনা রমলার জন্যে। ধীরা রমলাকে বলল

অন্যের লেখা কবিতা নিজের বলে চালানো আর চুরি করা একই ব্যাপার।

সুস্মিতা বলল প্রাইজ পাওয়ার জন্যে প্রতিযোগিতা। প্রাইজ পাওয়াই আসল কথা।

গার্গী বলল দিদিদের বোঝা উচিত ছিল কোন লেখাটা নিজের আর কোনটা অন্যের লিখে দেওয়া।

লেখা বলল ব্যাপারটা ফাঁস করে দিতে পারতাম।

[২৩]

মা সেদিন বাবা অফিস থেকে বাড়ী ফেরার পর বাবার সঙ্গে খুব ঝগড়া করলেন, বাবার রোজগার কম বলে। বাবা সাধারণত চুপচাপ থাকেন, কিন্তু সেদিন খুব চিৎকার করতে লাগলেন। বাবা এমন রেগে গেলেন যে মার গায়ে হাত পর্যন্ত তুললেন।

আমি ভাবলাম

অফিস থেকে ফেরার পর কাউকে বিরক্ত করতে নেই।

রোজগার কম হলে রাগ হতেই পারে।

রাগ হলে কাণ্ডজ্ঞান হারানো বোকামি।

অন্য উপায়ে রোজগার বাড়ালেই সমস্যার সমাধান হতে পারে।

[২৪]

বাবা মাকে বলছিলেন যে পিন্টুর অসুখের চিকিৎসার জন্য বাবা অফিসে ঘুষ নিয়েছেন। মা তাতে খুব রাগ করলেন। বাবা বললেন যে ঘুষ এই প্রথম নিয়েছেন, আর পিন্টুর চিকিৎসার জন্য টাকা যোগাড়ের অন্য কোন রাস্তা ছিল না।

আমি ভাবলাম

পিন্টুর জীবন বাঁচানোর জন্য এইটুকু অন্যায় দোষের নয়।

একবার ঘুষ নিলে অপরাধ হয় না।

ঘুষ একবার নিলেও ঘুষ নেওয়া হয়।

ঘুষ নেওয়া অভ্যেস হলে আর সামলানো যায় না।

টাকা যোগাড় অন্য কোন উপায়ে নিশ্চয়ই করা যেত।

চুরি করা থেকে বিনা চিকিৎসায় থাকা ভাল।

[শেষ]

ছেলেমেয়ে ও বাড়ীর সকলের জন্য সুন্দর পরিবেশ

বিবেকানন্দ নিধি থেকে প্রতি মাসে বাংলায় রোদসী ও ইংরাজীতে Value Orientation পত্রিকা প্রকাশ করা হয়। স্বেচ্ছা-সেবী তরুণ-তরুণী, বাবা মা ও শিক্ষক শিক্ষিকার প্রচেষ্টায় এই পত্রিকার প্রকাশ। উদ্দেশ্য বয়স নির্বিশেষে পাঠক পাঠিকাদের দৃষ্টি-ভঙ্গীর পরিবর্তনে বিজ্ঞানসম্মতভাবে সহায়তা করা। সীমিত সঙ্গতি, কাজেই আয়োজন ছোট। স্বেচ্ছাসেবীদের সংখ্যাল্পতা পত্রিকা প্রচারের পক্ষে বিশেষ বাধা। কিন্তু গত কয়েক বছরে দেখা গেছে অনেক বাবা মা আর ছেলেমেয়ে এই পত্রিকার কথা জানতে পারলে তা পেতে ও পড়তে চান।

জনাকতক উৎসাহী তরুণ-তরুণী নিজেরা চাঁদা দিয়ে কিছু ব্যক্তিকে গ্রাহক করে দিয়েছিলেন। এই গ্রাহকেরা অবশ্য জানেন না কে এই উপহার পাঠালো।

প্রকাশকের তরফ থেকে আপনাদের সকলকে অনুরোধ করছি 'রোদসীর' জন্য (জানুয়ারী—ডিসেম্বর) ১৫ টাকা ও Value Orientation এর জন্য (জুলাই—জুন) ১৫ টাকা মনি অর্ডার অথবা ব্যাঙ্ক ড্রাফট-এ পাঠিয়ে দিন। আরও অনেককে গ্রাহক হবার জন্য অনুরোধ করুন অথবা উপহার হিসেবে টাকা পাঠান। কলকাতার বাইরের ব্যাঙ্ক এর চেক পাঠাবেন না। চিঠি ও চেক পাঠাবার ঠিকানা—

বিবেকানন্দ নিধি
১৪৯/১ই রাসবিহারী এভিনিউ
কলকাতা ৭০০ ০২৯

নিয়মাবলী

লেখক–লেখিকাদের জন্য ঃ মূল্যবোধ ও পরিবেশ বা আজকের দিনের কোন সমস্যা নিয়ে আপনার গল্প বা প্রবন্ধ ছাপতে আমরা আগ্রহী।

লেখা কাগজের একদিকে বাঁদিকে অন্ততঃ এক ইঞ্চি ছেড়ে স্পষ্ট-ভাবে লিখবেন। লেখার নকল রেখে পাঠাবেন।

উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে যথাযথভাবে উদ্ধৃতি চিহ্ন থাকা প্রয়োজন। যে বই থেকে নেওয়া হয়েছে তার নাম, গ্রন্থকারের নাম, প্রকা-শকের নাম ঠিকানা, প্রকাশন বর্ষ, সংস্করণ সংখ্যা ইত্যাদির নির্ভুল উল্লেখ আবশ্যক।

অমনোনীত লেখা ফেরত পেতে হ'লে রেজিষ্ট্রী ডাকের উপযুক্ত ডাকটিকিট পাঠাতে হবে।

চিঠির উত্তরের জন্য ষাট পয়সার স্ট্যাম্প বা ঠিকানা সম্বলিত খাম / ইনল্যাণ্ড / পোস্টকার্ড পাঠাতে হবে। লেখা বা চিঠি সংযুক্ত সম্পাদক বা সম্পাদকের নামে পাঠাবেন।

গ্রাহকদের জন্য ঃ জানুয়ারী মাস থেকে বছর আরম্ভ। বছরের প্রথম সংখ্যা থেকে এক বছরের জন্য গ্রাহক হওয়া যায়। বছরের যে কোন সময় বার্ষিক চাঁদা গৃহীত হলেও গ্রাহক করা হবে জানুয়ারী মাস থেকে। বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা সডাক ১৫·০০ টাকা। ভারতের বাইরে $ ১০।

পরের মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে পত্রিকা না পেলে, অবিলম্বে কার্যালয়ে জানালে পুনরায় ঐ সংখ্যা দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু পরবর্তী মাসের মধ্যে না জানালে পত্রিকা প্রাপ্তির নিশ্চয়তা থাকবে না।

রোদসীর চাঁদা মনিঅর্ডারে পাঠালে কুপনে পুরো নাম, ঠিকানা পরিষ্কার করে লেখা প্রয়োজন। মনিঅর্ডার বা পোস্টাল অর্ডারে টাকা পাঠানো যাবে। পোস্টাল অর্ডার বিবেকানন্দ নিধিকে দেয়। মনিঅর্ডার পাঠানোর ঠিকানা ঃ ১৪৯/১ই রাসবিহারী অ্যাভিনিউ, কলকাতা-৭০০০২৯। সরাসরি টাকা দিতে গেলে এই ঠিকানা ছাড়াও বিবেকানন্দ নিধি, ৯৯, কড়েয়া রোড, কলকাতা-১৯ ঠিকানায় যে কোন কাজের দিন বিকেল পাঁচটা থেকে সাড়ে সাতটার মধ্যে দেওয়া যাবে।

ঠিকানার পরিবর্তন হলে অন্ততঃ একমাস আগে জানাতে হবে।

OUR PUBLICATIONS

		Rupees
Proceedings of the First Seminar, 1981 (Including keynote by Indira Gandhi)		100·00
Report on Seminar, 1981		6·00
Proceedings of Students Seminar. 1981		7·00
Value Orientation (English monthly) Annual Subscription		15·00
Rodesi (Bengali Monthly) Annual Subscription		15·00
Value Orientation Annual/Special Issue 1983-87 each		15·00
Rodesi Special Issue 1985		10·00
Bharat Bhajanmala Part I (Hindi)	Paper Back	11·00
Bharat Bhajanmala Part II	Paper Back	12·00
(Devnagri Script Hindi gist)	Hard Bound	14·00
Human Response in Organisations Towards the Indian Ethos— Dr S. K. Chakraborty		95·00
Values in our lives : A pilot study (A research report)—Dr S K Chakraborty		30·00
Value Orientation & Environmental Education (Proceedings of the Workshop, 1982) Edited by Dr S C Chakraborty		40·00
Souvenir—Environment Day, 1986, 87 each		5·00

Postal Regn No. WB/SC223
৫ম বর্ষ, ১২'শ সংখ্যা, ডিসেম্বর ১৯৮৭ Regn No. RN-41095/83

2 DEC 1987

মানুষের একটা দিক আছে যেখানে বিষয়বুদ্ধি নিয়ে সে আপন সিদ্ধি খোঁজে। সেইখানে আপন ব্যক্তিগত জীবযাত্রা নির্বাহে তার জ্ঞান, তার ধর্ম, তার রচনাশক্তি একান্ত ব্যাপৃত। সেখানে সে জীবরূপে বাঁচতে চায়।

কিন্তু, মানুষের আর একটা দিক আছে যা এই ব্যক্তিগত বৈষয়িকতার বাইরে। সেখানে জীবনযাত্রার আদর্শে যাকে বলি ক্ষতি তাই লাভ, যাকে বলি মৃত্যু, সেই অমরতা। সেখানে জ্ঞান উপস্থিত প্রয়োজনের সীমা পেরিয়ে যায়; কর্ম স্বার্থের প্রবর্তনাকে অস্বীকার করে। সেখানে আপন স্বতন্ত্র জীবনের চেয়ে যে বড়ো জীবন সেই জীবনে মানুষ বাঁচতে চায়।

— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সম্পাদনা, প্রকাশনা ও মুদ্রণ : স্বামী মুক্তানন্দ। বিবেকানন্দ নিধি, ৮৬এফ, মনোহরপুকুর রোড, কলিকাতা-২৯ হইতে প্রকাশিত। সংযুক্ত সম্পাদিকা— লিপিকা গাঙ্গুলী।

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা ১৫ টাকা। প্রতি কপি ১ টাকা ৫০ পয়সা।

পাপাই প্রিন্টার্স ২৩৭, এন এস সি বোস রোড, কলিকাতা-৪৭ হইতে মুদ্রিত।